আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিকস-১

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট
ব্রেজনেভের সাথে বঙ্গবন্ধু

যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল টিটোর সাথে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭৪ সালের ১লা অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব
কুর্ট ওয়াল্ডহেইম এর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলনে যোগদান করেন এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। এর মাধ্যমে ১১৬টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন (ন্যাম), ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি), ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনালসহ ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ এবং গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিকস-১
IT Support and IoT Basics-1

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
ড. প্রকৌশলী সুজিত বিশ্বাস
মো: সাইফ উদ্দীন
প্রকৌশলী গাজী ইকফাত মাহমুদ
আবু সায়েম মো: জেকেরুল হক
মো: খোরশেদ আলম (সমন্বয়কারী)

সম্পাদক

ড. মো: শাহ আলম মজুমদার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২১

পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : ২০২৩

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হাওলাদার অফসেট প্রেস, ১ গোপাল সাহা লেন, সিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ১৩টি ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বেসিকস	১-৪৪
দ্বিতীয়	হেলথ, সেফটি অ্যান্ড ইথিকস ফর আইসিটি	৪৫-৬৭
তৃতীয়	ডেস্কটপ কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং	৬৮-১২১
চতুর্থ	সফটওয়্যার ইনস্টলেশন	১২২-১৬২

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	কম্পিউটার পেরিফেরালস বেসিকস	১৬৫-১৯৮
দ্বিতীয়	সিস্টেম অ্যান্ড ডেটা সিকিউরিটি	১৯৯-২২৯
তৃতীয়	আইটি সিস্টেম মেইনটেন্যান্স	২৩০-২৫৫
চতুর্থ	ল্যাপটপ সার্ভিসিং	২৫৬-২৯৯

আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিকস-১
IT Support and IoT Basics-1

প্রথম পত্র

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৮৮১৩

প্রথম অধ্যায়

ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বেসিকস

Electrical and Electronics Basics

কল্পনা কর তোমার বাড়িতে বিদ্যুৎ নাই, তুমি মোবাইল চার্জ করতে পারছ না কিংবা তোমাদের বাসায় একটি টেলিভিশন কিনে এনেছ কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকায় তুমি আজকের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি দেখতে ও শুনতে পারলে না। এই বিদ্যুৎবিহীন জীবন আমাদের কাছে একটি অসহায়ত্ব বই আর কিছুই নয়। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল বিদ্যুৎ আবিষ্কার আর তার নানামুখী ব্যবহার দিয়ে,আর তৃতীয় শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল ভ্যাকুয়াম টিউব ও সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে তৈরি ট্রানজিস্টরসহ ইলেকট্রনিক্সের নিত্য নতুন আবিষ্কার তথা রেডিও, টেলিভিশনসহ স্বয়ংক্রিয় সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মাধ্যমে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের এই দুটি সূচনা প্রযুক্তি যথাক্রমে বিদ্যুৎ আর ইলেকট্রনিক্স ছাড়া আমরা এখন অচলই বলা চলে । মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে শিল্প কারখানাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই দুই প্রযুক্তির ব্যবহার অবারিত । মানব সভ্যতার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও গতিময় বিবর্তনের পেছনে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও অপরিহার্যতা সর্বজন স্বীকৃত । চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা যত উচ্চতায় যাক না কেন,এই দুটি প্রযুক্তি আর এতদ্বসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির উপর আমাদের নির্ভরশীলতা থাকবেই। এদের ব্যবহারিক চাহিদা দিন দিন বাড়তেই থাকবে।

এই অধ্যায়ে আমরা সেই অপরিহার্য প্রযুক্তি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এর প্রাথমিক ধারণা লাভ করব। ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্সসহ অন্যান্য ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক প্রপারটিজ এর ব্যবহারিক প্রয়োগ ও পরিমাপন পদ্ধতি শিখব। আইটি সেক্টরে ব্যবহৃত হয় এমন সাধারণ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করব ।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এর ধারণা লাভ করব ;

- নিত্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও যন্ত্রাংশ চিহ্নিত করে তার ব্যবহার করতে পারব;
- মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করে কন্টিনিউটি টেস্ট এবং ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে পারব;
- কমন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ডিভাইসসমুহের ত্রুটি বিচ্যুতি পরীক্ষা করতে পারব।

১.১ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এর ধারনা

সচরাচর পরিবাহীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রনের প্রবাহজনিত বৈদ্যুতিক প্রযুক্তিকে ইলেকট্রিক্যাল এবং ভ্যাকুয়াম বা সেমিকন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহজনিত প্রযুক্তিকে ইলেকট্রনিক্স বলে। মনে রাখতে হবে ইলেকট্রনিক্স এর ভিত্তি হল ইলেকট্রিক্যাল। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে বিদ্যুৎ কী? সাধারন কথায় বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি। কেমন শক্তি ? অদৃশ্য কিন্তু বৈদ্যুতিক চাপ বা ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে সহনীয় কিংবা প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী সভ্যতার জন্য এক অত্যাবশ্যকীয় শক্তি, যা কাজে লাগিয়ে কিনা করা যায় ? তাহলে আস, আমরা একটু মাথা খাটাই। চেষ্টা করি বৈদ্যুতিক শক্তি বা ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করে কী কী করা যায় না, তার একটা তালিকা তৈরি করি। এ কাজটি তোমরা বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে আর বাড়িতে তোমাদের অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করে করবে এবং তা শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।

এবার চল আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে কী কী করতে পারি, তার একটি তালিকা নিজের চেষ্টায় তৈরি করি । আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বাতি ও ফ্যান চালাই, টেলিভিশন দেখি, মোবাইল চার্জ করি, বাড়ির ছাদে ট্যাংকিতে পানি তোলার বা ক্ষেতে সেচ দেয়ার জন্য মটর চালাই, ল্যাপটপ বা কম্পিউটার চালাই, ক্যামেরা বা স্পীকারটি সচল করার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করি। একইভাবে মাইক্রোফোন সচল করার জন্য দরকার বিদ্যুৎ। চল সবাই মিলে এই তালিকাটি আরো বড় করি।

তালিকাটি সম্পন্ন করার পর যেসব যন্ত্রপাতির নাম উল্লেখ করা হলো তার মধ্যে কোনগুলোকে ইলেকট্রিক্যাল আর কোনগুলোকে ইলেকট্রনিক যন্ত্র বলে তা কী আমরা বুঝতে পারছি? চল সেগুলোকে আলাদা করার চেষ্টা করি।

ক্রমিক নং	ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি	ইলেকট্রনিক যন্ত্রাপাতি
১	বৈদ্যুতিক বাতি যেমন ইলেকট্রিক ভাল্ব, টিউব লাইট	টেলিভিশন
২	বৈদ্যুতিক পাখা বা ফ্যান যেমন টেবিল ফ্যান, সিলিং ফ্যান	মোবাইল ফোন
৩	বৈদ্যুতিক মটর	ডেস্কটপ কম্পিউটার
৪	ইলেকট্রিক ওভেন	ক্যামেরা
৫	জেনারেটর	ফটোকপিয়ার

২০২৪

ক্রমিক নং	ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি	ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি
৬	আইপিএস / ইউপিএস	স্ক্যানার
৭	ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার	প্রিন্টার
৮	ফ্রিজ	ল্যাপটপ
৯	ট্রান্সফর্মার	মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর
১০	সুইচ গিয়ার	টেলিফোন
১১	ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর	রাডার
১২	সার্কিট ব্রেকার	অ্যামপ্লিফায়ার

উপরে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির আলাদা একটা তালিকা করলেও স্পীকার ও মাইক্রোফোনকে এক কথায় কোনটির মধ্যেই এককভাবে ফেলা যাচ্ছে না। এই ধরনের ডিভাইসগুলো হতে পারে উভয়ের সংমিশ্রন বা হাইব্রিড জাতীয় অথবা অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের । যেমন স্পীকার এমন একটি ইলেকট্র-ম্যাগনেটিক ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক শক্তিকে চুম্বক শক্তির সাহায্য নিয়ে মেকানিক্যাল শব্দে রূপান্তর করে । এ ধরনের রূপান্তরক ডিভাইসগলোকে ট্রান্সডিউসারও বলে । মাইক্রোফোনও এরকম একটি ট্রান্সডিউসার যা শব্দ শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে ।

ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যাই হোক না কেন বিদ্যুৎ ছাড়া তা সচল করা সম্ভব না। এই বিদ্যুৎ আবার দুই রকম । এসি এবং ডিসি। এসি এর পুরো নাম Alternating Current (AC) আর ডিসি এর পুরো নাম Direct current (DC) । এসি এর উৎস হিসেবে আমরা আমাদের বাড়ি ঘরের দেয়ালের সকেটের মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ পাই তাকে বিবেচনা করতে পারি। এই বিদ্যুতের উৎস এসি মেইন লাইন যা বড় বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে ২২০ ভোল্ট হিসেবে। এই ২২০ ভোল্ট এসি দিয়ে সরাসরি যে যন্ত্রগুলো চালানো হয়,তাদের আমরা ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি বলি। আর যে যন্ত্রগুলো এসি দিয়ে সরাসরি না চালিয়ে এসিকে ডিসিতে রূপান্তর করে বা সরাসরি ডিসি উৎস যেমন ব্যাটারি দিয়ে চালানো হয় সেই যন্ত্রগুলোই হলো ইলেকট্রনিক যন্ত্র।

উপরের যে তালিকা দেখানো হলো তা এবং তোমরা যে তালিকা তৈরি করেছ তার কোনটি সরাসরি এসিতে চলে, কোনটি এসিকে ডিসিতে রূপান্তর করে তার মাধ্যমে চলে যাকে আমরা অ্যাডাপ্টার বলি আর কোনটি সরাসরি ব্যাটারি চালিত ডিসির মাধ্যমে চলে। তার পৃথক তিনটি তালিকা তৈরি কর।

বিদ্যুৎ প্রবাহে বিভিন্ন প্রকার পদার্থের বৈশিষ্ট্য:

পরিবাহী :

যে সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ খুব সহজেই হয় ,বিশেষত ইলেকট্রনের প্রবাহে কোনো বাধার সম্মুখীন হয় না,তাকে বিদ্যুৎ পরিবাহী বা কন্ডাক্টর বলে। সাধারণত সব ধাতুই কম বেশি ভালো বিদ্যুৎপরিবাহী; তন্মধ্যে

রূপা , তামা , অ্যালুমিনিয়াম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এজন্যই আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য তামার তার ব্যবহার করে থাকি ।

অপরিবাহী :

যে সকল পদার্থের মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় না , বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রচুর বাধার সম্মুখীন হয়, তাদের অপরিবাহী পদার্থ বা ইনসুলেটর বলে। যেমন শুকনো কাঠ, রাবার , চামড়া, প্লাস্টিক ইত্যাদি। এই জন্যই আমরা যখন বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করি তখন আমরা যেন বৈদ্যুতিক শক না খাই অর্থ্যাৎ হঠাৎ কোন কারনে আমরা বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসলেও আমাদের ভিতর দিয়ে যাতে বিদ্যুত প্রবাহ না হতে পারে সে জন্য আমরা চামড়ার তৈরি সেফটি জুতা ব্যবহার করে থাকি ।

অর্ধপরিবাহী পদার্থ:

যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে তবে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হয় তাদেরকে অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর বলে। যেমন জার্মেনিয়াম, সিলিকন, কার্বন ইত্যাদি। এই অর্ধপরিবাহী পদার্থের বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে ইলেকট্রনিক্স এর ট্রানজিস্টর । এই একুশ শতকে যা এক বিস্ময়ের বিস্ময় । বর্তমান বিশ্বে একটি ক্ষুদ্রতম আইসি বা চিপস এর মধ্যে বিল্ট ইন থাকে লক্ষ কোটি ট্রানি্জস্টর আর কিছু সহযোগী কম্পোনেন্ট । ট্রানজিস্টর এর বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আজ তা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আইসি বা চিপস- যা আমাদের শরীরের কোটি কোটি জৈব কোষের মতই এক বিস্ময়কর প্রযুক্তি ।

১.১.২ কারেন্ট , ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স

এসি বলি আর ডিসি বলি , এই যে বিদ্যুৎ বা কারেন্ট তা আসলে কী ? শাব্দিক অর্থে বিদ্যুৎ প্রবাহকে কারেন্ট বলা হয় অর্থ্যাৎ ইলেকট্রনের প্রবাহজনিত কারনে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়ে থাকে তাকে কারেন্ট বলে । অন্যভাবে বলা যায় ইলেকট্রনের বিপরিতমুখী প্রবাহকে কারেন্ট বলা হয় । কারেন্ট পরিমাপের একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার । যে যন্ত্রের সাহয্যে এই কারেন্ট পরিমাপ করা হয় তাকে বলে অ্যামিটার। কারেন্ট উৎপন্ন হওয়ার শর্ত হচ্ছে যে মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে তার দুই প্রান্তের উৎসমুলে থাকতে হবে বৈদ্যুতিক চাপের একটি পার্থক্য যাকে বলা হয় বিভব বৈষম্য। বৈদ্যুতিক উৎসমুলে প্রান্ত সমূহের মধ্যে এই চাপের পার্থক্যজনিত কারণেই ইলেকট্রনের প্রবাহ তথা বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট তৈরি হয় । বৈদ্যুতিক উৎসগুলোর মধ্যে চাপের পার্থক্যকে বলে ভোল্টেজ । ভোল্টেজের একক হচ্ছে ভোল্ট এবং যে যন্ত্রের সাহায্যে এই ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয় তাকে বলে ভোল্টমিটার । ভোল্টেজ , কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স এর বৈশিষ্ট্য সহজে অনুধাবনের জন্য চিত্র :১.১ লক্ষণীয় ।

এখানে মজুত পানির উচ্চ চাপ থেকে পাইপের মধ্য দিয়ে পানির প্রবাহ এবং প্রবাহের পথে পানির কল দ্বারা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স এর সাথে তুলনা করা হয়েছে ।

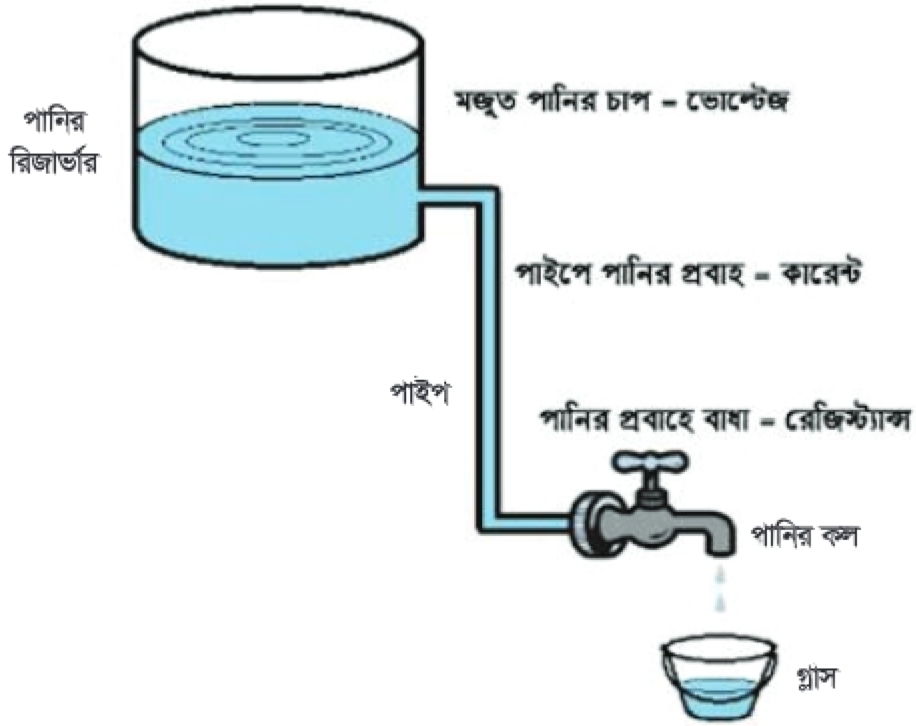

ছবির সূত্র https://www.learningengineeringbangla.com/2019/12/what-is-voltage-what-is-current-what-is.html

চিত্রঃ ১.১ পানির চাপ, পানির প্রবাহ এবং প্রবাহের পথে পানির কল দ্বারা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকে যথাক্রমে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স এর সাথে তুলনা

আমরা আগেই জেনেছি সকল পদার্থের ভিতর দিয়ে একই হারে বিদ্যুৎ প্রবাহ হতে পারে না। পরিবাহীর ভিতর দিয়ে সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়,আবার অপরিবহীর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ হতে পারে না, অর্ধপরিবাহীর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ কিছুটা বাধাগ্রস্থ হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহে নানা কারনে এই যে বাধার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় রেজিস্ট্যান্স। এই বাধার পরিমান আবার পদার্থভেদে এক রকম না, কত তাপ বা চাপে এই পদার্থটি আছে বা কত তাপ বা চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে তার উপরও নির্ভর করে। আবার পদার্থটির গঠনিক বৈশিষ্টের ওপরও তা কম বা বেশী হতে পারে। যাই হোক নিদিষ্ট তাপ ও ভোল্টেজ লেভেল -এ কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহে মোট বাধার পরিমাণকে রেজিস্ট্যান্স বলা হয় । রেজিস্ট্যান্স এর একক ওহম (Ohm) এবং ইহাকে Ω চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

২০২৪

এসি ও ডিসি

অল্টারনেটিং কারেন্ট (AC)

ভোল্টেজ বা বিভব বৈষম্যের কারনে সময় বৃদ্ধির সাথে কারেন্ট এর দিক ও মান যদি সর্বদাই পরিবর্তন হতে থাকে তবে তাকে পরিবর্তনশীল বা অল্টারনেটিং কারেন্ট বা এসি বলে। চিত্রঃ ১.২- এ এসি এর বৈশিষ্ট দেখানো হলো।

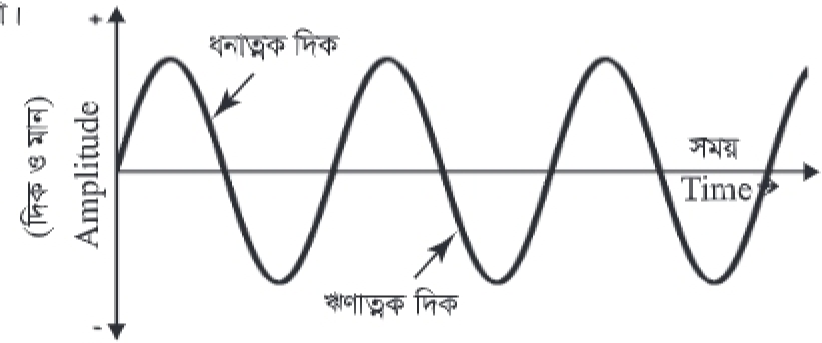

চিত্র ১.২: অল্টারনেটিং কারেন্ট(এসি)

ডাইরেক্ট কারেন্ট (DC)

ডিসি এর পূর্ণ নাম ডাইরেক্ট কারেন্ট। সময় বৃদ্ধির সাথে যদি বিদ্যুৎ এর মান ও দিক স্থির থাকে অর্থ্যাৎ একই মানের ভোল্টেজ লেভেলে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমান স্থির ও একমুখী হয়,তবে তাকে ডাইরেক্ট কারেন্ট বা ডিসি বলে । অর্থ্যাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহকালীন সময়ে যদি কারেন্টের প্রবাহের দিক পরিবর্তিত না হয় তবে সেটি ডিসি। সাধারণত ব্যাটারি, সোলারসেল প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত কারেন্টকে ডিসি বলা হয়। চিত্র: ১.৩-এ ডিসি এর বৈশিষ্ট দেখানো হলো।

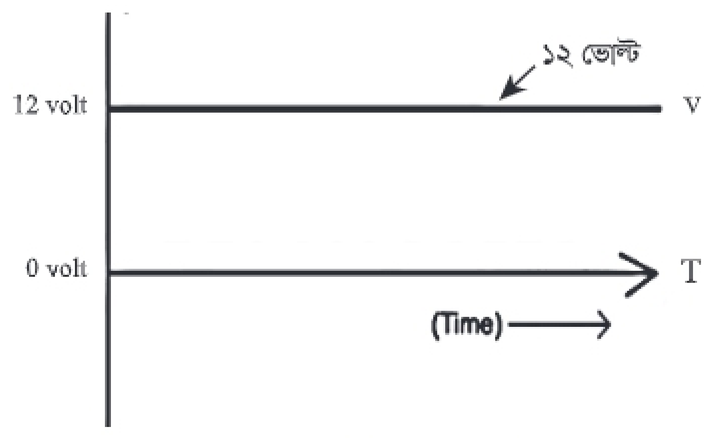

চিত্র ১.৩: ডাইরেক্ট কারেন্ট (ডিসি)

২০২৪

ফ্রিকুয়েন্সি (Frequency)

সম্পূর্ণ অল্টারনেটিং কারেন্ট বা বিদ্যুৎ প্রবাহের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তার ফ্রিকুয়েন্সী। এসি প্রবাহের সময় প্রতি সেকেন্ডে এই পরিবর্তনটি যতবার সম্পন্ন হয় তাকে ফ্রিকুয়েন্সী বলে অর্থ্যাৎ বিদ্যুতের এক সেকেন্ডে সম্পন্ন পুর্ণ সাইকেলের সংখাই হলো ফ্রিকুয়েন্সি। এর ব্যবহারিক একক হার্জ (Hertz)। ইহাকে Hz দ্বারা প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের বৈদ্যুতিক ফ্রিকুয়েন্সি ৫০ এবং আমেরিকায় এই ফ্রিকুয়েন্সি ৬০ হার্টজ। চিত্র: ১.৪-এ এসি, ডিসি ও ফ্রিকুয়েন্সি এর বৈশিষ্ট দেখানো হলো।

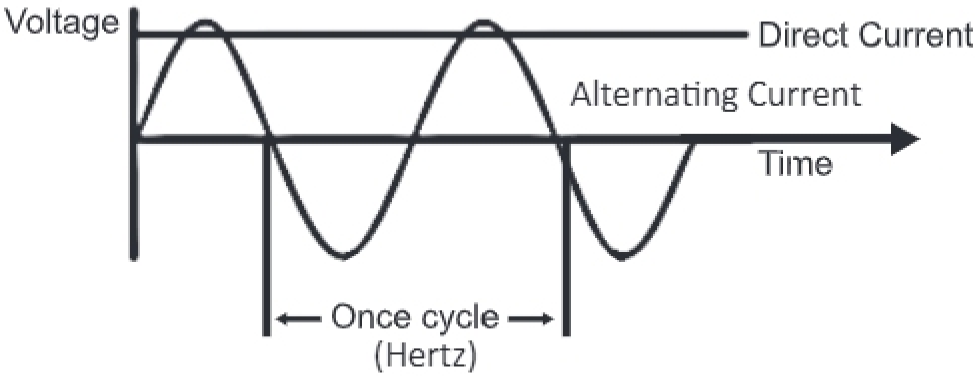

চিত্র ১.৪ : এসি ও ডিসি

১.১.৪ ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং রেজিস্ট্যান্স এর সম্পর্ক

ভোল্টেজ, কারেন্ট আর রেজিস্টেন্স এর সম্পর্ক বোঝার জন্য এ সম্পর্কিত ওহমের সূত্র জানা প্রয়োজন। তাহলে চল আমরা বুঝতে চেষ্টা করি ওহমের সূত্রটি আসলে কী? স্থির তাপমাত্রায় কোন পরিবাহীর মধ্যদিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ঐ পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব বৈষম্য বাভোল্টেজের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, তাপমাত্রা স্থির থাকলে, ভোল্টেজ বাড়লে কারেন্ট বাড়ে আবার ভোল্টেজ কমলে কারেন্টও কমে। অপরদিকে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ রেজিস্ট্যান্সের উল্টানুপাতিক। অর্থাৎ পদার্থের রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেলে উহার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ কমে যায়।

ভোল্টেজ কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স এর এই ধারনা নিচের প্রতিকী চিত্রে লক্ষণীয় । দেখা যাচ্ছে যে, বিভব বৈষম্য বা ভোল্টেজ এর চাপে কোন নলের ভিতর দিয়ে কারেন্ট বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং রেজিস্ট্যান্স বিদ্যুৎ প্রবাহের গতিপথকে বাধাগ্রস্থ করছে ।

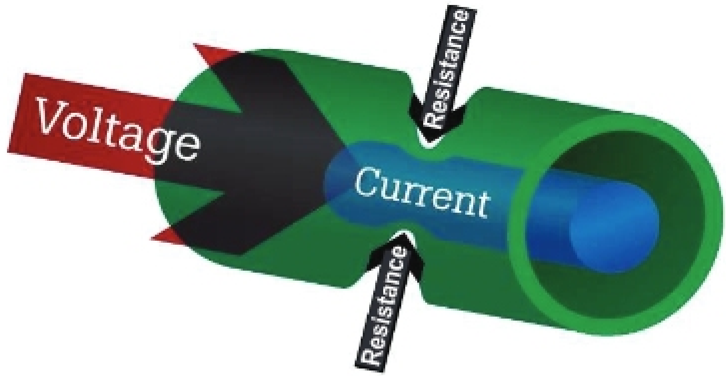

চিত্র ১.৫: ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স এর প্রতীকি চিত্র

ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক নিম্নরূপ । তাপমাত্রা স্থির থাকলে ওহমের সূত্র অনুযায়ী বলা যায়

$I = \frac{V}{R}$ যেখানে I হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট

V হচ্ছে বিভব বৈষম্য বা ভোল্টেজ এবং

R হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা বা রেজিস্ট্যান্স

আবার লেখা যায় ভোল্টেজ $V=IR$ অর্থ্যাৎ ভোল্টেজ হচ্ছে স্থির তাপমাত্রায় পরিবাহীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স এর গুণফল । তোমরা কি এখন ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং রেজিস্ট্যান্স এর একক স্বরণ করতে পারছ ?

বৈদ্যুতিক শক্তি বা পাওয়ার

বৈদ্যুতিক ক্ষমতা হচ্ছে বৈদ্যুতিক সার্কিটের মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি স্থানান্তরের হার। পাওয়ারের একক ওয়াট । বৈদ্যুতিক শক্তি সাধারনত ইলেক্ট্রিক জেনারেটরে তৈরি হয় । কিন্তু ব্যাটারী থেকেও এ শক্তি চালনা করা যায় । ইলেক্ট্রিক্যাল পাওয়ার বা বৈদুতিক শক্তি গ্রিড এর মাধ্যমে বাসা বাড়িতে , কল-কারখানা বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয় । বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বিপণনের একক কিলো- ওয়াট ঘণ্টা। গাণিতিক ভাবে বলা যায় এসি পাওয়ার $P=VI\cos\theta$ এবং ডিসি পাওয়ার = $P=VI$

এখানে P=পাওয়ার , V= ভোল্টেজ এবং I=কারেন্ট এবং $\cos\theta$= এসি -এর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহের কৌণিক মান

ইলেকট্রনিক্স

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে শাখায় শূন্য মাধ্যম বা ভ্যাকুয়াম টিউব বা সেমিকন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রন বা ফোটনের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অসিলেশন, রেকটিফিকেশন, ফিল্টারিং, অ্যামপ্লিফিকেশন ও কনভারশন জাতীয় কার্য সম্পাদন করা হয় তাকে ইলেকট্রনিক্স বলে ।

এ সকল কাজ সম্পাদন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাদিকে ইলেকট্রনিক সামগ্রী বলে। ডায়োড, ট্রানজিস্টর , আইসি, ডায়াক, ট্রায়াক, ক্রিস্টাল অসিলেটর, অ্যামপ্লিফায়ার, লজিক গেট, ফ্লিপ ফ্লপ, কাউন্টার রেজিস্টার, অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার, এডি / ডিএ কনভার্টার, টাইমার, মাইক্রোকন্ট্রোলার ও মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস এর উদাহরণ। এই ইলেকট্রনিক ডিভাইসসমূহ ব্যবহার করে তৈরি করা হয় বর্তমান বিশ্বের সব আধুনিকতম যন্ত্রপাতি যার কিছু উদাহরণ ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে

১.২ ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ক্ষেত্রসমুহে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

কর্মক্ষেত্রে বিশেষত ইলেকটিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার, ইনস্টলেশন, ত্রুটি বিচ্যুতি নির্ণয়, সার্ভিসিং করা বা মেরামত করার সময় যেমন কর্মক্ষেত্র স্বাস্থ্যকর হতে হয় তেমনি যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য একটি কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হয়। বিশেষ করে ইলেকট্রিকাল লাইন ভোল্টেজ এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ভিতর পাওয়ার সাপ্লাইসহ বিভিন্ন সার্কিটে যে উচ্চমাত্রার ভোল্টেজ থাকে এবং তার কারণে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তা অনেক সময় আমাদের জীবন নাশের কারণ হতে পারে। এ সকল দুর্ঘটনায় মানুষের শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনি নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত না করলে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ার সম্ভাবনাও আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অংগহানি বা জীবনহানিতে রূপ নিতে পারে। কিছু নিয়মনীতি মেনে চলার মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা করা সম্ভব। যেমন-

- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোশাক (পিপিই) পরিধান করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলা।
- কর্মক্ষেত্রকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখা।
- জরুরি অবস্থায় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, জরুরি নির্গমন দরজা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সের অবস্থান জেনে রাখা।
- ইলেকট্রিক পাওয়ার বিশেষত কারেন্ট, ভোল্টেজ নিয়ে কাজ করার সময় সেফটি জুতা, গ্লোভস পরিধান করা ।
- ইলেকট্রনিক কর্মক্ষেত্রে এন্টিস্ট্যাটিক ম্যাট ব্যবহার করা।
- খোলা চুলে ও অ্যাপ্রোন বিহীন অবস্থায় কর্মক্ষেত্রে বা ল্যাবে প্রবেশ না করা।

- বিপজ্জনক দ্রব্যাদি নিয়ে সাবধানে কাজ করা । যে যন্ত্রপাতি যে কাজে ব্যবহৃত হয় সেটিকে শুধুমাত্র সেই কাজেই ব্যবহার করা।
- যন্ত্রপাতি বা ভাঙা যন্ত্রাংশ যেখানে সেখানে ফেলে না রাখা ।
- নিজে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং অন্যের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তা নিশ্চিত করা।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোশাক (পিপিই) এর প্রকারভেদ এবং প্রয়োজনীয়তা

আমরা প্রায়ই টেলিভিশনে বা বাস্তব জীবনে দেখে থাকি হাসপাতাল, বিজ্ঞান পরীক্ষাগার/ল্যাবরেটরি প্রভৃতি স্থানে যারা কাজ করছে তারা পুরো শরীরের অধিকাংশ স্থান ঢেকে রেখে একটি পোশাক ব্যবহার করছে, এটাই পিপিই। ল্যাবরেটরিতে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পিপিই অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ একটি অংশ। পিপিই (PPE) এর পুর্ণরূপ (Personal Protective Equipment) । পিপিইর বিভিন্ন অংশের মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ হলো-

- স্কিন প্রোটেক্টর: অ্যাপ্রোন, ইহা শরীর ও কাপড়ে ময়লা লাগা এবং ব্যক্তিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য পরিধান করা হয়।
- হ্যান্ড অ্যান্ড আর্ম প্রোটেক্টর: গ্লোভস, ইহা শরীরের চার্জ থেকে যন্ত্রপাতিকে এবং যন্ত্রপাতির ধারাল অংশ থেকে হাতকে রক্ষা করে।
- হেড প্রোটেক্টর: হেলমেট, ইহা মাথাকে রক্ষা করে।
- ফুট প্রোটেক্টর: সেফটি বুটস, ইহা বৈদুতিক সক থেকে রক্ষাকরে, বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আহরণ করার কাজে ব্যবহার হয়।

১.৩ ইলেকট্রিকাল যন্ত্রপাতি ও অ্যাক্সেসরিজ

অ্যাক্সেসরিজ

আইসিটি ও আইওটি কর্মক্ষেত্রে আমাদের আবশ্যকীয় কিছু ইলেকট্রিকাল অ্যাক্সেসরিজ বা পার্টস ব্যবহার করতে হয় । যেমন সুইচ, সকেট, মাল্টিপ্লাগ, পাওয়ার ক্যাবল, সার্কিট ব্রেকার, ফিউজ , কাটআউট, রিলে ইত্যাদি আমাদের কর্মক্ষেত্রের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ইলেকট্রিকাল এক্সেসরিজ। ইহাদেরকে ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংসও বলা হয়ে থাকে।

সুইচ

বিভিন্ন প্রকার ও আকারের ইলেকট্রিক সুইচ আছে। ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার লাইন এর পাওয়ার চালু বা বন্ধ করতে এই সুইচ ব্যবহার করা হয়। এই সুইচগুলো সচরাচর ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং এর সময় দেয়ালে বা অন্য কোন কাঠামোতে ইলেকট্রিক ফিটিংস হিসেবে সংযোগ করা হয়ে থাকে।

চিত্র ১.৬: পাওয়ার লাইনের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রিক সুইচ

এছাড়া ইলেকট্রনিক বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে পাওয়ার সংযোগ বা বিচ্ছিন্ন করার জন্য যে সুইচ ব্যবহার করা হয় তা সাধারনত দুই স্টেট বা তিন স্টেট এর হয়ে থাকে । নিচের চিত্রে এরুপ কিছু সুইচ দেখানো হলো ।

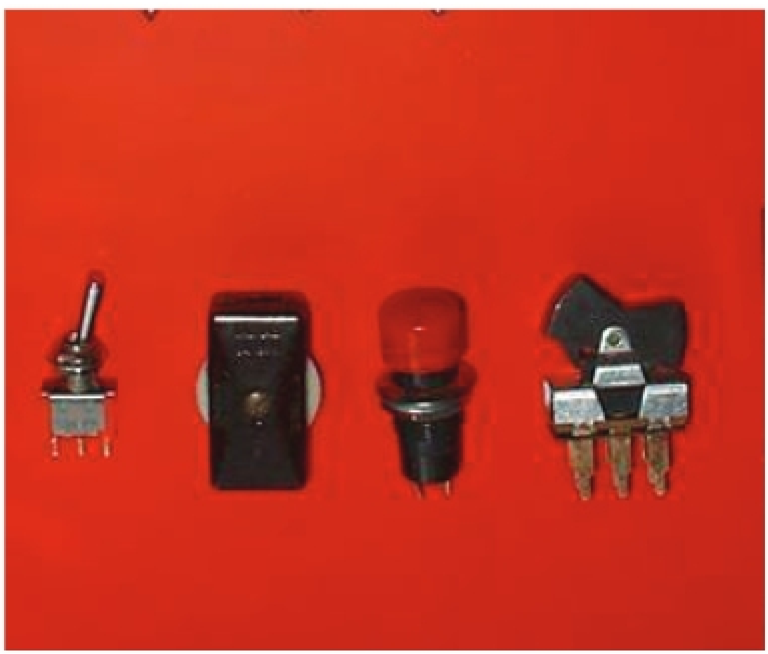

চিত্র ১.৭: ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক সিস্টেমে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সুইচ

২০২৪

সকেট

ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার লাইনের সাথে কোন যন্ত্রের ইলেকট্রিক সংযোগ প্রদানের জন্য সচরাচর

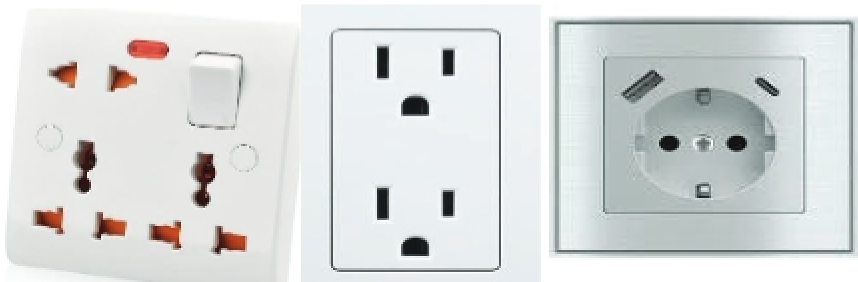

চিত্র ১.৮ : বিভিন্ন প্রকার ২পিন ও তিন পিন ইলেকট্রিক সকেট

দেয়ালে বা অন্য কোন কাঠামোতে ইলেকট্রিক ফিটিংস হিসেবে এই সকেট ব্যবহার করা হয়। সচরাচর ওয়্যারিং এর সময় দেয়ালে স্থায়ীভাবে সকেট বসানো হয়।

মাল্টিপ্লাগ সকেট

কোন সকেট যখন স্বতন্ত্র ও উন্মুক্ত থাকে এবং প্রয়োজন মত যে কোন স্থানে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কিংবা যে কোন মেশিন প্লাগের মাধ্যমে সংযোগ করার জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তাকে মাল্টিপ্লাগ সকেট বলে । একই কাঠামোর মধ্যে এরূপ একাধিক সকেট এক সাথে যুক্ত থাকলে তাকে মাল্টিপ্লাগ সকেট বলে । ইলেকট্রিক্যাল লাইনের সাথে একাধিক যন্ত্র বা মেশিন সংযোগ দেওয়ার কাজে মাল্টিপ্লাগ সকেট ব্যবহার করা হয়।

চিত্র১.৯: মাল্টিপ্লাগ সকেট

পাওয়ার কর্ড ও প্লাগ

ইলেকট্রিক সকেট এর সাথে সাথে কোন যন্ত্র বা মেশিনের সংযোগ দেওয়ার কাজে ক্যাবলযুক্ত প্লাগ ব্যবহার করা হয় তাকে পাওয়ার কর্ড বলে । এই পাওয়ার কর্ড দুই বা তিন পিনের এবং গোল বা চ্যাপ্টা হতে পারে।

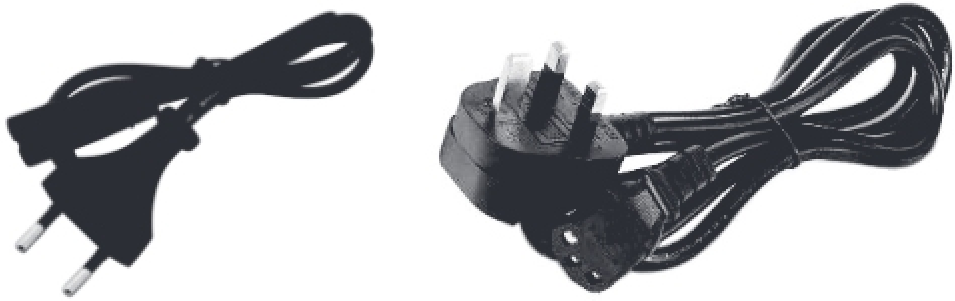

চিত্র ১.১০: দুই পিন ও তিন পিন পাওয়ার ক্যাবল

ফিউজ

ফিউজ এক ধরনের ইলেকট্রিক প্রটেক্টিং ডিভাইস যা পাওয়ার লাইন বা কোন যন্ত্র বা মেশিনের পাওয়ার সাপ্লাই এ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ফিউজ ইলেকট্রিক লাইনে উচ্চমাত্রার কারেন্ট প্রবাহের কারনে যন্ত্র বা মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। পাওয়ার লাইন (২২০ ভোল্ট এসি) বা এসি লাইনে যখন এই ফিউজ ব্যবহার হয় তখন তাকে কাট আউটও বলে। আবার কম্পিউটার পাওয়ার সাপ্লাই বা ইলেকট্রিক্যাল প্লাগে যখন ব্যবহার করা হয় তখন তাকে ফিউজ বলে ।

চিত্র ১.১১: বিভিন্ন প্রকার ফিউজ ও কাট আউট

সার্কিট ব্রেকার

ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিটের নিরাপত্তার জন্য সার্কিট ব্রেকার একটি নিরাপত্তা ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের প্রবেশ মুখে এই ডিভাইস ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে ফিউজের ব্যবহার দেখেছি। মূলত ফিউজের আধুনিক এবং স্বয়ংক্রিয় রূপ হলো এই সার্কিট ব্রেকার।

চিত্র ১.১২: সার্কিট ব্রেকার

সার্কিটে অতিমাত্রায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এই ব্রেকার ট্রিপ করে বা বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকটি ব্রেকারের গায়ে একটি নির্দিষ্ট রেটিং দেয়া থাকে। যেমনঃ ৫ এম্পিয়ার, ১০ এম্পিয়ার, ১৫ এম্পিয়ার, ২০ এম্পিয়ার,৩০ এম্পিয়ার ইত্যাদি। ব্রেকারের গায়ে দেয়া রেটিং এর বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই ব্রেকার বন্ধ হয়ে যায়।

ইলেকট্রিকাল ও ইলেকট্রনিক্স কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের টুলস

ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স কর্মক্ষেত্রে কাজের সময় অত্যাবশ্যকীয় যে সকল টুলস ব্যবহৃত হয় তাদের ছবি একটি ইলেকট্রিক্যাল টুলস ব্যাগে দেখানো হলো। এই তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন আকারের স্টার ও ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার, কাটিং প্লায়ার, লং নোজ প্লায়ার, ওয়্যার স্ট্রিপার, প্লাগ, টুইজার, সোল্ডারিং আয়রন, সাকার বা ডি সোল্ডারিং পাম্প, ডিজিটাল মালটিমিটার, গ্লু টিউব, অ্যালেন কী, মেজারিং টেপ বা ফিতা।

চিত্র ১.১৩ : ইলেকট্রিক টুল ব্যাগ

এই টুলসসমূহ ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স কাজে ব্যবহৃত হয় । স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে মেশিন, যন্ত্রপাতি ও ইকুইপমেন্ট খোলা হয় বা অ্যাসেম্বল করা হয়, কাটিং প্লায়ারস দিয়ে ওয়্যারসহ বিভিন্ন জিনিস কাটা হয়, লং নোজ প্লায়ারস দিয়ে ক্রিটিক্যাল স্থানের বস্তু ধরা হয়, ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে তারের ইনসুলেশন পৃথক করা ও তার

কাটা হয়, পাওয়ার কর্ড বিভিন্ন সময় তাৎক্ষণিকভাবে কোন যন্ত্র বা মেশিনে পাওয়ার সংযোগ দেয়ার জন্য কাজে লাগে।

ডিজিটাল মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা হয় এবং বিভিন্ন সার্কিট, তার বা ক্যাবল, ডিভাইসসমুহের কন্টিনিউটি টেস্ট করা হয়। যেসব স্থানে হাত দিয়ে কোন সুক্ষ ও ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি ধরা ও তোলা যায় না সেসব স্থানে টুইজার দিয়ে তা করা হয় । সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে তার জোড়া লাগানো হয়,ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদি ঝালাই করে সার্কিটে সংযোগ করা হয় এবং সাকার বা ডি সোল্ডারিং পাম্প দিয়ে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে গলানো ঝালাই তুলে কম্পোনেন্ট বা সংযোগ খোলা হয়। মেজারিং ট্যাপ দিয়ে কোন তার বা স্থানের দৈর্ঘ্য মাপা হয়, টর্চ দিয়ে সার্কিট বোর্ডের ভিতরে জটিল স্থানের ছোট কম্পোনেন্ট দেখা হয়। ইলেকট্রিক টেস্টার একজন ইলেকট্রিশিয়ানের সার্বক্ষণিক সংগী। এই টেস্টারের সাহায্যে ইলেকট্রিশিয়ান বা সাধারন মানুষ কোন সকেটে, তারের প্রান্তে কিংবা বৈদ্যুতিক লাইনে বিদ্যুতের উপস্থিতি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে। বিদ্যুতের উপস্থিতিতে বা সংস্পর্শে এই নিয়ন টেস্টারের ভিতরের নিয়ন বাল্বটি জ্বলে উঠে এবং বিদ্যুতের উপস্থিতিতে নির্দেশ করে।

চিত্র : ১.১৪ (ক) মেজারিং টেপ বা ফিতা (খ)ডিজিটাল টেস্টার (গ) সাধারন নিয়ন টেস্টার (ঘ)টর্চ লাইট

ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টস

বৈদ্যতিক সার্কিটে ব্যবহৃত হয় এমন সাধারণ কয়েকটি ইলেট্রিক্যাল পার্টস বা কম্পোনেন্ট হলো রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর , ট্রান্সফরমার, রিলেসহ আরো অনেক সামগ্রী।

রেজিস্টর

রেজিস্টর একটি দুই প্রান্তিক প্যাসিভ ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট যা কার্বন বা অন্য সব উপকরণ দিয়ে তৈরি এবং ইহা বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়। সার্কিটে লোড ব্যালেন্সিংসহ নানা কাজে রেজিস্টর ব্যবহার করা হয় । বিদ্যুত প্রবাহ নিয়ন্ত্রনে রেজিস্টর ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি রেজিস্টরের একটি নির্দিষ্ট মান থাকে, যা তার গায়ে রং এর ব্যান্ড দেখে বা মাল্টিমিটার দিয়ে পরিমাপ করা যায়। আগেই বলা হয়েছে রেজিস্টরের একক হলো ওহম। রেজিস্টার দুহি ধরনের হতে পারে। ফিক্সড রেজিস্টর এবং ভেরিয়েবল রেজিস্টর।

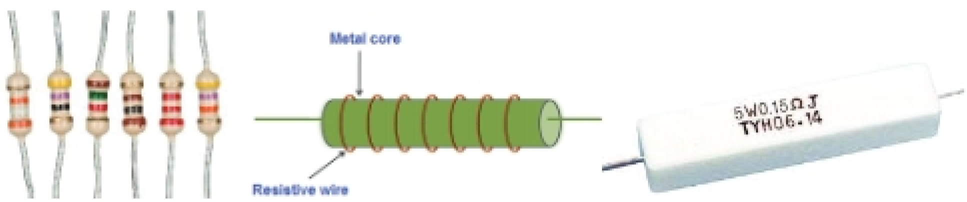

চিত্র ১.১৫ : বিভিন্ন ধরনের ফিক্সড রেজিস্টর

চিত্র ১.১৬ : বিভিন্ন ধরনের ভেরিয়েবল রেজিস্টর

ফিক্সড রেজিস্টরের মান অপরিবর্তণশীল। ভেবিয়েবল রেজিস্টরের মান ইচ্ছেমত পরিবর্তন করা যায়।

ক্যাপাসিটর

দুইটি সুপরিবাহী পদার্থ অর্থাৎ কনডাক্টর-এর মাঝে যদি কোন ইনসুলেটর দিয়ে একটিকে অপর থেকে আলাদা করে রাখা হয় তখন তার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত এসি এর কারণে, তার চার্জ ধারণক্ষমতা বেড়ে যায় । এই ধরনের চার্জ ধারন ক্ষমতাকে ক্যাপাসিটেন্স এবং চার্জ ধারককে ক্যাপাসিটর বলা হয় । ক্যাপাসিটররের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট এ ফ্রিকুয়েন্সী যত বেশী হবে বিদ্যুত প্রবাহে বাধা তত কম হবে । অর্থ্যৎ ক্যাপাসিটররের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট এর বাধা ফ্রিকুয়েন্সির মানের সাথে উল্টানুপাতিক । এই ক্যাপসিটররের মাধ্যমে কোন সার্কিটের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সীকে ফিল্টার করে ফেলা যায় । পাওয়ার সাপ্লাই এ ফিল্টার সার্কিট হিসেবে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় । এর একক ফেরাড এবং ক্যাপাসিটররের মান সচরাচর মাইক্রোফেরাড বা পিকোফেরাড হয়ে থাকে।

ক্যাপাসিটর এমন একটি ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এটি দুটি টার্মিনাল যুক্ত একটি প্যাসিভ বৈদ্যুতিক কম্পোনেন্ট । ক্যাপাসিটররের নাম সচরাচর তার ভিতরে ব্যবহৃত ইনসুলেটর এর নামে হয়ে থাকে। যেমন ইলেকট্রলাইট ক্যাপাসিটরে দুটি পরিবাহীর মাঝখানে ইনসুলেটর হিসেবে ইলেকট্রলাইট ব্যবহৃত হয়। আবার সিরামিক ক্যাপাসিটরে এই ইনসুলেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয় সিরামিক । এই জন্য এর নাম সিরামিক ক্যাপাসিটর। শিক্ষকের সহায়তায় নিম্নের ক্যাপাসিটরসমূহের ধরণ ও নাম লিখো।

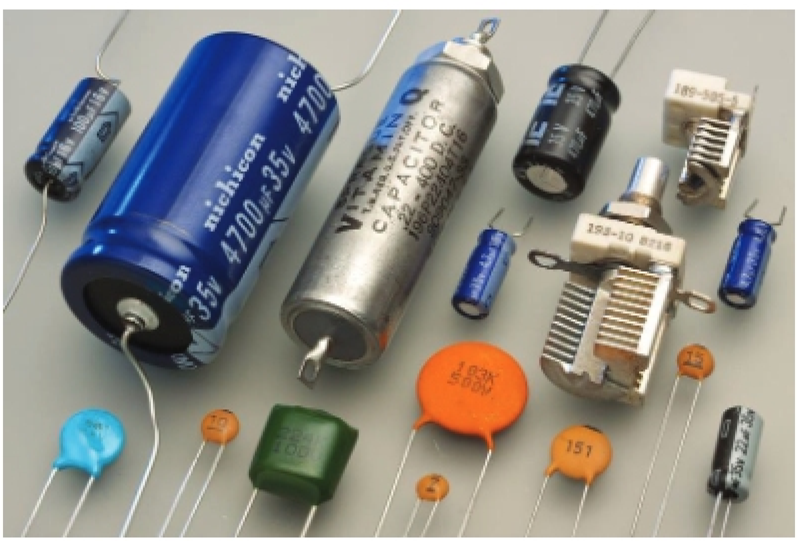

চিত্র ১.১৭: বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাসিটর

ইন্ডাক্টর

ইন্ডাক্টর, যাকে কয়েলও বলা হয়। এই ইন্ডাক্টর এক ধরনের প্যাসিভ দুই টার্মিনাল বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক কম্পোনেন্ট বা পার্টস । তারের কুন্ডলীর মধ্যে দিয়ে এসি প্রেরন করলে বাধার সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে ঐ ইন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টে ফ্রিকোয়েন্সির পরিমান বাড়ালে রেজিস্ট্যান্স এর মান বেড়ে যায়,অপর দিকে ফ্রিকোয়েন্সির মান কমালে রেজিস্ট্যান্স এর মানও কমে যায়। ফলে ফ্রিকোয়েন্সি নেই এমন ক্ষেত্রে অর্থ্যাৎ ডিসি কারেন্ট এর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় সর্বোচ্চ । এই ধরনের তারের কন্ডুলীকে বলা হয় ইন্ডাক্টর। এই ইন্ডাক্টর ফিল্টার সার্কিটে ফ্রিকোয়েন্সিকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইন্ডাক্টরের এই বৈশিষ্ট্যকে ইন্ডাক্ট্যান্স বলে। ইন্ডাক্ট্যান্স এর একক হেনরি ।

চিত্র ১.১৮: বিভিন্ন প্রকার ইন্ডাক্টর

ট্রান্সফরমার (Transformer)

ইংরেজি শব্দ " ট্রান্সফরম " থেকে " ট্রান্সফরমার " শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ রুপান্তর করা। ট্রান্সফর্মার (Transformer) একটি স্থির যন্ত্র বিশেষ যার সাহায্যে পাওয়ার ও ফ্রিকুয়েন্সী স্থির রেখে ম্যাগনেটিক ফিল্ড পরিবর্তনের মাধ্যমে এসি (AC) সাপ্লাই এর ভোল্টেজ (V) কমিয়ে বা বৃদ্ধি করে ব্যবহার করা যায়। ট্রান্সফরমার মুলত পাওয়ারকে স্থির মানে রেখে কারেন্ট বা ভোল্টেজকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে উহার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সরবরাহ করে থাকে। এই বিবেচনায় ট্রান্সফরমার হাই ভোল্টেজকে লো ভোল্টেজে বা লো ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজে পরিনত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ট্রান্সফরমার দুই প্রকার । স্টেপ ডাউন ও স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার। ট্রান্সফরমারে ম্যাগনেটিক কোর এর মধ্যে একপাশে তারের কুন্ডলীর প্রাইমারী ওয়াইন্ডিং এর অন্য পাশে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং করা থাকে।

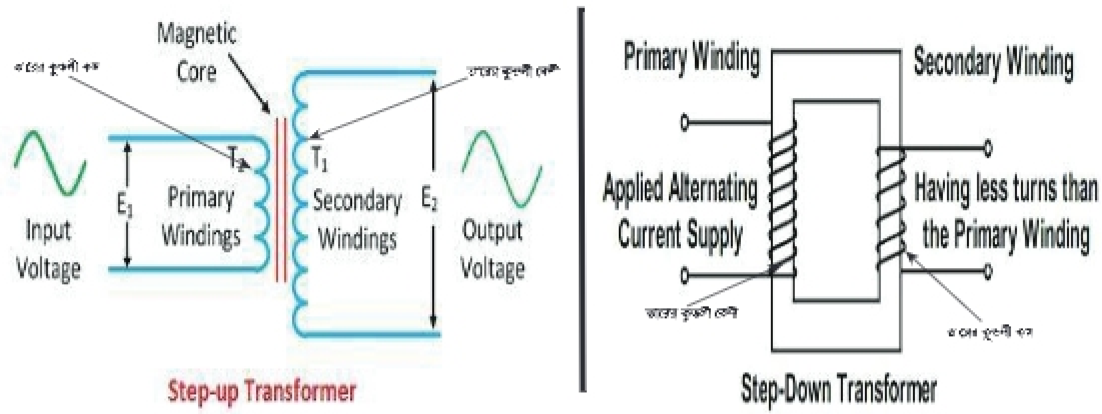

চিত্র ১.১৯: স্টেপ আপ এবং স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার এর প্রতিক

যে ট্রান্সফরমার বেশী মানের ভোল্টেজকে কম মানে রূপান্তর করে পাওয়ার ট্রান্সফার করে তাকে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার বলে । আর ট্রান্সফরমার কম মানের ভোল্টেজকে বেশী মানে রূপান্তর করে পাওয়ার ট্রান্সফার করে তাকে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার বলে।

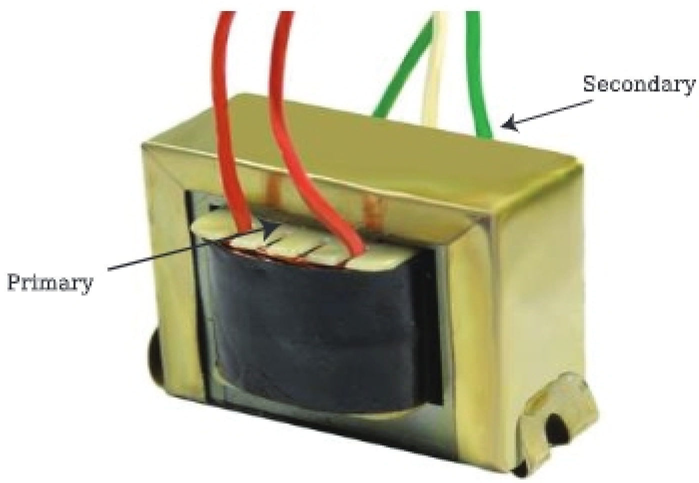

চিত্র ১.২০ : স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার ভৌত কাঠামো

২২০/৪৪০ ভোল্ট এসি বা ততোর্ধ মানের পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে বড় আকারের ট্রান্সিফরমার যেমন ব্যবহৃত হতে পারে তেমনি এডাপ্টর তৈরির জন্য ছোট ছোট ট্রান্সফরমার আইসিটি কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপরে এরূপ ছোট আকারের একটি স্টেপ ডাউন ট্রান্সিফরমার (ইনপুট ২২০ ভোল্ট এসি এবং আউটপুট ১২/৯/৬/৩ ভোল্ট এসি) ট্রান্সিফরমারের ভৌত কাঠামো দেখানো হলো।

ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই, ভোল্টেজ স্টাবিলাইজার ও পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেম

ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই

ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই ইলেকট্রনিক যন্ত্রাপাতি চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাগারে এই পাওয়ার সাপ্লাই বিভিন্ন মানের ডিসি ভোল্টেজ সরবরাহ করার জন্য কাজে লাগে । আবার পোর্টেবল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য দরকার হয় এডাপ্টর যা সরবরাহ লাইনের ২২০ ভোল্ট এসিকে ডিসি ৩/৫/৬/৬/১২ ভোল্ট এ রূপান্তর করে ব্যবহৃত হয় । এই সকল ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই যেমন বড় আকারের হতে পারে তেমনি ছোট এডাপ্টর হিসেবেও তৈরি করা যেতে পারে । মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপের চার্জারও এক ধরনের ডিসি এডাপ্টার ।

চিত্র ১.২১ (ক): ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই

চিত্র ১.২১ (খ) : ডিসি এডাপ্টার

ভোল্টেজ স্টাবিলাইজার

ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার হচ্ছে এক প্রকার বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র। মূল বৈদ্যুতিক লাইন থেকে বিদ্যুৎ এই ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কম্পিউটার, ফ্রিজসহ দামী ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রে প্রযোগ করা হয়। বিদ্যুতের হঠাৎ উত্থান-পতন বা ওঠা-নামাকে এই স্ট্যাবিলাইজার এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এই স্ট্যাবিলাইজারের ব্যবহারে মুল বৈদ্যুতিক লাইন থেকে অসম বিদ্যুৎ প্রবাহজনিত কারণে দামী যন্ত্রপাতির কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

চিত্র ১.২২: ভোল্টেজ স্টাবিলাইজার

আইপিএস এবং ইউপিএস (IPS and UPS)

IPS এর পূর্ণ নাম Instant Power Supply আর UPS এর পূর্ণ নাম Uninteruptable Power Supply । মেইন পাওয়ার সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে অল্প সময়ের ব্যবধানে আইপিএস চালু করে তাৎক্ষনিক কিছু সময়ের জন্য বাড়ি ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি বা পাখা চালানোর জন্য আইপিএস ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটার, সার্ভার বা সর্বসময় ডাটা ব্যাকআপ এর প্রয়োজন হয় এমন যন্ত্রপাতিতে কোন প্রকার বিরতি ছাড়া নিরবিচ্ছিন্ন পাওয়ার সরবরাহ করার প্রয়োজন হয় এমন গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ইউপিএস ব্যবহৃত হয় । কোন কারণে মেইন পাওয়ার সরবরাহ লাইন বন্ধ হয়ে গেলে ইউপিএস এই পাওয়ার লাইন সচল রেখে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি চালু রাখে ।

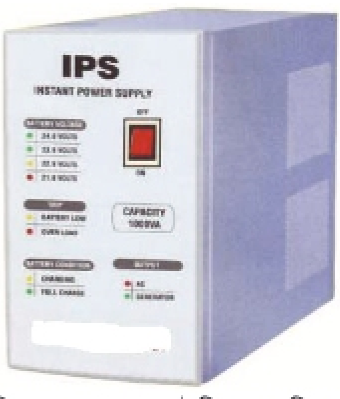

চিত্র ১.২৩ (ক): আইপিএস

চিত্র ১.২৩(খ): ইউপিএস (সামনের দিক)

চিত্র ১.২৩ (গ): ইউপিএস (পেছনের দিক)

২০১৪

১.৪ আইসিটি কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসসমূহ

সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস

আইসিটি কর্মক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসসমূহ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার রেকটিফায়ার ডায়োড, জিনার ডায়োড, লাইট ইমিটিং ডায়োড, ট্রানজিস্টর, রেগুলেটর, অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার ও ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি)সহ নানা প্রকার কম্পোনেন্ট । নিচে কিছু সাধারণ সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসের ছবি দেখানো হলো। তোমরা কী ইহাদের নাম বলতে পারবে। চল আমরা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে নিচের চিত্রে প্রদর্শিত সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসসমূহের নাম শিখি এবং প্রত্যেকটি ডিভাইসের নিচে তার নামগুলো লিপিবদ্ধ করি।

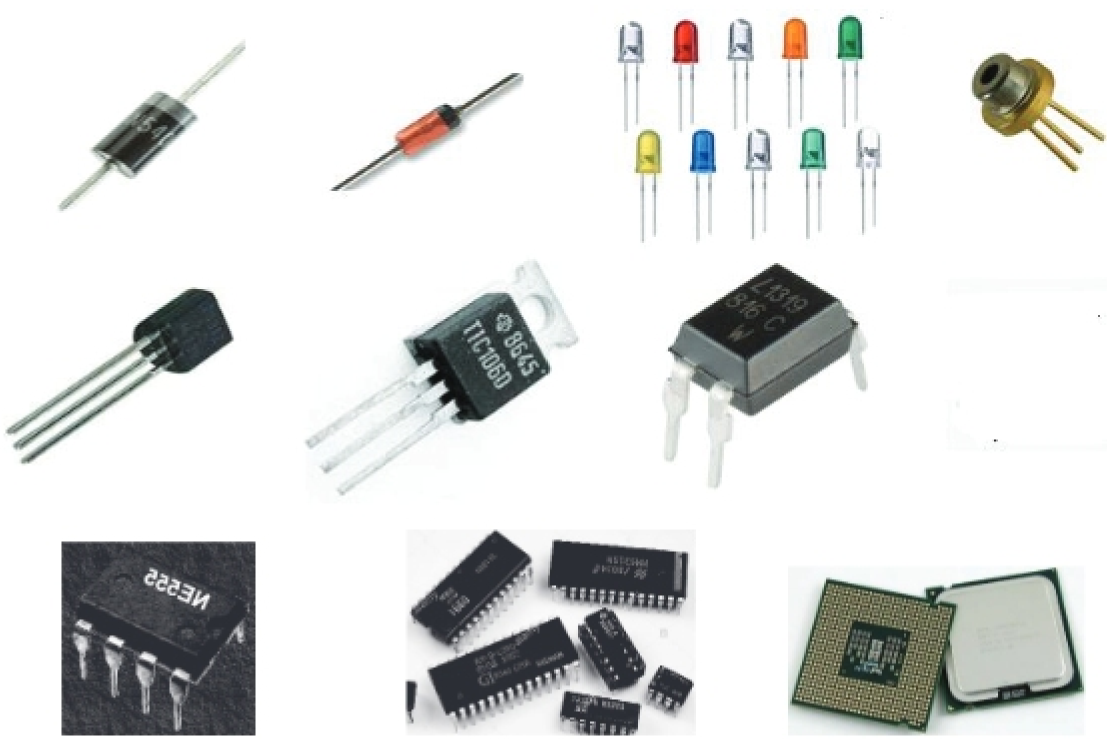

চিত্র ১.২৪: বিভিন্ন প্রকার সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস

এই সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসগুলো দিয়ে আমরা রেক্টিফিকেশন, অ্যামপ্লিফিকেশন, সুইচিং, ভোল্টেজ রেগুলেশনসহ নানা রকম কাজ করে থাকি। এখানে রেকটিফায়ার ডায়োড দিয়ে ভোল্টেজের ফ্রিকুয়েন্সি রেকটিফিকেশন এর কাজ করা হয়। পাওয়ার সাপ্লাই সার্কিটে এসিকে পালসেটিং ডিসিতে রূপান্তর করার জন্য রেকটিফায়ার ডায়োড ব্যবহৃত হয়। সকল প্রকার ডায়োড এর দুটি প্রান্ত থাকে। নিচের চিত্রে একটি রেকটিফায়ার ডায়োড এর প্রতিক ও ভৌত কাঠামো দেখানো হলো।

চিত্র ১.২৫ : রেকটিফায়ার ডায়োড এর প্রতিক ও ভৌত কাঠামো

জিনার ডায়োড

নিচে একটি জিনার ডায়োড এর প্রতিক ও ভৌত কাঠামো প্রদর্শিত হলো । এই ডায়োড ভোল্টেজ স্টাবিলাইজেশন বা রেগুলেশনের কাজে ব্যবহৃত হয় ।

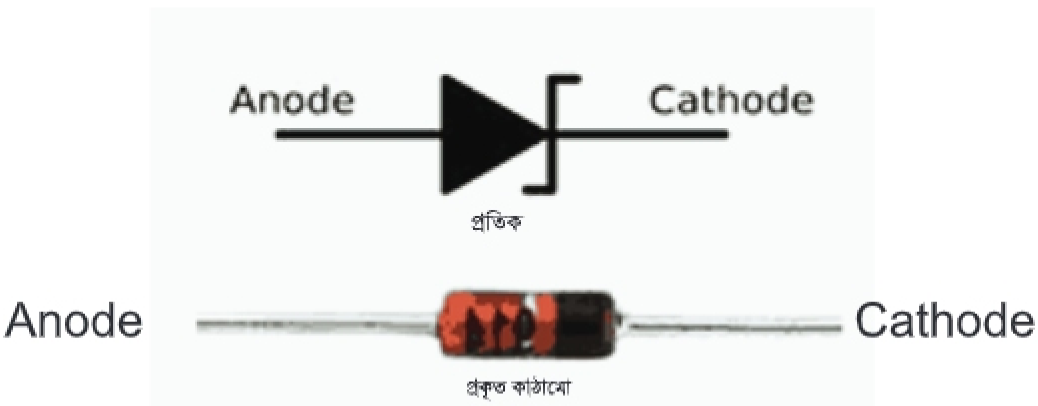

চিত্র ১.২৬ : জেনার ডায়োড এর প্রতিক ও ভৌত কাঠামো

LED (এলাইডি)

LED এর পূর্ন নাম Light Emmiting Diode । এই ডায়েডের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে আলো উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন রং এর আলো উৎপন্ন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রং এর এলইডি আছে।

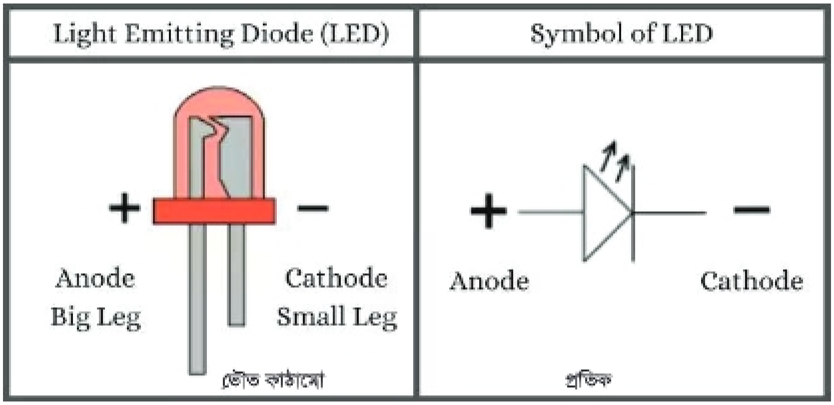

চিত্র ১.২৭ : LED এর ভৌত কাঠামো ও প্রতিক

ট্রানজিস্টর

তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সুচনালগ্নে ইলেকট্রনিক্সের বড়চেয়ে বড় আবিস্কার ট্রানজিস্টর । ভ্যাকুয়াম টিউব এর পরিবর্তে যখন এই সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস ট্রানজিস্টরটি আবিষ্কার হয় তখন খেকেই ইলেকট্রনিক্স জগতে অতি দ্রুত পরিবর্তনের হাওয়া লাগতে থাকে। এর ছোট আকার দিন দিন আরো ছোট হতে থাকে । ফলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি হতে থাকে আরও ছোট আর যন্ত্রের দাম কমতে কমতে তা মানুষের ক্রয় সীমায় আসতে থাকে। এই ট্রানজিস্টর মূলত ইলেকট্রনিক জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজ উচ্চ গতির সুইচিং ও ভোল্টেজ অ্যাম্প্লিফিকেশনের কাজ করে থাকে । বর্তমান জগতের মাইক্রোপ্রসেসর চিপ মুলত লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টরের একত্রিত একটি অবয়ব বই আর কিছু নয়। ট্রানজিস্টর এর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে ইহাকে PNP ও NPN, এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় ।। ট্রানজিস্টর তিন টার্মিনাল বা প্রান্ত বিশিষ্ট হয়ে থাকে । এই টার্মিনালগলো হলো ইমিটার, বেজ এবং কালেকটর । কোন ধরনের সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটারিয়েলস ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এই ট্রানজিস্টর বাইপোলার এবং মস এই দুই পরিবারভুক্ত হতে পারে

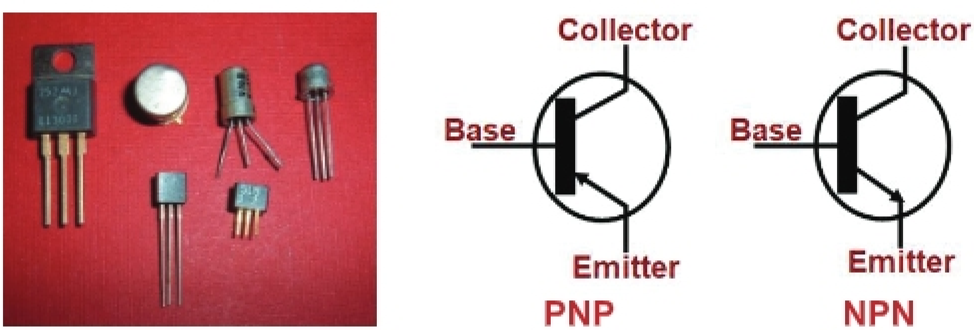

চিত্র ১.২৮ : বাইপোলার ট্রানজিস্টর এর ভৌত কাঠামো ও প্রতিক

MOSFET (মসফেট)

MOSFET এর পূর্ণ নাম Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর)। ইহা বাইপোলার ট্রানজিস্টরের চেয়ে অধিকতর কারেন্ট এ কাজ করতে পারে, টেকসই এবং দামী । বাইপোলার ট্রানজিস্টরের মতই এর তিনটি প্রান্ত থাকে । তবে নাম ভিন্ন হয়ে থাকে এই ট্রানজিস্টরের তিনটি টার্মিনালের নাম হচ্ছে ড্রেইন, গেট ও সোর্স ।

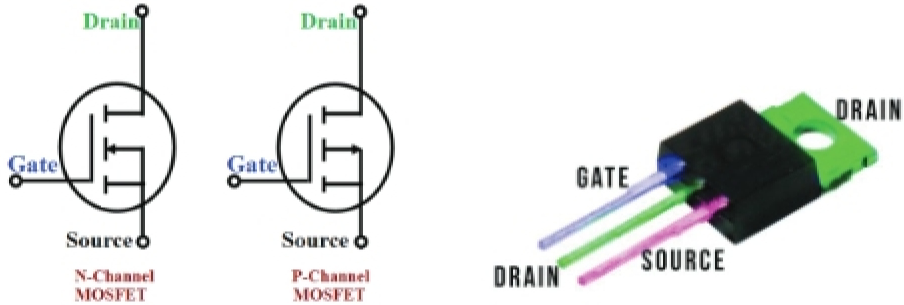

চিত্র ১.২৯ : MOSFET

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC):

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসি হলো মূলত সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস যেমন বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর বা ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর এবং ডায়োড এর সমন্বিত ইলেকট্রনিক সার্কিট । ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসিতে উল্লেখিত সেমিকন্ডাক্টর ব্যবহার করে বা বিশেষ ব্যবস্থার রেজিস্টর ও ক্যাপাসিটর ব্যবহার করে একটি পূর্ণাঙ্গ বৈদ্যুতিক সার্কিট ছোট একটি প্লাটফর্মে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কাজ করে থাকে । মাইক্রোপ্রসেসর, মাইক্রোকন্ট্রোলার ইত্যাদি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসির উদাহরণ। বর্তমান ইলেকট্রনিক সিস্টেমে অনেকগুলো আইসি এবং মাইক্রোপ্রসসর একত্র করে একটি সমন্বিত বোর্ডে শত শত সার্কিটের কাজ সম্পন্ন করা হয় । এই বোর্ডগুলো খুব সহজেই বিভিন্ন স্লট বা সকেটে সংযোগ করে ব্যবহার করা যায় ।

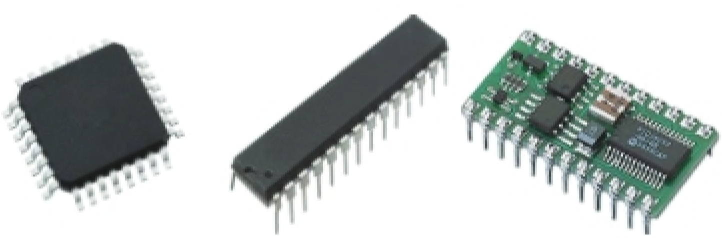

চিত্র ১.৩০: ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ও আইসি বোর্ড এর ভৌত কাঠামো

১.৫ মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট

কর্মক্ষেত্রে আমাদের কাজ করার সময় অহরহ রেজিস্ট্যান্স, ভোল্টেজ ও কারেন্ট পরিমাপ করতে হয় এবং সার্কিট এর সংযোগ বা পার্টস , কম্পোনেন্ট ও ডিভাইসসমূহের কন্টিনিউটি টেস্ট করার দরকার হয়। যে যন্ত্রসমূহ ব্যবহার করে এই কাজসমূহ করা যায় তাদের ইলেকট্রিক্যাল মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট বলা হয় । ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক সিস্টেমে এই মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট এর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয় । যেমন শুধুমাত্র ভোল্টেজ পরিমাপ করার জন্য ভোল্টমিটার, শুধুমাত্র কারেন্ট পরিমাপ করার জন্য অ্যামিটার, শুধুমাত্র রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করার জন্য ওহমমিটার ব্যবহৃত হয় । আবার এই তিনটি প্যারামিটার একই ইন্সট্রুমেন্ট এর সাহায্যে পরিমাপ করার জন্য রয়েছে এভোমিটার (AVO meter)। এভোমিটারকে মাল্টিমিটারও বলে। নিচের চিত্রসমূহে স্বতন্ত্র মিটারসহ এনালগ ও ডিজিটাল মালটিমিটার দেখানো হলো।এই মিটারসমূহের কোনটি কি মিটার এবং কিসের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা যায় তা তোমার শিক্ষকের সহায়ওতায় যেনে নাও এবং তোমর নোট খাতা তা লিপিবদ্ধ কর।

চিত্র১.৩১(ক): ভোল্টমিটার

চিত্র ১.৩১(খ) : অ্যামিটার

চিত্র ১.৩১(গ): ওহমমিটার

চিত্র ১.৩১(ঘ): এনালগ মালটিমিটার

চিত্র ১.৩১(ঙ) : ডিজিটাল মালটিমিটার

আইসিটি কর্মক্ষেত্রে একজন কর্মী বা পেশাজীবি সাধারণত মাল্টিমিটারই ব্যবহার করে থাকেন। নিচে চিত্র: ১.৩২-এ একটি এনালগ এবং চিত্র ১.৩৩-এ একটি ডিজিটাল মাল্টিমিটারের বাহ্যিক গঠন ও ফাংশনাল ইউনিটসমূহ দেখানো হলো।

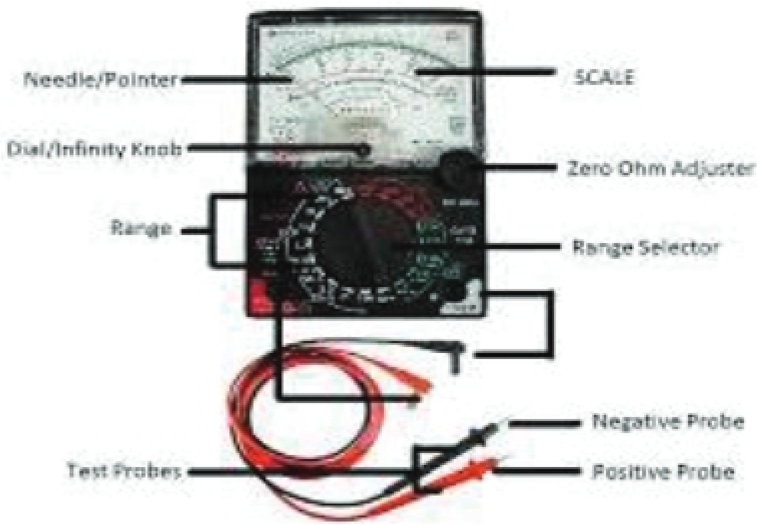

চিত্র ১.৩২ :এনালগ মাল্টিমিটারের বাহ্যিক গঠন ও ফাংশনাল ইউনিটসমূহ

চিত্র ১.৩৩ : ডিজিটাল মাল্টিমিটারের বাহ্যিক গঠন ও ফাংশনাল ইউনিটসমূহ

২০২৪

সার্কিটে মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট সংযোগ কৌশল

মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টর সাথে কম্পোনেন্টের সংযোগের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মনীতি আছে। যেমন ভোল্টমিটার লোডের প্যারালালে সংযোগ করতে হয় আবার অ্যামিটার লোডের সিরিজে সংযোগ করতে হয়। নিচে এরূপ এরকম কিছু সংযোগ পদ্ধতি দেখানো হল-

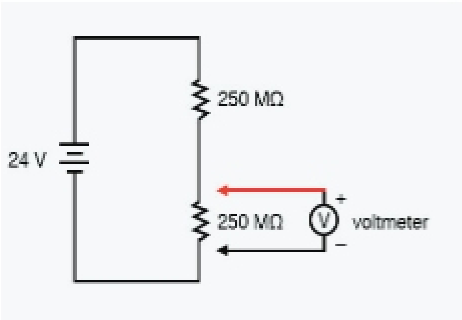

চিত্র ১.৩৩(ক): ভোল্টমিটার সংযোগ পদ্ধতি

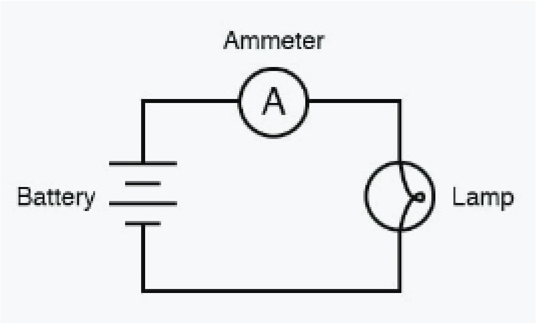

চিত্র১.৩৩(খ): অ্যামিটার সংযোগ পদ্ধতি

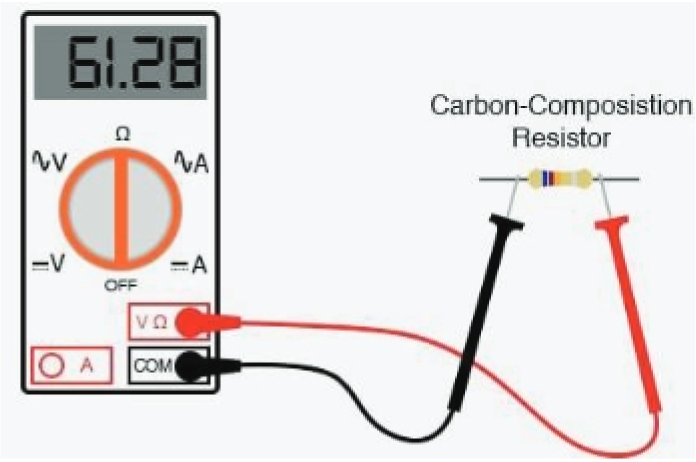

চিত্র ১.৩৩(গ): ওহমমিটার সংযোগ পদ্ধতি

১.৬ ইএসডি (ESD - Electrostatic Discharge) এর ধারণা

যখন বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস মানব দেহের সংস্পর্শে আসে, তখন মানুষের দেহ বা অংগ থেকে স্থির বিদ্যুৎ বা চার্জ ঐ ইলেকট্রনিক ডিভাইস এ যেতে পারে। মানবদেহ বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় এই চার্জ নির্গত হওয়াকে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক চার্জ বলে। ইলেকট্রনিক ডিভাইস বিশেষত বিশেষ বিশেষ আইসি ও মাইক্রোপ্রসেসর এ এই চার্জ প্রবেশ করলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই সকল সার্কিট নিয়ে কাজ করার সময় যাতে মানবদেহ থেকে উৎপন্ন এই চার্জ ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোকে প্রভাবিত বা নষ্ট করতে না পারে সেজন্য

Electrostatic Discharge এর ব্যবস্থা বা এক ধরনের প্রটেক্টিং ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ব্যবস্থা বা ডিভাইসকে ESD ডিভাইস বলে ।

চিত্র ১.৩৪(ক) : ইএসডি এন্টি-স্ট্যাটিক টেবিল মেট   চিত্র ১.৩৪(খ): ইএসডি এন্টি-স্ট্যাটিক রিস্টব্যান্ড

ইলেকট্রনিক কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ও ডিভাইসের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কর্মস্থল এর ফ্লোর এবং টেবিলে এন্টি-স্ট্যাটিক টেবিল মেট ব্যবহার করা হয়। আবার ইলেকট্রস্ট্যাটিক রিস্টব্যান্ড এরূপ একটি প্রটেক্টিং যন্ত্র যা ইলেকট্রনিক পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিগন সেনসেটিভ ডিভাইস নিয়ে কাজ করার সময় তা হাতের কব্জিতে পরিধান করে থাকে । এই রিস্টব্যান্ড এর অপর প্রান্তের ক্লিপটি যে যন্ত্রটি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তার মেটাল বডিতে লাগানো হয়, যাতে এন্টি-স্ট্যাটিক চার্জ সহজেই মেটাল বডিতে ডিসচার্জ হয়ে যেতে পারে ।

জব/এক্সপেরিমেন্ট

এক্সপেরিমেন্ট-১: কালার ব্যান্ড ও মাল্টিমিটার (Multimeter) ব্যবহার করে রেজিস্টরের মান নির্ণয়

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ব্যবহার নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা
- ইএসডি (ESD - Electrostatic Discharge) সতর্কতা অবলম্বন করা
- নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সংযোগ করা
- রেজিস্টরের মান কালার ব্যান্ড দেখে এবং মিটারের সাহায্যে নির্ণয় করা।
- প্রাপ্ত ফলাফল ছকে লিপিবদ্ধ করা
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী সুশৃঙ্খল ভাবে যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলি পুন:সংরক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রটি পরিষ্কার করা ।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ টি
২	মাস্ক	ধুলাবালি প্রতিরোধক মাস্ক	১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লোভস	কব্জি পর্যন্ত	১ টি
৪	ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ম্যাট	কর্মস্থলের উপযোগী	১ টি

যন্ত্রপাতি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	মাল্টিমিটার (এনালগ/ ডিজিটাল)	অ্যানালগ	১ টি
২	স্ক্রু-ড্রাইভার	চ্যাপটা	১ টি
৩	রেজিস্টর (কালার ব্যান্ডবিশিষ্ট)	যে কোন মানের	৩ টি

উপকরণ

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	কাগজ	এ৪ সাইজ (A4 Size)	২ শিট
২	পেন্সিল	২ বি	১ টি
৩	কলম	বল পয়েন্ট	১টি
৪	ইরেজার	ছোট আকারের	১টি

কাজের ধারা

(ক) **কালার ব্যান্ড ব্যবহার করে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপণ**

১। প্রয়োজনীয় মালামাল এবং ভিন্ন মানের এবং ধরনের তিনটি রেজিস্টর রিকুইজিশন স্লিপ দিয়ে সংগ্রহ করো।

Resistor Color Codes

	Value	Multiplier
Black	0	1
Brown	1	10
Red	2	100
Orange	3	1k
Yellow	4	10k
Green	5	100k
Blue	6	1M
Violet	7	10M
Grey	8	
White	9	

	Tolerance
Silver	10%
Gold	5%
Red	2%
Brown	1%

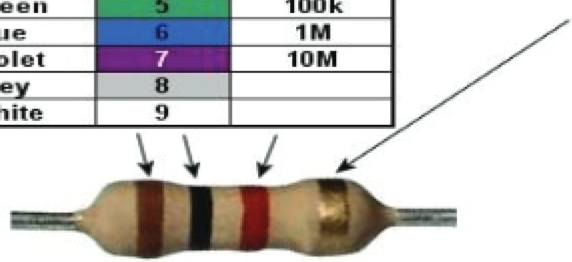

1 0 2 = 10*100 = 1k Ohm

রেজিস্টর কালার কোড

২। উপরোক্ত চিত্রে প্রদর্শিত কালার কোড ব্যবহার করে এবং নিয়ম মোতাবেক শিক্ষক বর্ণিত কৌশল ও নির্দেশনা অবলম্বন করে রেজিস্টরসমূহের মান ফলাফল ছকের নির্দিষ্ট কলামে লিপিবদ্ধ করো।

ক্রমিক নং	রেজিস্টর	কালারব্যান্ড হতে প্রাপ্ত মান	কালার কোড অনুযায়ী টলারেন্স	মিটার হতে প্রাপ্ত মান	উভয় মানের মধ্যে বিচ্যুতি	বিচ্যুতির কারণ
১	রেজিস্টর ১					
২	রেজিস্টর ২					
৩	রেজিস্টর ৩					

(খ) মালটিমিটার ব্যবহার করে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপণ

১। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধান মেনে মাল্টিমিটার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ করো।

২। প্রাপ্যতা বিচারে এনালগ বা ডিজিটাল যে কোন একটি মালটিমিটার নির্বাচন করো।

৩। মাল্টিমিটার এর + Ve প্রব (Probe) ও - Ve প্রব (Probe) দুটি চিহ্নিত কর। সচরাচর লাল প্রবটি পজিটিভ এবং কাল প্রবটি নেগেটিভ হয়ে থাকে ।

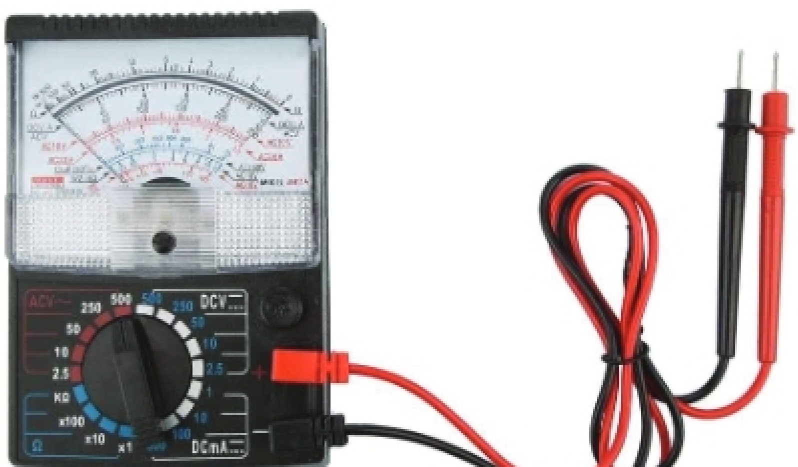

অ্যানালগ মাল্টিমিটার

৩। সিলেক্টর সুইচটি ওহম পরিমাপক পরিসীমায় রেখে প্রবদ্বয় শর্ট করে কাটার জিরো এডজাস্ট সম্পন্ন করো। প্রয়োজনে জিরো এডজাস্টমেন্ট কৌশল শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নাও।

৪। যে রেজিস্টরসমূহ এর মান নির্ণয় করতে হবে তার দুই প্রান্ত মিটারের দুই প্রবের সাথে যুক্ত করো।

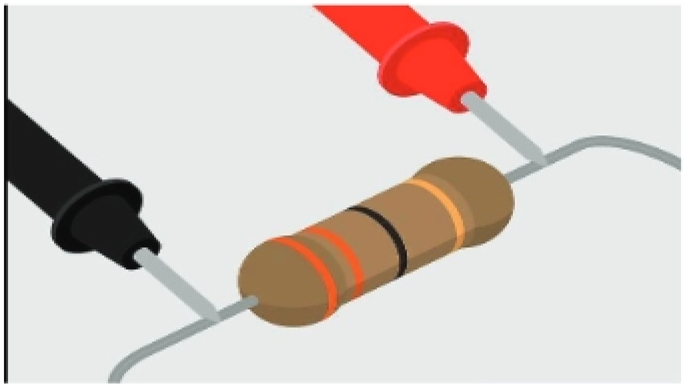

অথবা

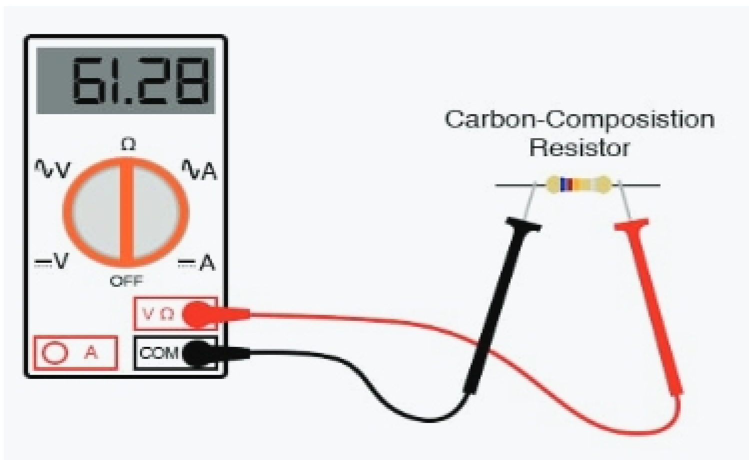

মিটারের সাহায্য রেজিস্টেন্স পরিমাপন

৫। এনালগ মিটারের ক্ষেত্রে মিটারের কাটা সঠিকভাবে অবলোকন করে মিটার রিডিং সংগ্রহ করো। ডিজিটাল মিটারের ক্ষেত্রে সরাসরি ওহমের মান স্ক্রীনে দেখা যাবে।

৬। এনালগ মিটারের ক্ষেত্রে মিটার রিডিংকে রেঞ্জ সিলেক্টর এর মান দিয়ে গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলই রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্সের মান।

৭। ফলাফল ছকের নির্ধারিত কলামে ফলাফল লিপিবদ্ধ করো।

৮। প্রাপ্ত উভয় ফলাফল এর বিচ্যুতি বিশ্লেষন করো।

জব/এক্সপেরিমেন্ট-২

মাল্টিমিটার (Multimeter) ব্যবহার করে ভোল্টেজ পরিমাপ করা।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ব্যবহার নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা
- ইএসডি (ESD - Electrostatic Discharge) সতর্কতা অবলম্বন করা
- নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সংযোগ করা
- ভোল্টেজ পরিমাপ করা।
- প্রাপ্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করা
- সুশৃঙ্খল ভাবে যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলি পুনঃসংরক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রটি পরিষ্কার করা ।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ টি
২	মাস্ক	ধুলাবালি প্রতিরোধক	১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লোভস	কব্জি পর্যন্ত	১ টি
৪	ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ম্যাট	কর্মস্থলের উপযোগী	১ টি

যন্ত্রপাতি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	মাল্টিমিটার (এনালগ/ ডিজিটাল)	অ্যানালগ	১ টি

২	স্ক্রু ড্রাইভার	চ্যাপটা/স্টার	১ টি
৩	ব্যাটারি	৯ ভোল্ট	০১টি
৪	লোড	যে কোন ডিসি লোড	

উপকরণ

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	কাগজ	এ৪ সাইজ	২ শিট
২	পেন্সিল	২ বি	১টা
৩	কলম	বল পয়েন্ট	১টি
৪	ইরেজার	রাবার	১টি

কাজের ধারা

১। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধান মেনে একটি মাল্টিমিটার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ করো।

২। এসি নাকি ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ করতে হবে তা নির্ধারণ করো।

৩। প্রাপ্যতা বিচারে ০১ ভোল্ট থেকে ২৫০ ভোল্ট পর্যন্ত ভোল্টেজ পরিমাপ করা যায় এমন একটি এনালগ বা ডিজিটাল মাল্টিমিটার সংগ্রহ করো।

৪। মাল্টিমিটার এর + Ve প্রব (Probe) ও - Ve প্রব (Probe) দুটি চিহ্নিত কর। সচরাচর লাল প্রবটি পজিটিভ এবং কাল প্রবটি নেগেটিভ হয়ে থাকে ।

২০২৪

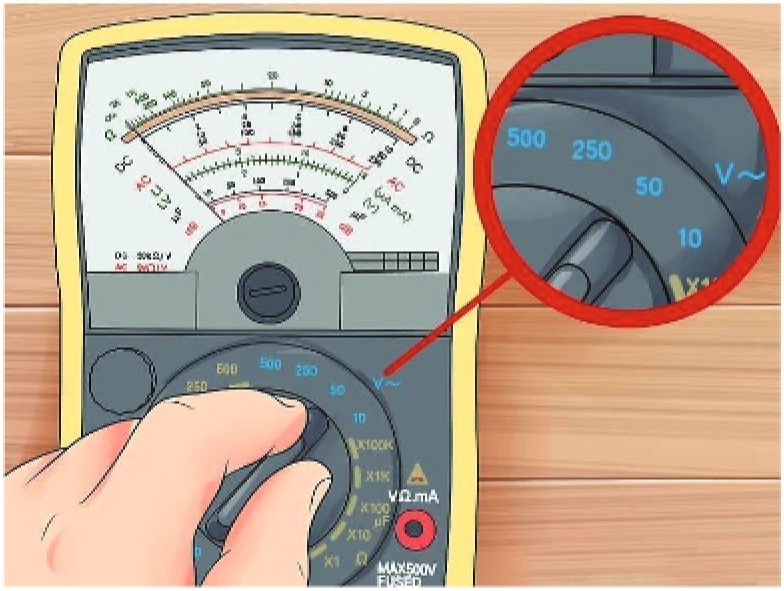

মিটারের ভোল্টেজ রেঞ্জ

৫। সিলেক্টর সুইচটি এসি ভোল্টেজ এর ক্ষেত্রে এসি পরিসীমায় (Rang) এবং ডিসি ভোল্টেজ এর ক্ষেত্রে ডিসি পরিসীমার (Rang) সম্ভাব্য পরিমাপক ভোল্টেজ লেভেলের চেয়ে উচ্চতর লেভেল এ সেট করো।

৬। ডিসি ও এসি ভোল্টেজ সোর্সসমূহ নিৰ্দিষ্ট করো।

৭। যে সোর্স এর ভোল্টেজ পরিমাপ করতে হবে তার প্যারালালে অ্যাভোমিটারের প্রব দুটি সংযোগ কর, এক্ষেত্রে সোর্স ভোল্টেজ ডিসি হলে মিটারের লাল(পজিটিভ) প্রব সোর্স এর পজিটিভ প্রান্ত আর মিটারের নেগেটিভ প্রব সোর্স ভোল্টেজের নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করো।

৬। অ্যাভোমিটারের নির্দেশক (Indicator) কাঁটাটির অবস্থান সঠিকভাবে দেখে ভোল্টেজ পরিমাপ করে ফলাফল ছকে লিপিবদ্ধ করো।

ক্রমিক নং	ভোল্টেজ সোর্স	সোর্স ভোল্টেজ এর পরিমান	ডিজিটাল মিটারে পরিমাপকৃত ভোল্টেজ	এনালগ মিটারে পরিমাপকৃত ভোল্টেজ	পর্যবেক্ষণ মন্তব্য
১	সোস- ১ (ডিসি) ব্যাটারি বা ডিসি আউটপুট				
২	সোর্স- ২(এসি) লাইন ভোল্টেজ বা সার্কিটের এসি আউটপুট				

এনালগ মিটারে ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপণ

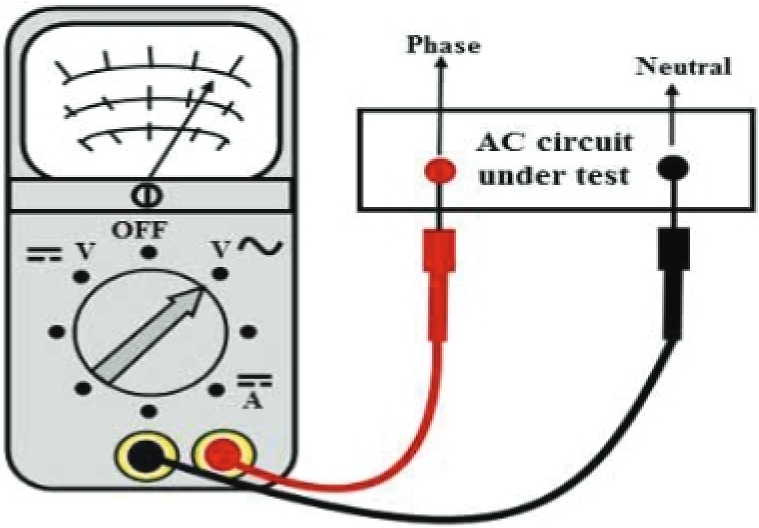

এনালগ মিটারে এসি ভোল্টেজ পরিমাপণ

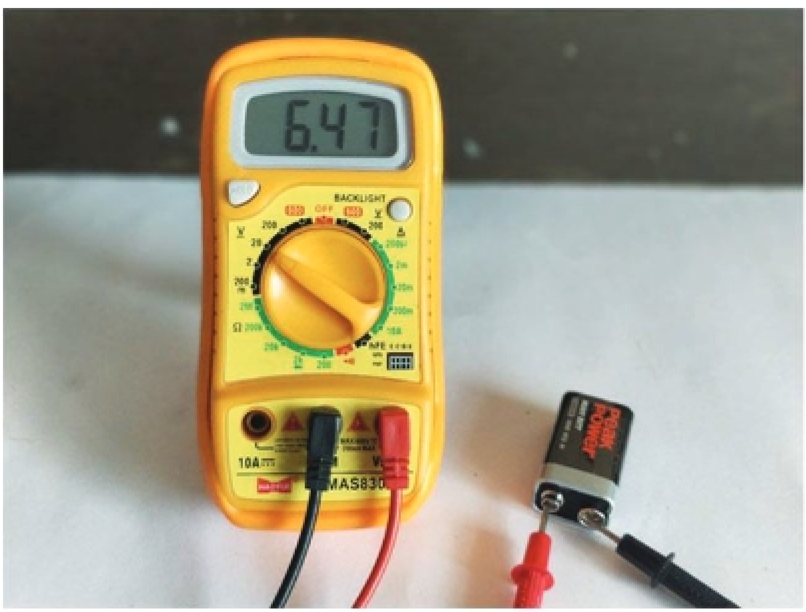

ডিজিটাল মিটারে ডিসি (ব্যাটারি) ভোল্টেজ পরিমাপণ

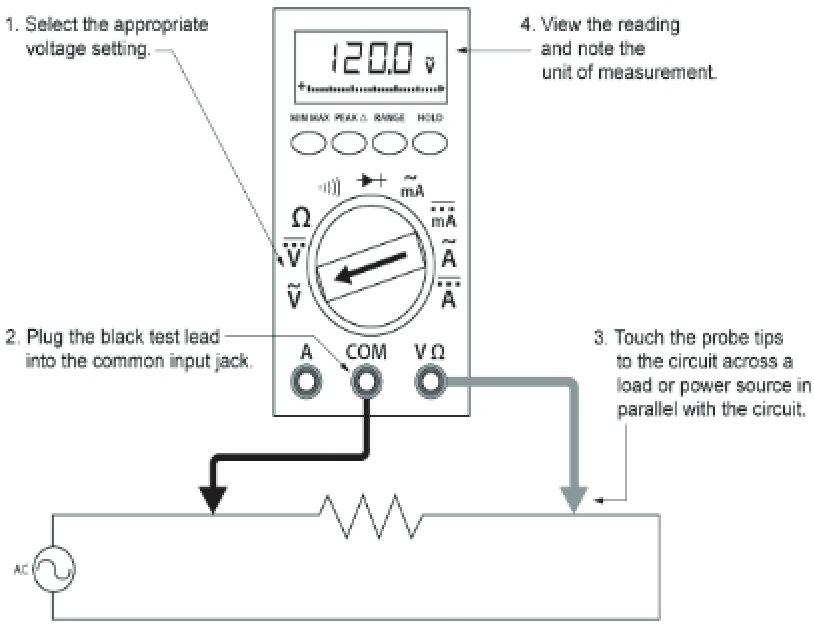

ডিজিটাল মিটারের সাহায্যে প্যারালাল সার্কিটে এসি ভোল্টেজ পরিমাপণ

সতর্কতা : মিটারের প্রব সংযোগের সময় সঠিক প্রব সঠিক প্রান্তে সংযোগ করতে হবে। ভোল্টেজ সোর্স থেকে ইলেকট্রিক শক লাগার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে তা পরিহার করতে হবে।

জব / এক্সপেরিমেন্ট-৩

মাল্টিমিটার (Multimeter) ব্যবহার করে বিদ্যুৎ প্রবাহ (Current) পরিমাপ করা।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ব্যবহার নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা
- ইএসডি (ESD - Electrostatic Discharge) সতর্কতা অবলম্বন করা
- নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সংযোগ করা
- সংযোগের যথাযথ নিয়ম অনুসরন করে অ্যামিটার সার্কিটের সঠিক প্রান্তে সিরিজে সংযোগ করা
- সতর্কতার সাথে কারেন্ট পরিমাপ করা
- প্রাপ্ত ফলাফল ছকে লিপিবদ্ধ করা
- সুশৃঙ্খল ভাবে যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলি পুনঃসংরক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রটি পরিষ্কার করা ।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ টি
২	মাস্ক	ধুলাবালি প্রতিরোধক	১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লোভস	কব্জি পর্যন্ত	১ টি
৪	ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ম্যাট	কর্মস্থলের উপযোগী	১ টি

যন্ত্রপাতি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	মাল্টিমিটার (এনালগ/ ডিজিটাল)	অ্যানালগ	১ টি
২	স্ক্রু ড্রাইভার	চ্যাপটা/ স্টার	১ টি
৩	ব্যাটারি	৯ ভোল্ট	০১টি
৪	লোড	বৈদ্যুতিক বাতি	০১ টি

উপকরণ

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	কাগজ	এ৪ সাইজ (A4 Size)	২ শিট
২	পেন্সিল	২ বি	১টা
৩	কলম	বল পয়েন্ট	১টি
৪	ইরেজার	ছোট আকারের	১টি

কাজের ধারা

১। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধান মেনে একটি মাল্টিমিটার ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ করো।

২। এসি না ডিসি কারেন্ট পরিমাপ করতে হবে তা নির্ধারণ করো।

৩। ডিজিটাল মিটারের ক্ষেত্রে সিলেক্টর নব এসি বা ডিসি-তে সেট করো।

৪। অ্যানালগ মিটারের ক্ষেত্রে সিলেক্টর সুইচটিকে সঠিক অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জ এর মধ্যে সেট করো।

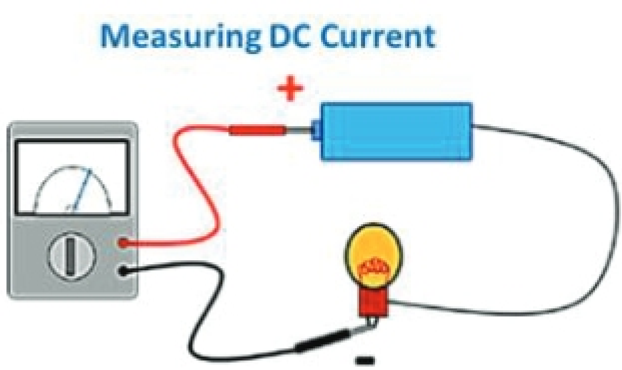

৫। ডিজিটাল মাল্টিমিটারএর ক্ষেত্রে কালো প্রবটি কমন এর সাথে এবং লাল প্রবটি অ্যাম্পিয়ার (A) প্রান্তের সাথে নিচের চিত্রের মতো যুক্ত করো।

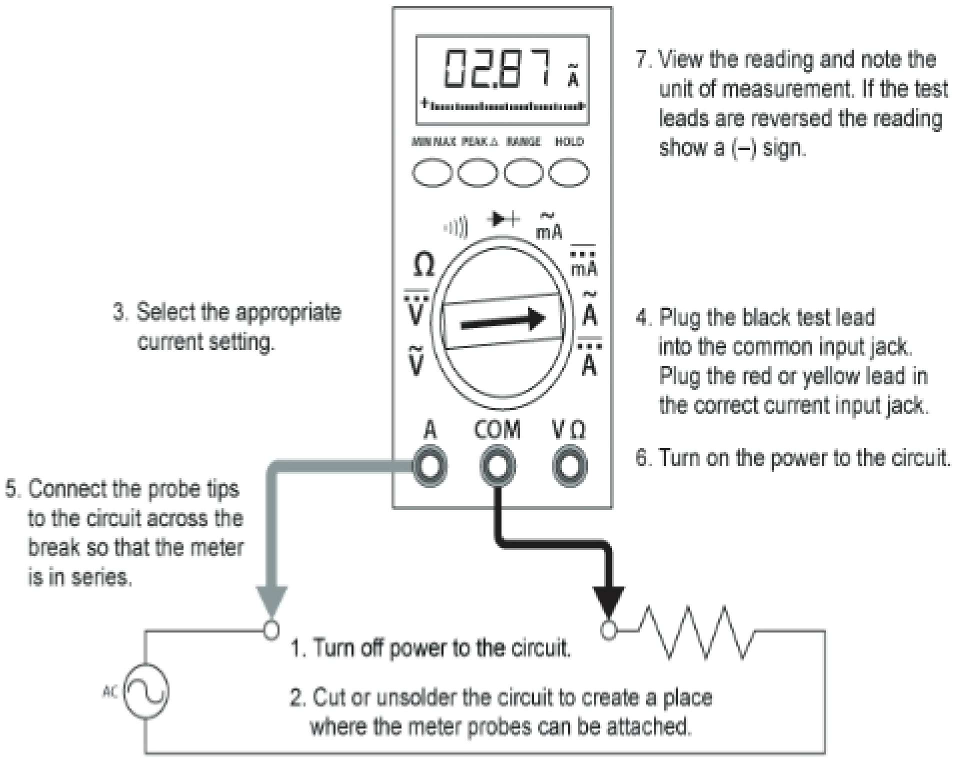

৬। ডিসি বা এসি এর সোর্স ও ভোল্টেজ নিদিষ্ট করো।

৭। যে সোর্স এর কারেন্ট পরিমাপ করতে হবে তার সিরিজে মাল্টিমিটারের দুটি প্রবকে সংযোগ করো।

৮। এনালগ মাল্টিমিটারের ক্ষেত্রে নির্দেশক (Indicator) কাঁটাটির অবস্থান সঠিকভাবে দেখে কারেন্ট এর পরিমান ফলাফল ছকে লিপিবদ্ধ করো।

৯। ডিজিটাল মাল্টিমিটারের ক্ষেত্রে মিটারের স্ক্রীনে সরাসরি কারেন্ট এর মান দেখা যাবে। প্রদর্শিত মান ফলাফল ছকে লিপিবদ্ধ করো।

ক্রমিক নং	ভোল্টেজ সোর্স	সোর্স ভোল্টেজ এর পরিমান	ডিজিটাল মিটারে পরিমাপকৃত কারেন্ট	এনালগ মিটারে পরিমাপকৃত কারেন্ট	পর্যবেক্ষণ মন্তব্য
১	সোস- ১ (ডিসি)				
	ব্যাটারি বা ডিসি আউটপুট				
২	সোর্স- ২(এসি) লাইন ভোল্টেজ বা সার্কিটের এসি আউটপুট				

বিশেষ সতর্কতা

অপ্রয়োজনে বৈদুতিক লাইনে হাত দেয়া থেকে বিরত থাকবে। মিটার গুলো সঠিক নিয়মে সংযোগ দিতে হবে। কারেন্ট পরিমাপনে সিরিজ সার্কিটে সংযোগের সতর্কতা অবশ্যই মেনে চলবে। বৈদ্যুতিক কাজের সময় অপরিবাহী বারার বা চামড়ার জুতা এবং হ্যান্ড গ্লোভ্স অবশ্যই পরিধান করতে হবে।

অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইলেকট্রিসিটি কী?

২. ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স এর মধ্যে পার্থক্য কী?

৩. সুইচ কি কাজে ব্যবহৃত হয় ?

৪. ইন্ডাক্টর কোন ধরনের কম্পোনেন্ট ? ইন্ডাক্টারের বৈশিষ্ট্য কী।

৫. এসি ও ডিসি এর মৌলিক পার্থক্য কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ট্রানজিস্টরের কাজ কী ? ট্রানজিস্টর কত প্রকার ও কী কী ?

২. ইলেকট্রিক্যাল কর্মক্ষেত্রে পিপিই জরুরি কেন?

৩. ইএসডি কী, কেন প্রয়োজন ?

৪. ক্যাপাসিটারের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস যন্ত্রাপাতির দুইটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করো।

২. ডায়োড এর প্রকারভেদ করে প্রত্যেক প্রকারের কাজ বর্ণনা করো।

৩. ইলেকট্রিক্যাল কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এমন পাঁচটি পিপিইর নাম ও কাজ লেখ।

৪. মালটি মিটারের কাজ কী? এনালগ ও ডিজিটাল মালটিমিটারের পার্থক্য লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হেলথ, সেফটি অ্যান্ড ইথিকস ফর আইসিটি

Health Safety and Ethics for ICT

স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও আইসিটি নীতি হলো বিশেষ ধরনের এমন কিছু বিধি বিধান যা কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি কমাতে এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাবশ্যক। ওএসএইচ মানদন্ডের লক্ষ্য হলো কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করা। এই বিষয়সমুহ অসুস্থতা বা মৃত্যুর মতো বিপদ থেকে রক্ষা পেতে প্রত্যেকেই মেনে চলতে হয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন। কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নৈতিক বিষয়সমূহ, ঝুঁকি সনাক্ত, জরুরী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন, আইটি কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি করা। এই অধ্যায়ে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও আইসিটি ইথিকস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

১। তথ্য প্রযুক্তি কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সমস্যা ও হ্যাজার্ডসমূহ চিহ্নিত করতে পারব

২। আইসিটি কর্মক্ষেত্রে বসার ভঙ্গি ও স্ক্রীনের অবস্থান সেট করতে পারব

৩। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সমূহের ব্যবহারে অভ্যস্ত হব

৪। তথ্য প্রযুক্তির কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকিসমূহ থেকে নিজেকে সুরক্ষা করতে পারব

৫। সোশাল মিডিয়ার আসক্তি ও ক্ষতিকর দিকসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করব

৬। জরুরী পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণ করে তা পালন করতে পারব

৭। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিক বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে তা পালনে অভ্যস্ত হব

৮। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কাজের পরিবেশ বজায় রাখতে পারব ।

২.১ কর্মক্ষেত্রে হ্যাজার্ড

সাবধানতা অবলম্বন এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও ঝুঁকি সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশে সাধারণত কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। কাজকে নিরাপদ করতে হলে কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ করতে হবে। কর্মরত সবাইকে কিভাবে কর্ম ক্ষেত্রে নিরাপদে রাখা যায় সেই কাজগুলো করতে হবে। যে কোন চাকরিতে সম্ভাব্য অনেক ধরনের ঝুঁকি থাকে। সেটি শিল্প-কারখানাতেই হোক আর হাতের দ্বারা চালিত কাজেই হোক। এইসব ঝুঁকির মধ্যে নিরাপদে কাজ করতে শেখা যেমন গুরত্বপূর্ণ তেমনি কিভাবে একজন দক্ষ শ্রমিক হতে হয় সেটাও গুরত্বপূর্ণ। নতুন চাকরিতে প্রবেশ করলে আপনাকে অবশ্যই নিরাপত্তার কথাটা মাথায় রাখতে হবে। নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজের তাই নিজেকে অবশ্যই সেই দায়িত্ব নিতে হবে। কিছু কিছু ঝুঁকি আছে যা মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে আহত করে ফেলতে পারে আবার কিছু কিছু ঝুঁকি ধীরে ধীরে কর্মীদের অসুস্থ করে তুলতে পারে। সে কারণে শ্রমিকদের উচিত সব ধরনের ঝুঁকিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা। এমনকি তাৎক্ষণিকভাবে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা নেই এমন ঝুঁকিকে ও গুরত্ব দিতে হবে।

কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকিসমুহকে সাধারনত প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন

১. ভৌত বা শারীরিক ঝুঁকি
২. রাসায়নিক ঝুঁকি
৩. জৈবিক ঝুঁকি
৪. আর্গনোমিক ঝুঁকি
৫. মনোসামাজিক ঝুঁকি

ভৌত ঝুকি

কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের বস্তু বা উপাদানের কারণে যে বিপদের সৃষ্টি হয় তাই ভৌত বিপদ বা ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড। বিভিন্ন ধরণের পড়ে থাকা বস্তু বা উপাদান যেমন- যন্ত্রপাতি, মেশিন, বিদ্যুৎ এর তার, অত্যাধিক তাপ বা ঠান্ডা, আর্দ্রতা, অতি শব্দ, কম্পন, চলন্ত বস্তু, কাজের অবস্থা এবং স্থান ইত্যাদিকে ভৌত ঝুঁকি বলে।

রাসায়নিক ঝুঁকি

বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যেমনঃ এসিড, ক্ষার, ডাইস, পেইন্ট, কুয়াশা, দ্রাবক, কটন ডাস্ট, গ্যাস বাষ্প, ওয়েল্ডিং ধোঁয়া, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, ক্রোমিয়াম, লেড বা সীসা ইত্যাদি থেকে যে ঝুকির সৃস্টি হয় তাকে রাসায়নিক ঝুঁকি বলে। কাঁচামালসমূহ, উৎপাদিত পণ্য, বিক্রিয়াকারী পদার্থ কখনো কখনো ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। যেমন- বিস্ফোরণ, বিকিরণ, বিক্রিয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিষবাষ্প, মরিচা পড়া, জ্বালাপোড়া, ক্যান্সার ইত্যাদি।

জৈবিক ঝুঁকি

ক্ষুদ্র-অনুজীব এবং তাদের বিপাকীয় ক্রিয়ার কারণে যে বিপদ হয় তাদের জৈবিক ঝুঁকি বা হ্যাজার্ড বলে। যেমন -(ক)নর্দমার পানিতে সাধারণত বিভিন্ন ধরণের অনুজীব থাকে। সালফারযুক্ত দ্রব্য (যেমন-গ্রিজ, তেল ইত্যাদি) আহার করলে তাদের শরীরে বিপাকীয় উৎপাদক হিসেবে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নিঃসরণ করে। নির্দিষ্ট মাত্রার হাইড্রোজেন সালফাইড খুবই বিষাক্ত। এসবের কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া এবং পরজীবি কীট যেগুলো ধুলা বালিতে ভেসে বেড়ায়, তাদের কারণে শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা হয়। এটি এক ধরণের জৈবিক বিপদ। করোনা ভাইরাস গোত্রের কভিড-১৯ ভাইরাস একটি জৈবিক হ্যাজার্ড, যার কারনে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে।

(খ) প্রাণি এবং প্রাণির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (চামড়া, পশম, চুল ইত্যাদি) থেকে তৈরি পণ্য জৈবিক বিপদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস বা পরজীবি কীট, আক্রান্ত পশু, কোনো ব্যক্তি বা দূষিত জৈবিক তরলের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। যেমন- অ্যানথ্রাক্স (ব্যাকটেরিয়া), টিউবারকিউলোসিস (মাইকোব্যাকটেরিয়াম), এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি (ভাইরাস), অ্যাসপারজিলাস (ফাংগি), বাইসিনোসিস (এনডোটক্সিন), বার্ড ফ্লু (ভাইরাস), ম্যাড কাউ, সোয়াইন ফ্লু ইত্যাদি।

মনোসামাজিক ঝুঁকি

কর্মক্ষেত্রে কাজ সম্পর্কিত অথবা কাজের অবস্থানগত বিষয় যা কর্মীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে। এই ধরনের হ্যাজার্ড কে মনোসামাজিক হ্যাজার্ড বলে। ফলে মনোসামাজিক বিপদ সৃষ্টি হয়। যেমন- মানসিক বিষাদ, কাজের প্রতি একঘেয়েমী ভাব, অস্বস্তি এবং জ্বালাপোড়া ইত্যাদি।

২.২ ঝুঁকি অপসারন

যেখানে কোনো হ্যাজার্ড নেই সেখানে আঘাত পাওয়া বা অসুস্থ হওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

- যেখানে সেখানে পড়ে থাকা বস্তুকে দূর করে হোঁচট খেয়ে পড়ার মতো বিপদ দূর করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ বর্জন করতে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি পরিহার করতে হবে।
- ক্ষতিগ্রস্থ যন্ত্রপাতি অতি দ্রুত মেরামত করতে হবে।
- অতিরিক্ত ফটোকপি এবং বই বা পাডুলিপির পরিবর্তে ই-মেইলের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- ব্যবহারকারীর কর্মযোগ্যতার সাথে নতুন যন্ত্রপাতির সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

২.৩ বিপদ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ

শিল্পকারখানায় বিপদ নিয়ন্ত্রণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিল্পকারখানার ডিজাইন করা থেকে শুরু করে উৎপাদনের সময় এবং কারখানা বন্ধ করা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া মেনে চলা হয়। এখানে আমরা বিপদ নিয়ন্ত্রণের মূল ও প্রাথমিক ধারণাগুলো বর্ণনা করছি।

বিপদ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ

- বিপদ সনাক্তকরণ
- বিপদের তালিকা তরি
- বিপদ র‍্যাংকিং করা বা শ্রেণি নির্ধারিণ করা
- বিপদের সম্ভাবনা অ্যাসেস করা
- বিপদ দূরীকরণ বা কমানো বা নিয়ন্ত্রণ করা।

কর্মক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপদসমূহকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত এবং তালিকা করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ হলো, সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতা অনুসারে বিপদকে র‍্যাংকিং করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে বিপদ সমূহকে ঝুঁকির স্তর অনুসারে নিম্ন থেকে উচ্চ মান অনুসারে র‍্যাংকিং করতে হবে। পরবর্তীতে বিপদের ঝুঁকি দূর করার জন্য ভিন্ন কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। যেটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিপদকে কম ঝুঁকিপূর্ণ বিপদে রূপান্তর করবে অথবা বিপদকে দূর করবে। এটি সত্য যে, সকল বিপদ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়, কিন্তু প্রস্তুতি এমনভাবে থাকা উচিত যেন সহজেই বিপদ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) ক্রম বা পর্যায়

- কর্মক্ষেত্র থেকে ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে। এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। উদাহরণস্বরূপ একটি শান্ত পরিবেশ থেকে একটি শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিন সরিয়ে নিতে হবে।
- বিপদ সৃষ্টিকারী পদার্থের পরিবর্তে কম ক্ষতিকারক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে। যেমন- অ্যাজমা বৃদ্ধিকারক পদার্থ থাকবে না এমন পেইন্ট ব্যবহার করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্র থেকে বিপদ সরিয়ে ফেলা যেমন- ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- উৎস থেকে হ্যাজার্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। হ্যাজার্ড উৎস বন্ধ করার জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির ডিজাইন পুনরায় করতে হবে। গার্ড অথবা বায়ু চলাচলের ব্যবস্থার জন্য পুনরায় ডিজাইন করতে হবে।
- প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ-এটি প্রশাসনিক কৌশল যা কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে।

২.৪: তথ্য প্রযুক্তির কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহের প্রকারভেদ

১. কম্পিউটারের অবস্থানগত সমস্যা
২. দেহভঙ্গি সমস্যা
৩. চোখ ও দৃষ্টি বৈকল্য
৪. শ্রবণ বিভ্রাট

৫. অস্থিসন্ধিতে ব্যথা
৬. উচ্চ রক্তচাপ
৭. স্থূলতা বা মেদবাহুল্য
৮. রক্তের ঘনীভূবন
৯. রিপিটেটিভ স্ট্রেইন ইনজুরি
১০. রেডিয়েশন বা বিকিরণ ঝুঁকি
১১. ইন্টারনেটে আসক্তি

এরগোনোমিক্স বা দেহভঙ্গিগত সমস্যা

চিত্র ২.১:বসার ভঙ্গি ও স্ক্রীনের অবস্থান

কম্পিউটার এ কাজ করার সময় অবশ্যই নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে

১. কী-বোর্ডে কাজ করার সময় সঠিক বডি পোশ্চার বজায় রাখতে হবে । পিঠের স্বাস্থ্য ঝুকি থেকে নিস্তারের জন্য একটি ব্যাক সাইড সাপোর্টেড চেয়ার ব্যবহার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে তোমার ব্যাকবোন যেন সোজা থাকে।
২. খেয়াল রাখতে হবে পায়ের পাতা যেন মেঝেতে সমান্তরালে থাকে।
৩. ঘাড় বাকানো বা ঘোরানো থেকে বিরত থাকতে হবে ।
৪. ঘাড় সোজা রাখতে হবে, কোমরে বা পেছনে সাপোর্ট থাকবে, বসার স্থান আরামদায়ক হতে হবে, চেয়ারের উচ্চতা ঠিক রাখার জন্য সুবিধাজনক এডজাস্টটেবল স্ক্রু থাকতে হবে।
৫. হাঁটু থেকে টেবিলের মধ্যে একটি ফাঁক থাকবে এবং পা মাটিতে বা ফ্লোরে লেগে থাকবে।
৬. মাউস ও কি-বোর্ড টেবিলের মাঝামাঝি থাকবে, যাতে কনুই ও হাত টেবিলের ওপর সাপোর্টে থাকে।
৭. কাজের ফাঁকে মাঝে মধ্যে বিরতি নিতে হবে।
৮. কম্পিউটারের মনিটর ও চোখের দূরত্বের অসামঞ্জস্যের জন্য মাথাব্যথা, চোখব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, পানি পড়া ইত্যাদি সমস্যাও তৈরি হতে পারে। এজন্য মনিটরকে চোখের সমান্তরালে রাখতে হবে।

এরগোনোমিক্স স্বাস্থ্য ঝুকি নিরসনে টেবিল ও মনিটর স্ক্রীনের অবস্থান

দাড়িয়ে কাজ করার সময় মনিটরের স্ক্রিন মনিটরের স্ক্রিন যেন চোখের সমান্তরালে থাকে এবং হাতের কনুই এর অবস্থান যেন ৯০ ডিগ্রি কোণে থাকে।

চিত্র ২.২: মনিটর,চোখ ও স্ক্রিনের অবস্থান

হাতের সঠিক অবস্থান

নিচের চিত্রে ডান অংশে হাতের সঠিক অবস্থান দেখানো হয়েছে। কম্পিউটার এর কী-বোর্ড এ টাইপ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে হাতের কব্জি যেন সব সময় সোজা থাকে।

চিত্র ২.৩: হাত ও হাতের কব্জির অবস্থান

কর্মক্ষেত্রে অস্থিয়-পেশিয়াল সমস্যার কারণ

ঝুঁকির কারন-

- অঙ্গের অসংলগ্ন অবস্থান
- শরীরের অনড় বা স্থবিরতা
- অনবরত একইভাবে অঙ্গ সঞ্চালন
- কোন ক্ষুদ্র অঙ্গের উপরে লাগাতার চাপ যথা- কব্জি বা হাত
- কাজের গতি, যার জন্য শক্তি পুনরুদ্ধারের সময়ের স্বল্পতা

২০১৪

অস্থিয়-পেশিয়াল সমস্যাজনিত ঝুঁকির কারণ ও উপসর্গসমূহ

ঝুঁকির কারন	উপসর্গ
বারংবার কব্জির নড়াচড়া, বারংবার কাঁধের নড়াচড়া, দীর্ঘক্ষণ হাত টান করে কাজ করা কাঁধের উপরে দীর্ঘক্ষণ চাপ	ব্যথা, দুর্বলতা, ফুলে যাওয়া, জ্বালাপোড়া, ভোঁতা অনুভূতি
হাতের সামনের বাহুর বারংবার শক্তি প্রয়োগ করে মোচড় থাকা এবং সেইসাথে কব্জি ভাঁজ করে রাখা	ব্যথা, দুর্বলতা, ফুলে যাওয়া, জ্বালাপোড়া, ভোঁতা অনুভূতি
বারবার কব্জির সঞ্চালন	ব্যথা, অসাড়তা, অবশ, জ্বালাপোড়া, হাতের তালু শুকিয়ে যাওয়া
দীর্ঘক্ষণ কাঁধ ভাঁজ হয়ে থাকা, কাঁধ থেকে হাত উঁচুতে থাকা, কাঁধের উপরে ভার বহন করা	ব্যথা, অসাড়তা, হাত ফুলে যাওয়া

চোখের ঝুঁকি

আমরা যখন দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের মনিটরের স্ক্রিন এর দিকে তাকিয়ে থাকি তখন মনিটর হতে আগত আলোক রশ্মি চোখের ক্ষতি করে। আমরা যদি এ বিষয়টাকে গুরুত্ব সহকারে না দেখি তাহলে এক পর্যায়ে চোখের সমস্যা শুরু হয়ে যাবে। মনিটর স্ক্রিন এর ক্ষতিকর আলোক রশ্মি থেকে চোখকে রক্ষা করতে হলে অবশ্যেই মনিটর এর সম্মুখে স্ক্রিন প্রটেক্টর লাগাতে হবে।

চোখের উপর চাপ কমানোর উপায়

- কম্পিউটার স্ক্রীন চোখ থেকে ২০ ইঞ্চির অধিক দুরত্বে থাকা।
- কোন ডকুমেন্ট দেখে টাইপ করতে হলে তা স্ক্রীনের পাশেই রাখা, যেন বার বার দৃষ্টি পরিবর্তন করতে না হয়।
- স্বস্তিকর চেয়ারে বসা।
- এমন মনিটর ব্যবহার করা যা বিভিন্নভাবে সমন্বয় করা যায়।
- ঘরের পটভূমির আলো ও স্ক্রীনের আলো স্বস্তিকর ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা।
- কাজের ফাঁকে বিরতি নেওয়া।
- চোখের যত্ন নেওয়া।

২.৫ ইন্টারনেটে আসক্তি

অনেক দিন ধরে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট এ কাজ করার ফলে আমাদের মাঝে এক ধরনের আসক্তির সৃষ্টি হয়। যেকোনো কিছুতে আসক্তিই মানুষের জন্য অকল্যাণকর। ইন্টারনেট এ আসক্তি বর্তমানে ভয়াবহ অবস্থার দিকে যাচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজ বিভিন্ন ধরনের গেম ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অকারনে সময় নষ্ট করছে ও বিভিন্ন অসামাজিক কাজ এ লিপ্ত হচ্ছে।

ইন্টারনেটে আসক্তির উপসর্গ

- ঘন ঘন ম্যাসেজ ও মেইল চেক করা
- মাঝেমাঝেই ফেসবুক স্ট্যাটাস পরিবর্তন করা
- যখন তখন সেলফি আপলোড করা
- ইন্টারনেটে থাকতে উৎফুল্ল বোধ করা
- সামাজিকতা থেকে দুরে সরে যাওয়া
- যেসব কার্যক্রমে কম্পিউটার/ল্যাপটপ বা মোবাইল নেই সেসবে আগ্রহ না থাকা
- ইন্টারনেট কানেকশন না থাকলে ছটফটানি লাগা
- ইন্টারনেটে কানেক্টেড থাকলে সময়জ্ঞান না থাকা ইত্যাদি।

২.৬ জরুরী পরিস্থিতি (Emergency Situation)

একটি জরুরি অবস্থা স্বাস্থ্য, জীবন, সম্পত্তি বা পরিবেশের উল্লেযোগ্য ক্ষতির সম্ভাব্য ঝুঁকি তৈরি করে। জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করা, কর্মস্থলের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা

সচরাচর জরুরী পরিস্থিতি

- অগ্নি অথবা বিস্ফোরণ
- মেডিকেল ইমারজেন্সি
- খারাপ আবহাওয়া
- বড় ধরনের পাওয়ার ফেইলর
- ভুমিকম্প
- জলউচ্ছ্বাস, ঘূর্নিঝড় ইত্যাদি

জরুরী পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি

জরুরী পরিস্থিতিতে যথাযথ ব্যবস্থা যেমন-

- অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা
- প্রাথমিক চিকিৎসা,
- জরুরী চিকিৎসা ও হ্যাজার্ড অপসারণ ইত্যাদি পদক্ষেপ নিতে হবে।

একজন কর্মী হিসাবে, জরুরী পরিস্থিতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানা দরকার:

- সচরাচর জরুরী পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা।
- কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সাড়া দেওয়া।
- জরুরী অ্যালার্ম বাজলে সাড়া দেওয়া
- জরুরী পরিস্থিতিতে বাইরে বের হওয়ার জন্য ব্যবহৃত সিম্বলসমূহ অনুসরণ করে বের হওয়া।

২.৭ সেফটি সাইন ও সিম্বল

ভেজা মেঝে: সাধারনত ভেজা মেঝেকে বোঝাতে এই সাইনটি ব্যবহার করা হয়। ভেজা মেজেতে পা পিছলিয়ে যাতে না পড়ে যাই তাই সতর্কতা হিসাবে এ সাইন ব্যবহার করা হয়।

বিপদজনক চিহ্ন: কোন বিপদজনক বস্তু যার কারণে মানুষের মৃত্যুর কারন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে এই সাইনটি ব্যবহার করা হয়।

হাই ভোল্টেজ : উচ্চ ভোল্টেজ সম্পন্ন কোন সোর্স থাকলে সেখানে এই সাইনটি ব্যবহার করা হয়।

নো-স্মোকিং : এই সাইনের মাধ্যমে ধুমপান করা নিষেধ করা হয়েছে।

অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের প্রবেশাধিকার: শুধুমাত্র অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের প্রবেশের অনুমতি আছে বোঝাতে এ সাইন ব্যবহৃত হয়।

নিষিদ্ধ খাবার ও পানীয়: ল্যাবে যেকোন ধরণের পানীয় ও খাবার খাওয়া নিষেধ বোঝাতে এ সাইন ব্যবহার করা হয়।

মোবাইল ফোট ব্যবহার নিষিদ্ধ: মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষেধ বোঝাতে এ সাইন ব্যবহার করা হয়।

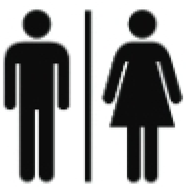

ছেলে/মেয়েদের প্রবেশাধীকার: ছেলে ও মেয়েদের আলাদাভাবে প্রবেশের সাইন হিসেবে এটি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এ সাইনটি ওয়াশ রুমের সামনে ও অন্যান্য জায়গায় ব্যবহার করা হয়।

২.৮ আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইথিকস বা নৈতিকতা

প্লেজারিজম

প্লেজারিজম বলতে আমরা বুঝি অন্যের অনুমতি ছাড়া তার তৈরি কৃত কোন কিছু নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া। অন্যভাবে বলা যায় অপরের আইডিয়া বা কর্ম বা তৈরিকৃত কোন কিছু তাদের অনুমতি না নিয়ে নিজের ডকুমেন্টে বা কৃতকর্মে ব্যবহার করাকে প্লেজারিজম বলে। অন্যভাবে যাকে বলা হয় নকল করা বা চুরি করা। আমাদের দেশে আইটি জগতে না জেনে অনেকে এই অন্যায় কাজটি করে থাকেন কিন্তু এই কাজটির জন্য যে পরিমান ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতি হয় তা অনেকেই ভেবে দেখেনা। মেধার অপচয় সময়ের অপচয় আর্থিক জরিমানা, জেল-জরিমানা, চুরির গ্লানি সর্বোপরি সামাজিকভাবে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিরাও এর সাথে নিজেকে সংশ্লিস্ট করেন। অনেকে না হয় এটা না জেনে করে থাকেন আবার অনেকে জেনেও একই কাজ করেন।

অনেক সময় আমরা ফেসবুক অথবা বিভিন্ন ব্লগে অন্যের তৈরিকৃত তথ্য স্বত্বাধিকারীর অনুমতি না নিয়েই ব্যবহার করে থাকি বা নিজের তৈরি তথ্য বলে চালিয়ে দিই। ভাবি অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। কিন্তু আইটিতে সামান্য এক্সপার্টাইজ থাকলেই অনলাইনে ব্যবহৃত তথ্যের মালিকানা বা স্বত্বাধিকারীকে খুজে বের করা যাই। এই অধ্যায়ে আমরা তথ্যের প্লেজারিজম বের করা শিখব।

কপিরাইট

কপিরাইট মুলত দুটি শব্দের সম্মিলন। কপি এবং রাইট । কপি অর্থ নকল বা প্রতিলিপি বা অনুলিপি বা অনুকৃতি বা অনুকরণ বা অনুসৃতি। আর রাইট হচ্ছে অধিকার বা স্বত্ব বা ন্যায় ইত্যাদি। সহজ ভাষায় বলা যায় কপিরাইট হচ্ছে নকল করার অধিকার বা নকলাধিকার। কপিরাইট একটি আইন যার দ্বারা লেখকের মৌলিক সৃস্টিকর্মেও জন্য নির্দিস্ট সময়ের একছত্র অধিকার প্রদান করা। কপিরাইট মুলত লেখকের মৌলিক রচনার জন্য স্বত্ব প্রদান এবং বিনা অনুমতিতে যে কোন ধরনের পুণঃ মুদ্রণ অনুবাদ বা অনুলিপি থেকে নিবৃত্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা। কপিরাইট লেখক এর লেখা কন্টেন্ট, ছবি, সফটওয়্যার কিম্বা এর লেখক, প্রকাশক বা মুল মালিকের স্বত্ব অধিকার সংরক্ষণ করে যা প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত কাজে সরাসরি কপি কওে ব্যবহার করা হয় তাহলে কপিরাইট আইন লঙ্গন হবে।

বাংলা একাডেমী ইংলিশ বেঙ্গলি ডিকশনারিতে কপিরাইটের অর্থ মেধাস্বত্ব এবং ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কোনো লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টি কর্মের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী অধিকার প্রাপ্ত হবে। কপিরাইটের মৌলিক তাৎপর্যের সঙ্গে এর অর্থের কোনো বিরোধ না থাকলেও কপিরাইটের যে ক্রমসম্প্রসারমান ক্ষেত্র ও পরিধি, তা এই ব্যাখ্যায় পূর্ণ-প্রতিফলিত নয়। এটি বরং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির বাংলা পারিভাষিক শব্দ হিসাবে অধিক সংগতিপূর্ণ। কপিরাইট ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির একটি অংশ, অন্য অংশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রাইট, যার মধ্যে রয়েছে প্যাটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক। তাই কপিরাইটের তাৎপর্য আলাদাভাবে অনুধাবন যোগ্য। কপিরাইট কেবল লেখক বা শিল্পীর বিষয় নয়, এটি যে কোনো সৃষ্টিশীল মানুষের সৃষ্টিস্বত্বের চর্চাক্ষেত্র। কেবল বৃহত্তর জনসাধারণ নয়, কপিরাইট সম্পর্কে আমাদের শিক্ষিত সমাজের ধারনাও যে খুব গোছালো ও সময়ানুগ নয়, এই পরিভাশা ও ব্যাখ্যা তার একটি সহজ উদাহরণ।

কপিরাইট আইনের অন্য একটি দিক হলো এর দ্বারা লেখক বা প্রকাশককে মুদ্রিত বা অন্যান্য সৃষ্টিকর্মের এক বা একাধিক কপি আইনে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট এক বা একাধিক গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে প্রেরণ করতে হয়।

কপি রাইটের প্রয়োজনীয়তা

কে স্বতাধিকারী? কার জন্য এই আইন? সাধারণ উত্তর হলো যিনি কোনো কর্মে স্রষ্টা তিনিই মালিক বা স্বত্বাধিারী। বাংলাদেশে বর্তমানে বলবৎ কপিরাইট আইন (২০০০ ও সংশোধিত ২০০৫) অনুযায়ী এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মের প্রণেতা ঐ কর্মের কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী হবেন (অধ্যায়-৪, ধারা ১৭)। আবার প্রণেতা বলতে বোঝানো হয়েছে

(ক) সাহিত্য বা নাট্যকর্মের ক্ষেত্রে কর্মটির গ্রন্থকার

(খ) সঙ্গীত বিষয়ক কর্মের ক্ষেত্রে উহার সুরকার বা রচয়িতা

(গ) ফটোগ্রাফ ব্যতীত অন্য কোন শিল্পসুলভ কর্মের ক্ষেত্রে উহার নির্মাতা

(ঘ) ফটোগ্রাফের ক্ষেত্রে উহার চিত্রগ্রাহক

(ঙ) চলচ্চিত্র অথবা শব্দ রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে উহার প্রযোজক

(চ) কম্পিউটারের মাধ্যমে সৃষ্ট সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত বা শিল্প সুলভ কর্মের ক্ষেত্রে কর্মটির সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (ধারা ২, দফা ২৪)

বর্তমান সময়ে কপিরাইটের প্রাজেনীয়তা খুবই বেশি কপিরাইট একজন লেখক, শিল্পী, তথা সৃষ্টিকারীকে নানাবিধ সুবিধা ভোগ করার অধিার দেয়। যেমন–

- লেখক নির্বিঘ্নে নতুন জ্ঞানের সন্ধান করেন। তার লেখা আইন দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ার কারণে তিনি আরও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির জন্য পরিশ্রম করেন।
- লেখক, শিল্পীগন তাদের কাজের জন্য সম্মানী পান, যা তাদের কাজে প্রেরণা যোগায়।
- লেখক, শিল্পীগোষ্ঠী তাদের সৃষ্টি কর্মের জন্য অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হন।
- কপিরাইট আইন লেখক, শিল্পীদের স্বার্থ রক্ষা করে।
- সৃষ্টিকর্ম অবৈধভাবে কেউ পরিবর্তন, পুনঃমূদ্রণ বা নিজ নামে যাতে না ছাপাতে পারে সে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় ও আইনের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।
- সৃজনশীল কাজের বিকাশ ঘটে।
- আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইনের কারনে এক দেশের সৃষ্টিকর্ম আরেক দেশে নিরাপত্তা পায়।

জব শিট

জব ১: তথ্য প্রযুক্তি কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করে কর্মক্ষেত্রটিকে ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি ও সুরক্ষা পদ্ধতি অনুসরন করে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা
- আইটি কর্মক্ষেত্রে কাজের ধরণ অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) চিহ্নিত ও ব্যবহার করা
- কম্পিউটার ব্যাবহারে সঠিক বডি পোশ্চার নিশ্চিত করা
- সুরক্ষা সম্পকিত চিহ্নসমূহ সনাক্ত করা
- কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা শর্ত অনুযায়ী হ্যাজার্ড (Hazards) এবং স্বাস্থ্যের সাম্ভব্য বিপদসমূহ চিহ্নিত করা
- হ্যাজার্ড (Hazards) এবং সাম্ভব্য বিপদসমূহ কর্তৃপক্ষের মনোনিত ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট করা
- নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা
- জরুরী পরিস্থিতি চিহ্নিত করে কর্মক্ষেত্রের বিধি অনুসারে প্রতিবেদন করা
- জরুরী পরিস্থিতির ধরন ও কর্মক্ষেত্রের বিধি অনুসারে জরুরী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুসারে জরুরী পরিস্থিতি ও জরুরী পরিস্থিতির ব্যবস্থাসমূহ বিবরণ নির্ভুল ও স্পষ্টভাবে রেকর্ড করা

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমান
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	জুতা	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমান
১	কাগজ	A4 Size	প্রয়োজনমত
২	কলম	স্ট্যান্ডার্ড মান	প্রয়োজনমত

(গ) কাজের ধারা

১. হ্যাজার্ড শনাক্তকরণ ফরম ফর্মটি সংগ্রহ করো।
২. আইটি কর্মস্থল পরিদর্শন করো।
৩. আইটি কর্মস্থলের অবস্থা অনুযায়ী হ্যাজার্ড শনাক্তকরণ তালিকা ফর্মটি পূরণ করো।
৪. কর্মস্থলের দায়িত্ব প্রাপ্ত সেফটি অফিসার ও ম্যানেজারের নাম লেখ।
৫. হ্যাজার্ডসমূহের ঝুঁকির অবস্থা অনুযায়ী ঝুকির মাত্রা নির্ধারণ করো।
৬. শনাক্তকৃত হ্যাজার্ডসমূহের বিস্তারিত লেখ।
৭. ঝুঁকিসমূহ নির্মূল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম লেখ।

ঝুকি চিহ্নিতকরণ ফরম ও চেকলিস্ট

Risk Levels

উচ্চ = H : দুর্ঘটনার কারনে মৃত্যু

মধ্যম = M : দুর্ঘটনার কারনে আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে

নিম্ন = L : দুর্ঘটনার কারনে অস্বস্তি বোধ করতে পারে

কন্টাক্ট ইনফর্মেশন	
ইনস্পেকশনকারির নাম	
ইনস্পেকশনের তারিখ	
ও এস এইচ কো-অর্ডিনেটর	
দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার	

মেঝের অবস্থা	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	**ঝুকিমুক্ত করার জন্য** দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
মেঝেতে কোন গর্ত নেই					
ফেলে দেওয়া বস্তুসমূহকে তুলে রাখা হয়েছে					
ধুলো ও আবর্জনা					
চলাচলের পথে স্টোক ম্যাটেরিয়ালস নেই Stock material out of way					
Floor are around machines clear মেশিনের চারপাশের ফ্লোর পরিষ্কার					
Power cables on floor. ফ্লোরে পাওয়ার কেবল পড়ে আছে					
মেশিনসমূহ	**ঝুঁকি নেই**	**ঝুঁকি আছে**	**ঝুঁকির ধাপ**	**বিস্তারিত**	**ঝুকিমুক্ত করার জন্য** দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
Adequate space between machinery দুইটা মেশিনের মাঝে পর্যাপ্ত যায়গা আছে					
Power connection in good order পাওয়ার কানেকশন উপযুক্ত স্থানে আছে					
Cleanliness পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা					
Noise level শব্দের মাত্রা					
Lighting লাইটিং					
অগ্নি	**ঝুঁকি নেই**	**ঝুঁকি আছে**	**ঝুঁকির ধাপ**	**বিস্তারিত**	**ঝুকিমুক্ত করার জন্য** দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
Extinguishers in place, recently serviced and clearly marked for type of fire এক্সটিংগুইশার সঠিক স্থানে রাখা আছে, সম্প্রতি সার্ভিস করা হয়েছে, আগুনের টাইপ অনুযায়ী পরিষ্কারভাবে মার্ক করা আছে					

Adequate direction notices for fire exits পর্যাপ্ত অগ্নি বহির্গমন ডিরেকশন আছে					
Exit doors easily opened from inside বহির্গমন দরজা ভিতর থেকে খোলা আছে					
Exits clear of obstructions বহির্গমনের পথ বাধামুক্ত					
Fire alarm system functioning correctly ফায়ার এলার্ম যথাযথভাবে কার্যক্ষম					
Fire instructions available and displayed অগ্নি নির্দেশিকা প্রদর্শন করা আছে					
Ladders/staircases are clear মই/ সিড়ি পরিষ্কারভাবে রাখা আছে					
Fire blanket/s available পর্যাপ্ত ফায়ার ব্লাংকেট আছে					
সংরক্ষণ স্থান	**ঝুঁকি নেই**	**ঝুঁকি আছে**	**ঝুঁকির ধাপ**	**বিস্তারিত**	**ঝুকিমুক্ত করার জন্য** দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
লিফটিং সমস্যাগুলি দুর করার জন্য সংরক্ষণ স্থান ডিজাইন করা হয়েছে					
উপকরণসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী যথাসম্ভব র‍্যাক বিনে সংরক্ষণ করা হয়েছে					
শেলফসমূহ ধুলো ও আবর্জনা মুক্ত					

২০১৪

ইলেক্ট্রিক্যাল	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	**ঝুকিমুক্ত করার জন্য** দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
প্লাগ, সকেট অথবা সুইচসমূহ ভাল অবস্থায় আছে					
No frayed or deflective leads কোন বিভ্রান্তিমুলক ও প্রতিবন্ধক লিড নেই					
Portable power tools in good condition পোর্টএবল পাওয়ার টুলস ভাল অবস্থায় আছে					
পরিছন্নতা কর্মী Staff amenities	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	**ঝুকিমুক্ত করার জন্য** দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
Washrooms clean and supplied with soap and water for hand washing ওয়াসরুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত পানি ও সাবানের ব্যবস্থা আছে					
Toilets clean টয়লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন আছে					
Meal rooms clean and tidy খাবার ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে					
First aid প্রাথমিক চিকিৎসা	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	**ঝুকিমুক্ত করার জন্য** দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
Cabinets and contents clean and orderly কেবিনেট ও কন্টেন্ট পরিষ্কার ও সু-শৃংখলভাবে আছে					
Cabinet stocked appropriately কেবিনেট যথাযথভাবে স্টোক করা আছে					
Emergency numbers displayed জরুরী নাম্বার প্রদর্শন করা আছে					
Rubbish আবর্জনা	ঝুঁকি নেই	ঝুঁকি আছে	ঝুঁকির ধাপ	বিস্তারিত	**ঝুকিমুক্ত করার জন্য** দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবি ম্যানেজারের নাম
Bins located at suitable points around facility উপযুক্ত স্থানে বিন স্থাপন করা আছে					

Bins emptied regularly নিয়মিত বিন খালি করা হয়					

মন্তব্যঃ (যদি থাকে) Comment (If any)

জব ২: তথ্যের প্লেজারিজম চেক করণ।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- কর্মক্ষেত্রে ইথিকস এর মূলনীতিগুলো চিহ্নিত করা
- কর্মক্ষেত্রে আইটি সম্পৃক্ত নৈতিক বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা
- ব্যক্তিগত নৈতিক আচরণের সূচক গুলি নিশ্চিত করা
- সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের জন্য নৈতিক বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা
- নিরাপদ কাজের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য চিহ্নিত করা
- কর্মক্ষেত্রে অনিরাপদ পরিস্থিতি চিহ্নিত করে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহন করা
- প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুসারে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ বিবরণ নির্ভুল ও স্পষ্টভাবে রেকর্ড করা

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমান
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১টি
২	জুতা	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
৪	হ্যান্ড গ্লোভস	মাঝারি মাপের	০১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমান
১	প্লেজারিজম সফটওয়্যার	ফ্রি/পেইড ভার্শন	১
২	ব্রাউজার	আপডেট ভার্শন	১

২০২৪

(ঘ) কাজের ধারা

১. কম্পিউটার চালু কর ও ইন্টারনেট সংযোগ দাও।

২. ইন্টারনেট হতে স্যাম্পল টেকস্ট সংগ্রহ করো।

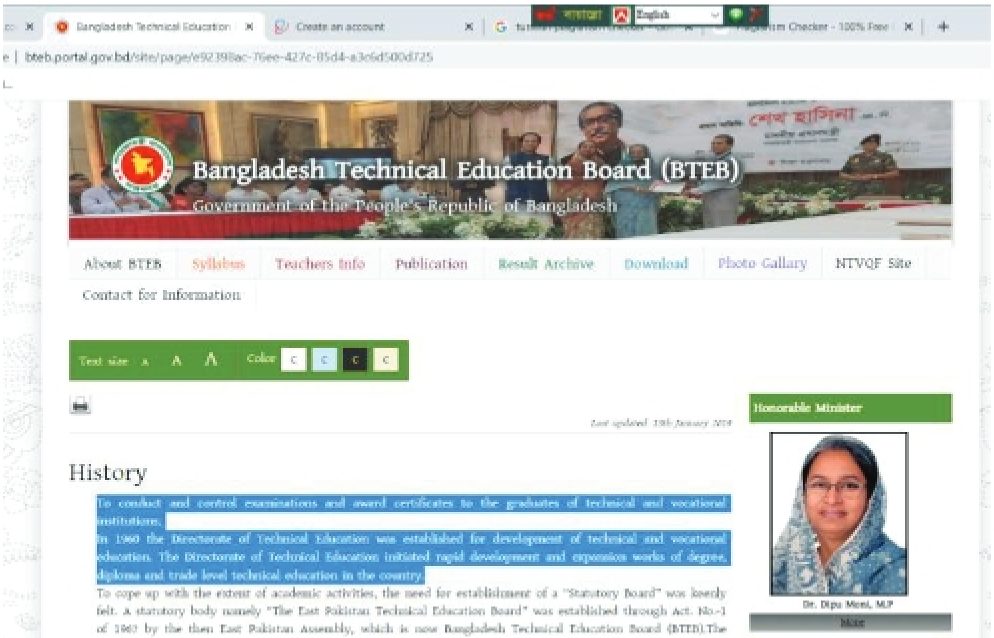

চিত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে তথ্য কপি করে দেখানো হয়েছে।

৩. প্লেজারিজম সফটওয়্যার ওপেন করো।

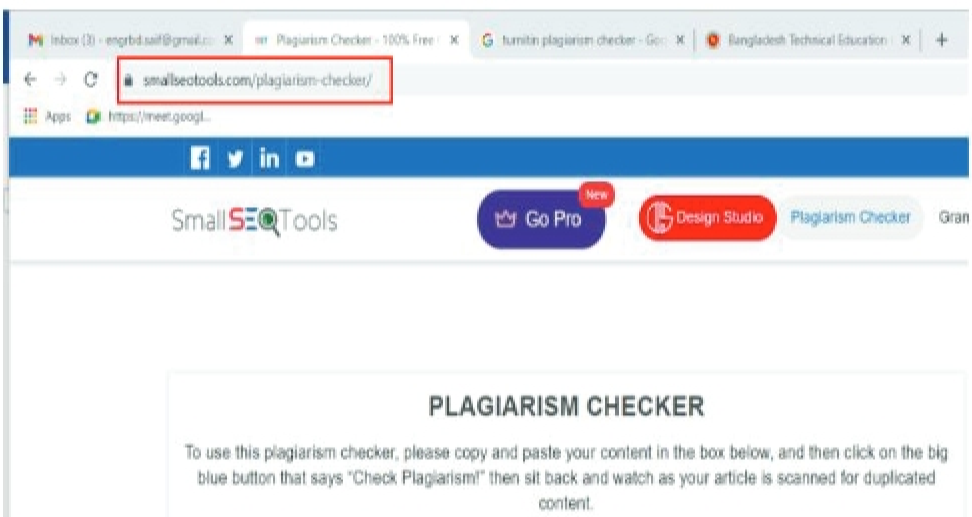

৪. নির্ধারিত স্থানে ওয়েবসাইট থেকে কপিকৃত কন্টেন্ট পেস্ট করো। ২০২৪

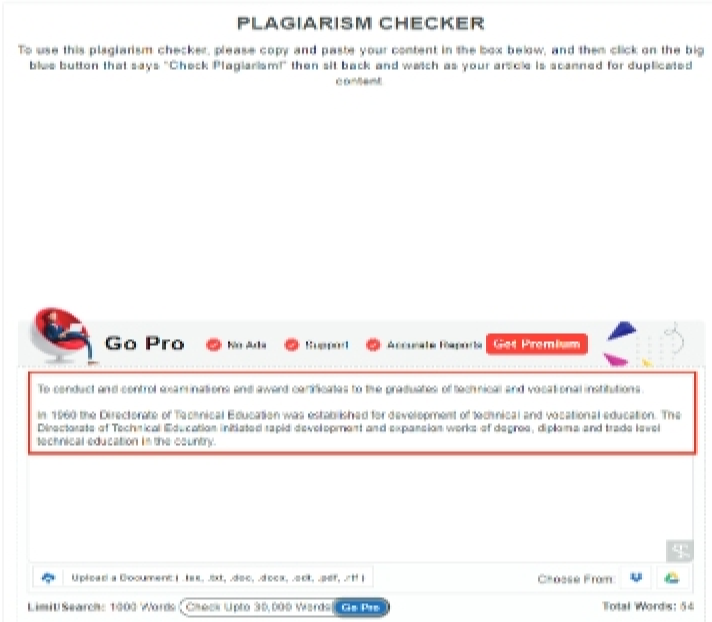

৫. চেক প্লেজারিজম অপশন এর উপর ক্লিক করো।

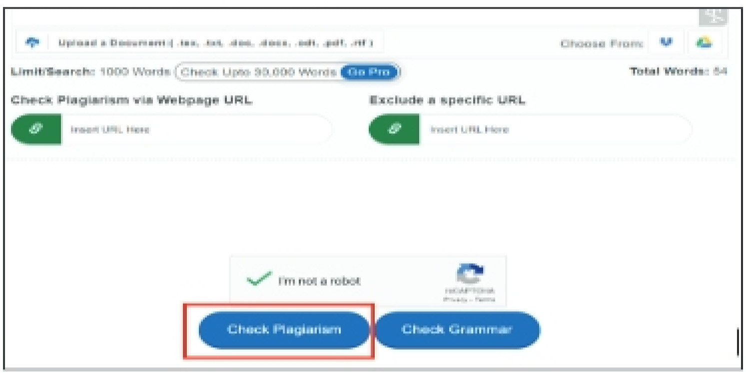

৬. সফটওয়্যার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করো।

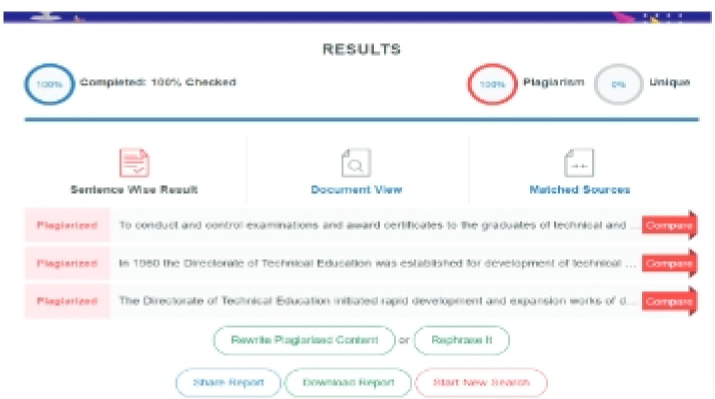

৭. প্রাপ্ত ফলাফল থেকে স্বত্বাধিকারীকে সনাক্ত করার জন্য Compare অপশনে ক্লিক করো।

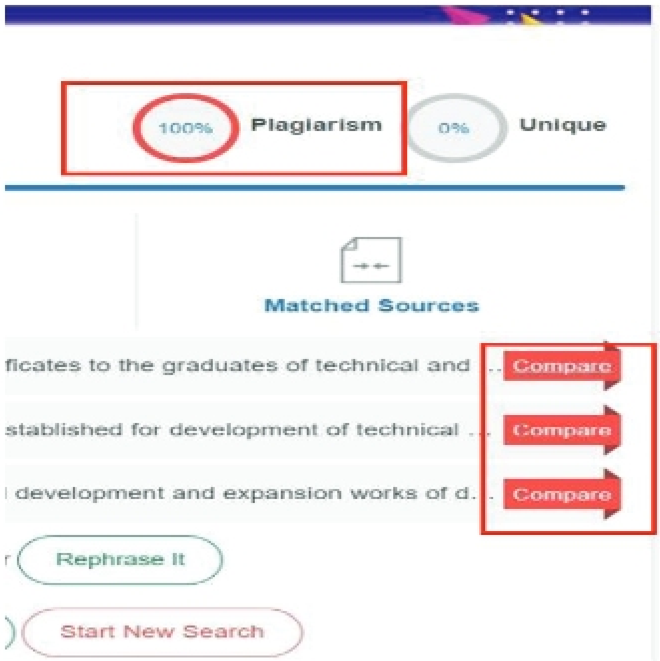

৮. স্বত্বাধিকারীকে সনাক্ত করো।

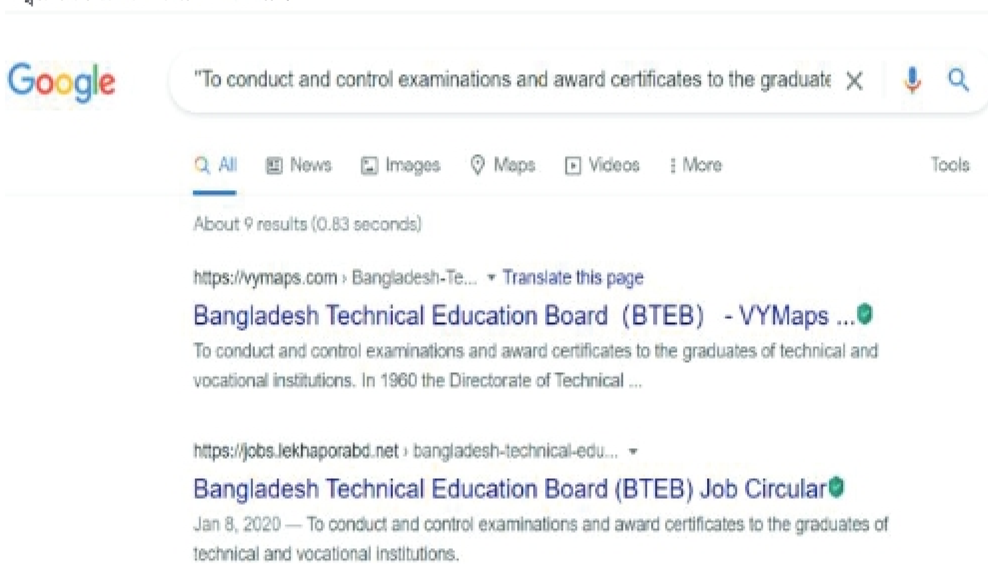

চিত্রে কম্পেয়ার করার পর দেখা যাচ্ছে তথ্যটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে

অনুশীলনী-২

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইথিকস কী?
২. কর্মক্ষেত্রে হ্যাজার্ডসমূহের নাম লেখ।
৩. সুরক্ষা সরঞ্জাম সমূহের নাম লেখ।
৪. নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়?
৫. PPE এর পূর্ণ নাম লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কর্মক্ষেত্রের হ্যাজার্ড বলতে কি বোঝায়?
২. পেশাগত ঝুকি বলতে কী বোঝায়?
৩. ঝুকি নিয়ন্ত্রনের ক্রমসমূহ কী কী?
৪. **চোখের উপর চাপ কমানোর উপায় কী?**
৫. মেধাস্বত্ব কী?
৬. প্লেজারিজম বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কপিরাইট এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।
২. বাংলাদেশ কপিরাইট আইন এর বিভিন্ন দিক তুলে ধর।
৩. কম্পিউটার ব্যবহারের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি কি ?
৪. কর্মক্ষেত্রে ঝুকিগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা করো।
৫. কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকার হ্যাজার্ড সমূহের বর্ণনা দাও।
৬. ইন্টারনেট আসক্তির উপসর্গসমূহ বর্ণনা করো।

তৃতীয় অধ্যায়

ডেস্কটপ কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং

Desktop Computer Assembling

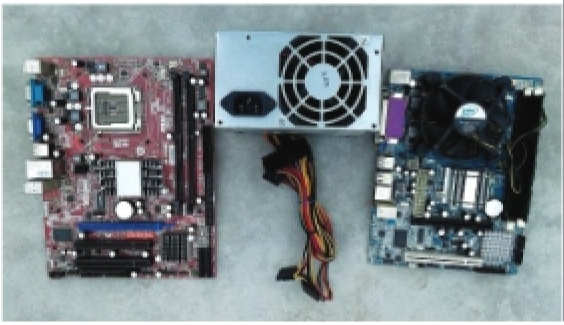
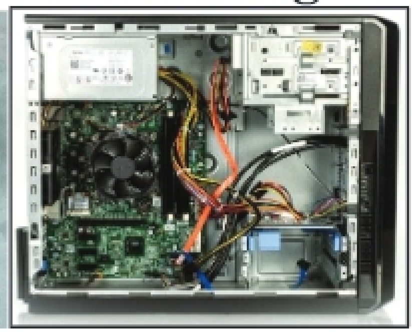

তোমরা তোমাদের বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে টেবিলের উপর মনিটর আর টেবিলে বা টেবিলের নিচে যে কম্পিউটার বাক্সটি দেখতে পাও তাকেই ডেস্কটপ কম্পিউটার বলে। ডেস্কটপ কম্পিউটারে সিস্টেম ইউনিট, মনিটর, কিবোর্ড ও মাউস আলাদা থাকে।

একটি ডেস্কটপ কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটে অনেকগুলো যন্ত্রাংশ থাকে। যন্ত্রাংশসমূহের মধ্যে আছে প্রসেসর, র‍্যাম, হার্ড ডিস্ক, মাদারবোর্ড, অপটিক্যাল ড্রাইভ ইত্যাদি।

এ অধ্যায়ে একটি সাধারণ ডেস্কটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন তৈরি, প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ, মাদারবোর্ডে পার্টস ও কম্পোনেন্টসমূহ সেটিং, কেসিং-এ পাওয়ার সাপ্লাই, মাদারবোর্ড ও স্টোরেজ ডিভাইসসমূহ ইনস্টল এবং বায়োস কনফিগারেশন করা ইত্যাদি জেনে এবং কর্মস্থলের পরিচ্ছন্নতা বিধি মেনে কীভাবে একটি ডেস্কটপ কম্পিউটারের অ্যাসেম্বলিং সম্পন্ন করা হয় তা আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- ডেস্কটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন তৈরি করতে পারব
- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল সংগ্রহ করতে পারব
- মাদারবোর্ডে পার্টস ও কম্পোনেন্টসমূহ সেট করতে পারব
- কেসিং এ পাওয়ার সাপ্লাই, মাদারবোর্ড ও স্টোরেজ ডিভাইস ইনস্টল করতে পারব
- সিস্টেম ইউনিটের সাথে আইও ডিভাইস/পাওয়ার ইনলেট ও আউটলেটসমূহকে সংযুক্ত করতে পারব
- বায়োস (BIOS) এর সেটিং পরিবর্তন করতে পারবে এবং কাজ শেষ করে কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারব

৩.১ স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতি

কম্পিউটার এ্যাসেম্বলিং করার পূর্বে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশসমূহের স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করে নিতে হয়। নিচে স্পেসিফিকেশনের ধারণা, এটি তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়সূহ ও সাধারণভাবে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশসমূহ যেমন– প্রসেসর, র‍্যাম, মাদারবোর্ড, হার্ড ডিস্ক ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

স্পেসিফিকেশনের ধারণা ও টেমপ্লেট

স্পেসিফিকেশন তৈরি করার জন্য কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার যেমন প্রসেসর, মাদারবোর্ড, র‍্যাম, হার্ড ডিস্ক ইত্যাদি যন্ত্রাংশ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রসেসর সেট করার জন্য নির্দিষ্ট সকেট থাকে, র‍্যাম বসানোর জন্য নির্দিষ্ট র‍্যাম স্লট থাকে, হার্ড ডিস্ক সংযোগ করার জন্য নির্দিষ্ট পোর্ট থাকে। এজন্য স্পেসিফিকেশন তৈরির সময় হার্ডওয়্যার সামঞ্জস্যতা (Compatibility) যাচাই করে নিতে হবে। অর্থ্যাৎ কোন হার্ডওয়্যারের সাথে কোন হার্ডওয়্যার সেট হবে সে বিষয়টি জেনে স্পেসিফিকেশন তৈরি করবে।

সাধারণ ডেস্কটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

একটি সাধারণ ডেস্কটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন তৈরি করার জন্য যেসকল বিষয় বিবেচনায় আনবে তা হলো–

(১) যন্ত্রাংশসমূহ কারেন্ট / রিসেন্ট ভার্সনের কিনা তা বিচেনায় আনবে।
(২) যন্ত্রাংশসমূহ বাজারে সহজলভ্য কিনা তা বিবেচনা করবে।
(৩) ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার পরিচালনার সক্ষমতা বিবেচনা করবে।
(৪) ক্রেতার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা করবে।

ডেস্কটপ কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ও কম্পোনেন্ট

ডেস্কটপ কম্পিউটার সাধারণত যে সকল যন্ত্রাংশ ও কম্পোনেন্ট নিয়ে তৈরি তা হলোঃ
প্রসেসর , মাদারবোড , র‍্যাম , হার্ড ডিস্ক , অপটিক্যাল ড্রাইভ ,কুলিং ফ্যান, থার্মাল গ্লু, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট , SATA ও PATA ক্যাবল, কেসিং ইত্যাদি
ডেস্কটপ কম্পিউটার উপরিউক্ত যন্ত্রাংশ ও কম্পোনেন্ট একত্রে সংযোগ করে সম্পূর্ণ একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার তৈরি করা হয়। নিম্নে এ সকল যন্ত্রাংশ ও কম্পোনেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

(ক) প্রসেসর

হঠাৎ করে আমাদের পায়ে একটি পিঁপড়া কামড় দিলে সাথে সাথে টের পাই কারণ; পায়ের সাথে মস্তিষ্কের সম্পর্ক থাকায় মস্তিষ্ক সিগন্যাল পাঠিয়ে আমাদের ব্যথার অনুভূতি তৈরি করে। সাথে সাথে মস্তিষ্ক হাতকে নির্দেশনা দেয় পিপড়ার কামড়ের জায়গায় যেতে। একইভাবে, আমরা যখন হাঁটাহাঁটি করি তখন পা কোন দিকে যাবে, হাত দিয়ে পানির গ্লাসটা কীভাবে ধরলে মাটিতে পড়বে না, রাস্তা পারাপারের সময় কোন দিকে তাকাতে হবে ইত্যাদি দৈনন্দিন হাজারো নির্দেশের মাধ্যমে আমাদের শরীরকে যে অংগটি নিয়ন্ত্রণ করে সেটি আমাদের মস্তিষ্ক। আমাদের ব্যবহৃত কম্পিউটারে ঠিক মানুষের মস্তিস্কের মতো একটি ডিভাইস বা যন্ত্রাংশ আছে যার নাম প্রসেসর। এটির আরেকটি নাম হলো মাইক্রো প্রসেসর। একে আমরা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ বা সিপিইউ (ঈচট-ঈবহঃৎধষ চৎড়পবংংরহম টহরঃ) বলি। এ ডিভাইসটি কম্পিউটারের যাবতীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারকে কন্ট্রোল করে কম্পিউটারকে কার্যোপযোগী করে। প্রসেসর একটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস।

এটি মূলত ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি। বর্তমান বিশ্বে Core i9 প্রসেসর সবচেয়ে উন্নতমানের। কোর Core i9 প্রসেসরটিতে প্রায় ৭ বিলিয়ন ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে (কম বেশি হতে পারে)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রসেসর খুবই ছোট আকারের (১.৪৮×১.৪৮) ইঞ্চি সাইজের একটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস (জেনারেশন ভিত্তিতে সকল প্রসেসরের সাইজ এক হয় না)। সুতরাং, **"প্রসেসর হলো একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট যা অসংখ্য আইসি (IC – Integrated Circuit) দিয়ে তৈরি"**। Core হলো ব্যবহৃত হচ্ছে। Core যত বেশি হবে প্রসেসরের প্রসেসিং ইউনিট সংখ্যা। বর্তমানে Core 8 (Eight) প্রসেসর কম্পিউটারের গতিও ততো বেশি হবে। একটি প্রসেসর কত দ্রুত ডাটা বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে তা দ্বারা প্রসেসরের ক্লক স্পিড (Clock Speed) গণনা করা যায় ক্লক স্পিডের একক হার্জ (Hz)।বর্তমানে 3.60 GHz এর প্রসেসর ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রসেসর মূলত কম্পিউটারের RAM (Random Access Memory) থেকে তথ্য নিয়ে প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় RAM থেকে তথ্য আদান প্রদান করতে প্রসেসরের সময় বেশি লাগে। এ সমস্যা দূর করার জন্য প্রসেসরের অভ্যন্তরে একটি মেমোরি লাগানো হয় যার নাম হলো ক্যাশ মেমোরি (Cache Memory)। এখনকার প্রসেসরগুলোতে ১৬ এমবি (16 MB) ক্যাশ মেমোরি থাকে। বিভিন্ন জেনারেশনের প্রসেসর বাজারে আছে। নেহালীম (Nehalem) ইন্টেলের সফল একটি প্রসেসর। এটিই ইন্টেলের ফার্স্ট জেনারেশনের প্রসেসর। যেটি ২০০৮ সালে নভেম্বর মাসে প্রথম বাজারে আসে। বর্তমানে ১২টি জেনারেশনের প্রসেসর ব্যবহার করা হচ্ছে।

চিত্র ৩.১ঃ কোর আই - ৯

ইনটেল ও এএমডি প্রসেসরের বিভিন্ন জেনারেশন এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

Intel Pentium প্রসেসরটি ইনটেল কর্পোরেশন তৈরি করে। এটি ১৯৯৩ সনে প্রথম বাজারে আসে। এ প্রসেসরটি ইন্টেল ৮০৪৮৬ মাইক্রো-প্রসেসরের পরের ভার্সন। এটির একটি বৈশিষ্ট্য হলো একটি চিপের (Chip) মধ্যে দুটি প্রসেসর রাখা হয়েছে। এটি তৈরি করতে প্রায় ৩.৩ মিলিয়ন ট্রানজিস্টর লেগেছে। এটির গতি 60 (MHz) থেকে 200 MHz.এটির ২৭৩ টি পিন আছে এবং এটি পিজিএ-৭, ৮ (Pin Grid Array) স্লট এ বসানো হয়। Intel PentiumIII প্রসেসরটি ইনটেল কর্পোরেশন তৈরি করে ১৯৯৯ সনে। এটির গতি 400 (MHz) থেকে 1400 MHz.এটিস্লট-১ এ বসানো হয়। এ প্রসেসর টি দুটি আকৃতিতে ছিল। একটি স্লট-১ এ বসানো হয়। অন্যটি সকেট ৩৭০ এ বসে।

Intel Pentium IV প্রসেসরটি ইনটেল কর্পোরেশন তৈরি করে ২০০০ সনে।এটির গতি ছিল 1.3GHz থেকে 3.8GHz. এ প্রসেসরটি ৪২৩ পিন ও ৪৭৮ পিন বিশিষ্ট ছিল। সকেট ৪২৩/ এম ৪৭৮ / LGA (Land Grid

Array)775সকেটে বসানো হত এই প্রসেসর একক কোর(Single Core) ব্যবহার করা হতো। এটি NetBurst microarchitecture ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। এটি ৬৪ বিটের প্রসেসর। আবার Duel Core Processor এমন একটি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট যেটিতে দুটি আলাদা কোর থাকে। এটি আসলে একটি প্রসেসরে দুটি মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। Duel Core প্রসেসরটি ইনটেল কর্পোরেশন তৈরি করে ২০০৬ সনে।এটির গতি 1.3GHz থেকে 3.4 GHz. ছিল এ প্রসেসরটি ৭৭৫ পিন বিশিষ্ট হয়। সকেট LGA775 এ বসে। AMD Advanced Micro Devices কোম্পানির তৈরি। এটির একটি সুবিধা হলো পেনটিয়াম -২ প্রসেসর যে মাদার বোর্ডে ব্যবহার করা হয় এ প্রসেসরটি সে মাদার বোর্ডে ব্যবহার করা হয়। এটি পেন্টিয়াম-২ প্রসেসরের মতো কাজ করলেও এর দাম ছিল পেন্টিয়াম প্রসেসরের চেয়ে কম। এ প্রসেসরটি মূলত ইন্টেলের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিযোগীতার জন্য তৈরি করা হয়। এটি তৈরিতে প্রায় ৮.৮ মিলিয়ন ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। এটি ১৯৯৭ সনের জানুয়ারী মাসে বাজারে আসে। এটির গতি 166, 200, 233 MHz. এটি পিজিএ-৭, ৮ স্লট এ বসানো হতো

Core i3 Processor

Core i3 প্রসেসরটি ইন্টেল কর্পোরেশন ২০০৬ সালে বাজারে ছাড়ে। এটি দুইকোর বিশিষ্ট একটি প্রসেসর। এটির ক্যাশ মেমোরি ৩ এমবি অথবা 8 এমবি হয়। এটি LGA 1150 অথবা LGA 1155 সকেটে বাসানো হয়। কোর আইও প্রসেসরটি DDR3 র‍্যাম সাপোর্ট করে। এটির ক্লক স্পিড 2.20 GHz **থেকে** 3.70 GHz হয়। এটির ক্যাশ মেমোরি ৬ এমবি থেকে ৮এমবি থাকে।

চিত্র ৩.২ঃ Duel Core i3 প্রসেসর

Core i7 Processor

Core i7 প্রসেসরটি ইন্টেল কর্পোরেশন ২০০৮ সালে বাজারে ছাড়ে। এটি চারকোর বিশিষ্ট একটি প্রসেসর। এটির ক্যাশ মেমোরি ১৮ এমবি। এটি LGA-1366, LGA-1364, LGA-1440, LGA-1288, LGA-1224, LGA-1168, LGA-1155, LGA-1151, LGA-1150, LGA-1023 সকেটে বাসানো হয়। কোর Core i7 প্রসেসরটি DDR3 র‍্যাম সাপোর্ট করে। এটির ক্লক স্পিড 3.40GHz **থেকে** 4.20 GHz হয়।

২০২৪

Core i9 Processor

Core i9 প্রসেসরটি ইন্টেল কর্পোরেশন ২০১৭ সালে বাজারে ছাড়ে। এটি আঠারো কোর বিশিষ্ট একটি প্রসেসর। এটির ক্যাশ মেমোরি ২৪ এমবি। কোর আই ৯ প্রসেসরটি DDR4 র‍্যাম সাপোর্ট করে। এটির ক্লক স্পিড 4.80GHz**থেকে** 5.00 GHzহয়।

চিত্র ৩.৩: Duel Core i9 প্রসেসর

খ) মাদারবোর্ড (Motherboard)

মাদারবোর্ড কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ একটি ইন্টারফেসিং ডিভাইস। কম্পিউটারের অভ্যন্তরস্থ সকল পার্টস ও কম্পোনেন্ট এবং পেরিফেরালসসমূহ এ মাদারবোর্ডের সাথে বিভিন্ন প্রকার ইন্টারফেসের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। এটাকে অনেকে মেইন বোর্ডও বলে।

মাদার বোর্ডের প্রকার (**Motherboard Type**)**:** মাদারবোর্ডকে ফর্ম ফ্যাক্টর এবং প্রসেসরের ইন্টারফেস এর উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ফর্ম ফ্যাক্টর: মাদারবোর্ডের আকার, আকৃতি ও বিভিন্ন অংশের জন্য উপযুক্ত স্থান, পাওয়ার সাপ্লাই, কুলিং সিস্টেম ইত্যাদির ভিন্নতার কারণে এর ডিজাইন প্রক্রিয়াকে কিছু নির্দিষ্ট ফরম্যাটে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ফর্ম ফ্যাক্টর নামে পরিচিত। মূলত ক্যাসিং, এসএমপিএস (SMPS-Switch Mode Power Supply), বিভিন্ন কার্ড সহ মাদারবোর্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সব ডিভাইসের সামাঞ্জস্যতা বজায় রাখতে ফর্ম ফ্যাক্টর ধারণার উদ্ভব। ফর্ম ফ্যাক্টর সচরাচর ছয় ধরনের হয়ে থাকে, যথা-ব্যাক পে-ইন সিস্টেম, ফুল সাইজ AT (Advanced Technology), BabyAT, LPX (Low Profile eXtended), ATXও NLX (New Low Profile eXtended)এর মধ্যে কিছু মাদারবোর্ডে বেশ জনপ্রিয় কিছু ফর্ম ফ্যাক্টর সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো। **এটি** (AT-Advanced Technology) **এবং বেবি এটি** (Baby AT) সবচেয়ে পুরানো এবং বিলুপ্তপ্রায় মাদারবোর্ড প্রযুক্তি।

এটিএক্স (ATX-Extended Technology): এটিএক্স টাইপের মাদারবোর্ডে রয়েছে দুটি PS (Personal System)/2 পোর্ট, দুটি ইউএসবি পোর্ট, একটি প্যারালাল পোর্ট এবং কমপক্ষে একটি সিরিয়াল পোর্ট। এ মাদারবোর্ডের আকৃতি ১২´´ ×৯.৬´´। এটিএক্স ফর্ম ফ্যাষ্টর চেনার সহজ উপায় হলো এতে কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে শাটডাউন করা যায়। আগের মতো কেসিংয়ের শাটডাইন বাটন চেপে কম্পিউটার শাটডাউন করতে হয় না। মাদারবোর্ড যদি এটিএক্স টাইপের হয়, তবে কেসিং এর পাওয়ার সাপ্লাই এটিএক্স কম্পাটিবল হতে হবে।

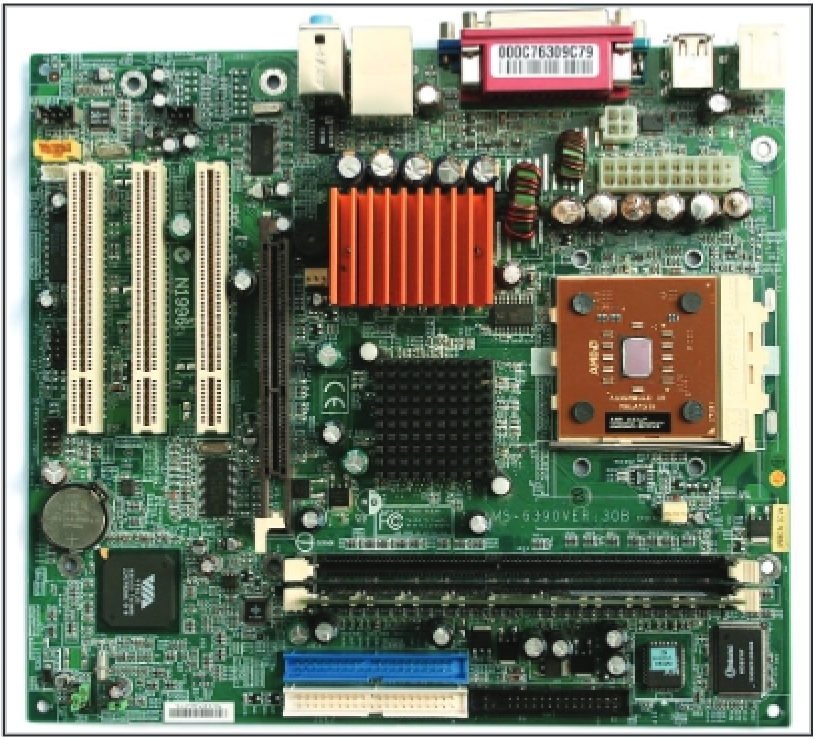

চিত্র ৩.৪ : এটিএক্স মাদার বোর্ড

মাদারবোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্টসমূহ

চিপসেট (Chipset)

চিপসেট মাদারবোর্ডের প্রয়োজনীয় একটি উপাদান, যা নির্দিষ্ট প্রসেসর ও মেমোরি সিস্টেমকে সাপোর্ট করে। চিপসেটকে মাদারবোর্ডের প্রধান লজিক্যাল ইউনিট বলা যায়। কেননা এটি প্রসেসর, মেমোরি, ক্যাশ এবং পিসিআই বাসের অন্যান্য ডিভাইসসহ কম্পিউটারের বিভিন্ন ইন্টিগ্রেটেড কম্পোন্যান্টের মাঝে ডাটা আদান প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে। চিপসেটের কাজ হচ্ছে মেমোরি, আইডিই (IDE-Integrated Drive Electronics), পিসিআই (PCI-Peripharal Component Interconnect) ব্রিজ, আরটিসি (RTC-Real Time Clock), ডিএমএ (DMA-Direct Memory Access), কী-বোর্ড, মাউস এবং ইউএসবি(USB-Universal Serial Bus) ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা।সিস্টেমে চিপসেটকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়-নর্থ ব্রিজ(North Bridge)ও সাউথ ব্রিজ(South Bridge)। নর্থ ব্রিজের সাথে সিপিইউ বাস, র‍্যাম মেমোরী বাস, গ্রাফিক্স বাস যুক্ত থাকে। সাউথ ব্রিজের কার্যক্রম শুধু এক্সটারনাল ডিভাইসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি সিস্টেমের IDE, ISA, PCI, USBইত্যাদি বাস ও কানেকটর নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রিজ বলতে এখানে এমন একটি ডিভাইসকে বুঝানো হয়েছে, যা একই সাথে একাধিক মেমোরি বাসকে সংযুক্ত করতে পারে। বর্তমানে মাদারবোর্ড প্রযুক্তির উন্নতির কারণে ভেন্ডরগন প্রয়োজনে নর্থ-সাউথ ব্রিজকে অপরিবর্তিত রেখে কেবল সাউথ ব্রিজকে আপগ্রেড করতে পারবে। তবে, ইন্টেল প্রচলিত উভয় ব্রিজকে উন্নয়ন করে হাব হিসেবে ৮০০ সিরিজের মাদারবোর্ডে স্থাপন করেছে, এরই

ধারাবাহিকতায় ইন্টেল নর্থ ব্রিজকে মেমোরি কন্ট্রোলার হাব এবং সাউথ ব্রিজকে ইনপুট/আউটপুট হাব হিসেবে নাম পরিবর্তন করেছে। নামে পরিবর্তন আসলেও ইন্টেলের চিপসেটে এদের ফাংশন কিন্তু একই। চিপসেট ডিজাইন বেশ জটিল এবং ব্যয়সাধ্য হওয়ায় হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান চিপসেট প্রস্তুত করছে। বিশ্বখ্যাত প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেল পেন্টিয়ামের সাথে মানানসই চিপসেট নিজেরাই তৈরি করে। তাই ইন্টেল প্রসেসরের সাথে ইন্টেল চিপসেটের মাদারবোর্ডের কম্পাবিলিটি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন প্রশ্ন উঠেনি। আবার এই কম্বিনেশন যুক্ত পিসিতে সিস্টেমের সমস্যাও কম।

অপরদিকে এএমডি(AMD-Advanced Micro Device) এর আধুনিক প্রসেসরগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিপসেট তৈরির জন্য রয়েছে একাধিক থার্ড পার্টি প্রতিষ্ঠান। এদের মধ্যে VIA, SIS (Silicon Integrated Systems), ALI (Acer Laboratories Incorporated) উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ইন্টেল প্রসেসরের জন্যও এরা চিপসেট নির্মাণ করে।জনপ্রিয় প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেল কর্পোরেশন প্রসেসরের জন্য মাদারবোর্ড

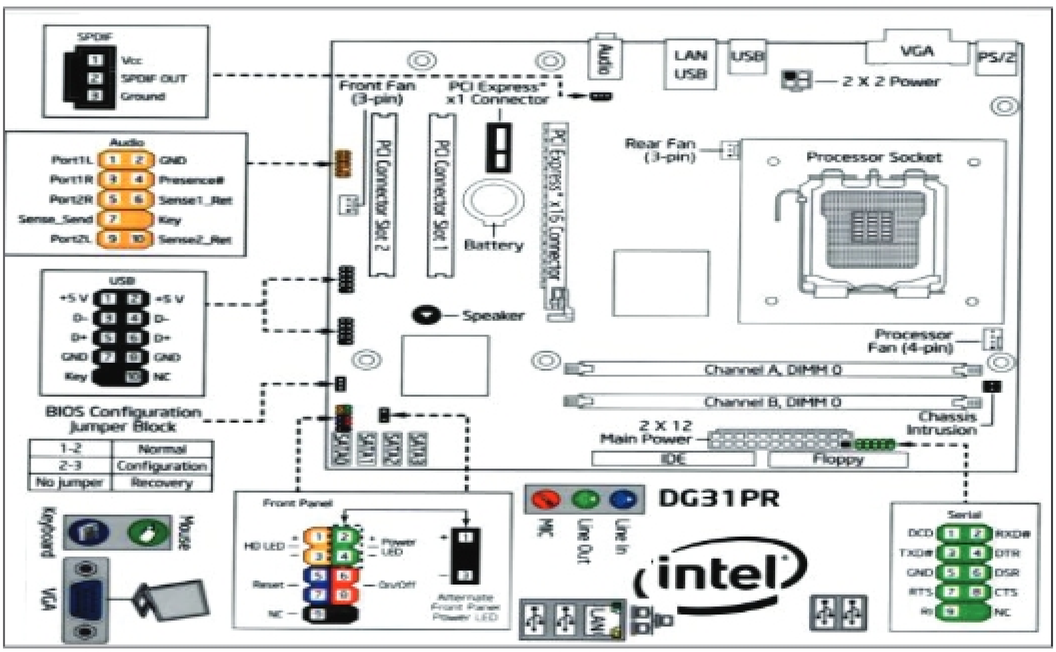

চিত্র ৩.৫ : ইন্টেল মাদারবোর্ডের বিভিন্ন অংশ

নিজেরাই তৈরি করে। এছাড়া ইন্টেলের চিপসেট দিয়েও বহু কোম্পানী মাদারবোর্ড তৈরি করে থাকে। ইন্টেলের যেসব মাদারবোর্ড বিভিন্ন সময়ে তৈরি হয়েছে, তাদের মধ্যে D850MD, D815GEW, D815EFV, D815EPEA2, D815EEA2, D845WN ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। এই মাদারবোর্ডগুলো প্রত্যেকটিই এটিএক্স টাইপের। এর মধ্যে পেন্টিয়াম ফোর প্রসেসর সাপোর্ট করে D845WN এবং D850MD478 পিন প্যাকেজের এই মাদারবোর্ডে যথাক্রমে ইন্টেল ৪45এবং ৪50 চিপসেট ব্যবহার করা হয়। D850MD তে রয়েছে তিনটি পিসিআই স্লট, একটি সিএনআর এবং চারটি মেমোরি স্লট | D845WN মাদারবোর্ড সর্বোচ্চ তিন GHz (Giga

২০২৪

Hartz) এর পেন্টিয়াম ফোর প্রসেসর সাপোর্ট করতে পারে। এতে রয়েছে ছয়টি পিসিআই এবং একটি সিএনআর স্লট । D845WNএর ফ্রন্ট সাইড বাস স্পীড হলো 400 Mhz (Mega Hartz)| এছাড়া ইন্টেল পর্যায়ক্রমে D940, D945, G31, DG35, DG41, DG45 মডেলের মাদারবোর্ড তৈরি করেছে। বিভিন্ন মডেল ও চিপসেট বিশিষ্ট মাদারবোর্ড প্রস্তুতকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে- আসুস, গিগাবাইট, এমএসআই, ডিএফআই, এলিট, ট্রান্সসেন্ড, একর্প, অকটেক ইত্যাদি।

বাস লজিক (Bus Logic)

কম্পিউটারের সার্বিক স্পিড যেসব কারণে প্রভাবিত হয়, তার মধ্যে বাস স্পিড উল্লেখযোগ্য। প্রসেসর এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মধ্যে ডাটা কমিউনিকেশন পথই হলো বাস লজিক। আর তাই সাধারণ পথের মতোই এই পথ যত বড় হবে পিসির কাজ করার দক্ষতা এবং গতি ততো বাড়বে। প্রসেসরের স্পীডের মতো বাস স্পীডকেও মেগাহার্জ এ প্রকাশ করা হয়। বাস যত প্রশস্ত হবে তত বেশি পরিমাণ ডাটা লেনদেন হতে পারবে এবং বাস স্পীড যত বেশি হবে ডাটা তত দ্রুত গতিতে স্থানান্তরিত হবে। সিপিইউ'র সিস্টেম বোর্ডের বাস স্ট্রাকচারকে দু ভাবে ভাগ করা যায় ঃ যথা ইন্টার্নাল এবং এক্সটার্নাল সিস্টেম বাস।

ইন্টার্নাল সিস্টেম বাস

৬৪ বিটের (বাইনারী নাম্বারিং সিস্টেমের একটি অংক ০ অথবা ১) ইন্টার্নাল বাসের কাজ হলো সিস্টেমের সব তথ্য এক্সটার্নাল বাসে আদান প্রদান করা। মাদারবোর্ডের আভ্যন্তরীণ কন্ট্রোল বাস, এড্রেস বাস ও ডাটা বাস নিয়ে ইন্টার্নাল সিস্টেম বাসগঠিত। সিস্টেমের কন্ট্রোল সিগনালসমূহ কন্ট্রোল বাসের মাধ্যমে সিপিইউ হতে অন্যান্য ডিভাইসে এবং অন্যান্য ডিভাইস হতে সিপিইউতে পাঠানো হয়। এড্রেস বাস ব্যবহার করে ডাটা এবং ইনস্ট্রাকশন এর নিদিষ্ট লোকেশনকে এড্রেস করা হয়। এটি সিস্টেম মেমেরিতে (র‍্যাম) নির্দিষ্ট ডাটার লোকেশন এড্রেস করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এড্রেস বাস একমুখী হয়ে থাকে। ডাটা বাস হচ্ছে ডাটা বা ইনস্ট্রাকশনকে বিভিন্ন কম্পোনেন্টে স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট সংখ্যক কন্ডাকটিভ লাইন বা বাস। ডাটা বাস উভয়মুখী হয়ে থাকে।

এক্সটার্নাল সিস্টেম বাস

মাদারবোর্ডের সাথেএক্সটার্নাল পেরিফেরাল সংযোগের জন্য যে বাস ব্যবহৃত হয় তাকে এক্সটার্নাল সিস্টেম বাসবলে। মাদারবোর্ডে বিভিন্ন ধরণের এক্সটার্নাল বাস থাকে। তার মধ্যে ISA(Industry Standard Architecture), PCI (Peripharal Component Interconnect), AGP (Acclerated Graphics Port),USB (Universal Seirial Bus),IDE (Integrated Drive Electronics) উল্লেখ্যযোগ্য।

আইএসএ(ISA)বাস: ISAমূলত একটি পুরানো প্রযুক্তি, সিস্টেমের কম স্পীডের ডিভাইস এই বাসের সাথে যুক্ত করা হয় । এটি 8bit অথবা 16 bit ডাটা ট্রান্সফার সাপোর্ট করে এবং 8.33 MHz বাস ফ্রিকোয়েন্সিতে অপারেট করে।

পিসিআই(PCI)বাস: PCI32bit থেকে 64 bit বিট বাস সাপোর্ট করে। পিসিআই বাসকে এক্সটার্নাল বাসের স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে ধরা হয়। এটি আইএসএ অপেক্ষা অনেক দ্রুত (33 থেকে 66Mhz) গতিসম্পন্ন হয়ে থাকে। এছাড়াও বাস মাস্টারিং প্রসেস ব্যবহার করে পিসিআই কার্ডগুলো সিস্টেমের গতি আরো বাড়িয়ে দিতে পারে।

এজিপি(AGP)বাস: পিসিআই থেকে কমপক্ষে ৪ গুণ স্পীডের AGP। সাধারণত সিস্টেমের ভিডিও এক্সপানশন বাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এজিপি ইন্টারফেসে ভিজিএ কার্ড বসানো হয়। সিস্টেম র‍্যামকে গ্রাফিক্স র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করে এটি গ্রাফিক্স হার্ডওয়্যার এবং মেইন মেমোরির মধ্যে হাইস্পীড পাথ তৈরি করে। এছাড়াও এতে আলাদা ভির‍্যাম বসানো যায়। বর্তমানে এজিপি ইন্টারফেসের পরিবর্তে আরো উচ্চ গতির PCI Expressবাস এ কাজে ব্যবহৃত হয়।

টেবিল: এজিপি বাস পিন নং ও সিগনালের নাম ও ভোল্টেজ

ইউএসবি(USB)বাস

ইউএসবি সিস্টেমের সাথে বিভিন্ন পেরিফেরালের সংযোগ ও ডাটা দেয়া নেয়ার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ প্লাগ এন্ড প্লে সুবিধার কারণে সিস্টেম রানিং অবস্থায় যে কোন ডিভাইস এর সাথে যুক্ত করে কাজ করা যায়। ইউএসবি সুবিধা সম্বলিত স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, মাউস, কীর্বোড, জয়স্টিক ইত্যাদি এই বাসের সাথে সংযোগ করা হয়।

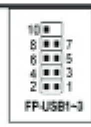

Pin	Pin Assignment	Pin	Pin Assignment
1	VCC	2	VCC
3	Data0 -	4	Data1 -
5	Data0 +	6	Data1 +
7	Ground	8	Ground
9	NC	10	NC

চিত্র ৩.৬: ইউএসবি বাস

আইডিই (IDE)বাস: IDEসিস্টেমের হার্ডড্রাইভ, ডিভিডি-রম, সিডিরম ইত্যাদি আইডিই বাসের মাধ্যমে মাদারবোর্ডের সাথে যুক্ত থাকে। এর একটি ক্যাবল মাদারবোর্ডে সংযোগের মাধ্যমে দুটি ডিভাইসকে একই সাথে যুক্ত করা যায়।

ক্যাশ মেমরি (Cache Memory)

বাস ছাড়াও সিস্টেম স্পীডকে প্রভাবিত করে এমন একটি সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি। ইহা প্রসেসর ও প্রধান মেমোরি র‍্যামের মধ্যে ডাটা স্থানান্তরের গতি বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রসেসরে কতটুকু সময়ের মধ্যে ডাটা স্থানান্তর বা ইনস্ট্রাকশন নির্বাহ হবে তা নির্ভর করে ক্যাশ মেমোরির উপর। 486 থেকে পেন্টিয়াম পর্যন্ত সব প্রসেসরেই Level 1 ক্যাশ মেমোরি একটি চিপে অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেলেরন, পেন্টিয়াম টু, পেন্টিয়াম থ্রী ও পেন্টিয়াম ফোর প্রসেসর চিপে Level 2 ক্যাশ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যদিও Level 2 ক্যাশ থেকে তথ্য রিট্রাইভ করতে প্রসেসর L1 থেকে সামান্য সময় বেশি নেয়, তবু Level 2 ক্যাশ মেমোরি কম্পিউটারের প্রধান মেমোরি র‍্যামের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত গতিসম্পন্ন। ক্যাশ মেমোরি আবার দু'প্রকার-ডিস্ক ক্যাশ এবং মেমোরি ক্যাশ। হার্ডডিস্ক থেকে এক্সেস করা তথ্য সাময়িক ভাবে সিস্টেম র‍্যামের একটি অংশে ২০৩৪

স্টোর করে রাখে ডিস্ক ক্যাশ। আর মেমোরি বা র‍্যাম থেকে ইনস্ট্রাকশন ও ডাটাকে অস্থায়ী ভিত্তিতে স্টোর করে মেমোরি ক্যাশ।

(গ) প্রসেসর ইন্টারফেস

প্রসেসর ইন্টারফেসএক ধরণের সকেট যা প্রসেসরকে মাদরবোর্ডে স্থাপনের কাজে ব্যবহৃত হয়। ইন্টেল মাদরবোর্ডের জন্য সকেট ১ থেকে সকেট ৮ পর্যন্ত ৮ ধরণের স্পেসিফিকেশন বিশিষ্ট প্রসেসর ইন্টারফেস ডিজাইন প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে সকেট ১ থেকে সকেট ৩ পর্যন্ত ভার্সনে যথাক্রমে ইন্টেল 80486SX, 80486DXএবং 804868 Over Drive প্রসেসর ব্যবহৃত হয়। সকেট ৪ থেকে সকেট ৬ ভার্সনে ইন্টেল পেন্টিয়াম প্রসেসরের প্রাথমিক কিছু ভার্সন ব্যবহৃত হত যার প্রত্যেকটির গতি ও প্রয়োজনীয় পাওয়ার ছিল ভিন্ন ভিন্ন মানের। নিচে পরবর্তী প্রসেসর ইন্টারফেসগুলোর বর্ণনা করা হলো-

সকেট ৭ ও ৮ (Socket 7 and 8)

সকেট ৭ মাদারবোর্ড Intel Pentium, Intel Pentium MMX এবং AMD K6 প্রসেসর সাপোর্ট করে। সকেট ৮ Intel Pentium Pro প্রসেসরকে সার্পোট করে। এ সকেট দুটির প্যাকেজ টাইপ হলো PGA (Pin Grid Array)। সকেট ৭ এর পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ৩২১ এবং সকেট ৮ এর পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ৩৮৭।

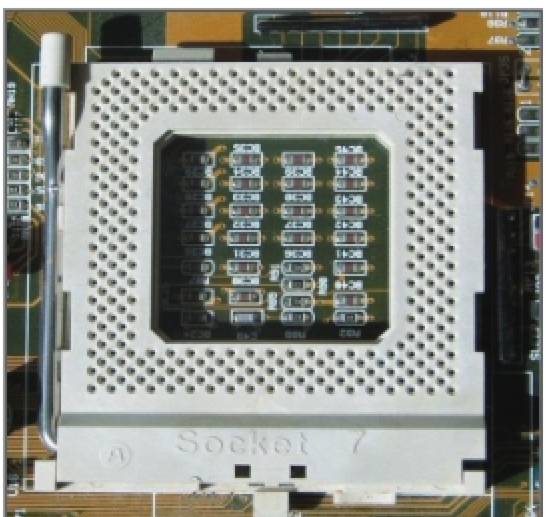

চিত্র৩.৭: সকেট ৭

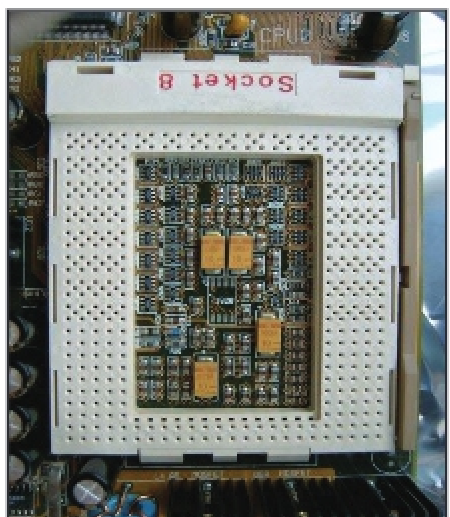

চিত্র ৩.৮: সকেট ৮

স্লট ১: স্লট ১ Pentium II এবংPentium III প্রসেসরগুলো সাপোর্ট করে। এটির প্যাকেজ টাইপ স্লট। এটির পিন কনট্যাক্ট সংখ্যা ২৪২।

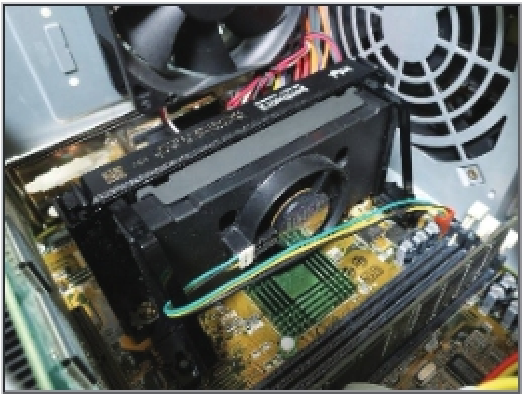

চিত্র ৩.৯ : স্লট ১

স্লট ২: Pentium II Xeon এবং Pentium III Xeon প্রসেসরগুলো সাপোর্ট করে। এটির প্যাকেজ টাইপ স্লট ২। এটির পিন কনট্যাক্ট সংখ্যা ৩৩০।

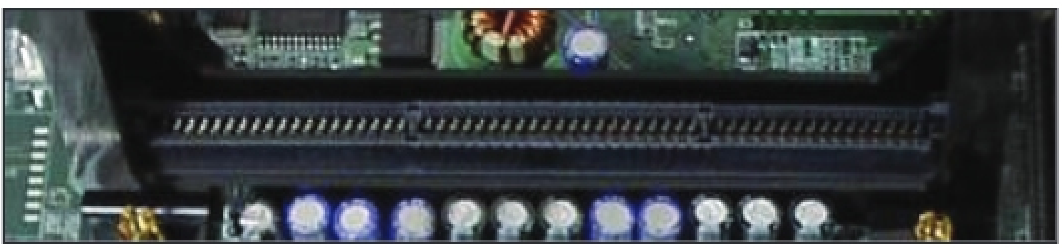

চিত্র ৩.১০: স্লট ২

সকেট ৩৭০: ইহা ৩৭০টি পিন বিশিষ্ট ইন্টেল চিপসেট ভিত্তিক মাদারবোর্ড। এটি Pentium III, Celeron, VIA Cyrix III, VIA C3 প্রসেসর সাপোর্ট করে। এ ধরণের মাদারবোর্ডের উল্লেখযোগ্য ফিচারগুলো হলো, এর অনবোর্ড গ্রাফিক্স এবং সাউন্ড কার্ড থাকে। ফলে এ ধরণের মাদারবোর্ডগুলোর সুবিধা বেশি। তবে এগুলো হাইরেজ্যুলেশনের গ্রাফিক্স, মাল্টিমিডিয়া কাজ কিংবা গেমারদের জন্য তেমন উপযোগী নয়।

স্লট এ/সকেট ৪৬২

স্লট এ/সকেট ৪৬২ এর মাদারবোর্ডে AMD Athlon, AMD Duron, AMD Athlon XP, AMD Athlon XP-M, AMD Athlon MP, AMD Sempron প্রসেসরের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটির প্যাকেজ টাইপ পিজিএ। এটির পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ৪৬২। এ সকেটে প্রসেসর লাগানোর সময় লিভারটিকে টান দিয়ে উপরে তুলে প্রসেসর বসাতে হয়। প্রসেসর বসানো সময় খেয়াল রাখতে হয় প্রসেসরের একটি কর্ণার সমান নয় আবার সকেটটিতে খেয়াল করলে দেখা যাবে এক কর্ণারে একটি পিন কম আছে। সুতরাং প্রসেসরের যে কর্ণারটি সমান নয় সে কর্ণারটি সকেটে যে কর্ণারে পিন নাই সে দিকে বসবে। প্রসেসর বসানোর পর লিভারটিকে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিতে হয় এবং এর পর কুলিং ফ্যান বসাতে হয়। চিত্রে নীচে বাম দিকে দেখ একটি পিন কম আছে।

সকেট ৪২৩

সকেট ৪২৩ Pentium IVপ্রসেসর এ ব্যবহৃত হয়। এটির পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ৪২৩ এবং এটির প্যাকেজ টাইপ পিজিএ।

সকেট এম/৪৭৮

সকেট এম/৪৭৮ Intel Core Solo, Intel Core Duo, Intel Dual- Core Xeon, Intel Core 2 Duo, প্রসেসর সাপোর্ট করে। এটির প্যাকেজ টাইপ পিজিএ। এটির পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ৪৬২।

এলজিএ (LGA-Land Grid Array) 775

এলজিএ ৭৭৫ সকেট Intel Pentium IV, Intel Pentium D, Intel Celeron, Intel Pentium XE, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Xeon প্রসেসর সাপোর্ট করে। এটির প্যাকেজ টাইপ LGA (Land Grid Array) এটির পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ৭৭৫।

২০১৪

এলজিএ (LGA-Land Grid Array) 1366

এলজিএ ১৩৬৬ সকেট Intel Core i7 (900 series), Intel Xeon (35xx, 36xx, 55xx, 56xx series) প্রসেসর সাপোর্ট করে। এটির প্যাকেজ টাইপ **LGA (Land Grid Array)** এটির পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ১৩৬৬।

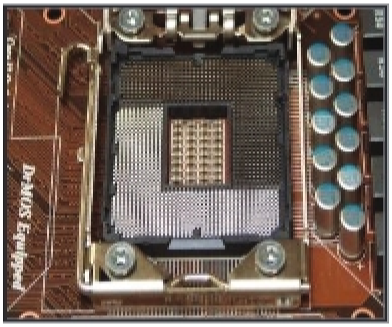

চিত্র ৩.১১ **:** এলজিত্র প্রসেসর সকেট

এলজিএ (LGA-Land Grid Array) 1200

এলজিএ ১২০০ সকেট Intel Comet Lake, Intel Rocket Lake প্রসেসর সাপোর্ট করে। এটির প্যাকেজ টাইপ **LGA (Land Grid Array)** এটির পিন কন্ট্যাক্ট সংখ্যা ১২০০। এটি ২০২০ সালে রিলিজ হয়।

(ঘ) র‍্যাম (RAM-Random Access Memory)

র‍্যাম মাদারবোর্ডের র‍্যাম স্লটের সাথে যুক্ত থেকে পঠন এবং লিখন দুটি কাজই সম্পন্ন করে। এই স্মৃতি একটি অস্থায়ী স্মৃতি বা মেমোরি। কম্পিউটারে যতক্ষন বিদ্যুৎ সরবরাহ তাকে ততক্ষণ র‍্যাম এ তথ্যসমূহ সংরক্ষিথ থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে র‍্যাম তার সমস্ত তথ্য মুছে ফেলে। তাই র‍্যামকে অস্থায়ী স্মৃতি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের র‍্যাম ব্যবহার করা হয়। সেগুলোর বর্ননা দেয়া হলো–

SRAM (Static RAM)

প্রতিটি মেমোরি সেলের জন্য এসর‍্যাম মাল্টিপল ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে থাকে। এদের সংখ্যা চারটি থেকে ছয়টিহয়ে থাকে। তবে প্রতিটি সেলে ক্যাপাসিটর থাকে না। প্রাথমিকভাবে এটি ক্যাশের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চিত্র ৩.১২: SRAM

DRAM (Dynamic RAM)

ডির‍্যামকে পুন: পুন: রিফ্রেশ হতে হয় এবং এটি এক জোড়া ট্রানজিস্টরসহ মেমোরি সেল বহন করে।
ট্রানজিস্টরটিকে কলামের ভিতর প্রতি বিটে অ্যাকটিভেট করার জন্য DRAM যথাযথ কলামে একটি চার্জ প্রেরণ করে থাকে।

চিত্র ৩.১৩ : DRAM

EDODRAM (Extended Data Out Dynamic RAM)

EDODRAM পরবর্তী বিট শুরু করার আগে প্রথম বিটের সকল প্রসেসিংয়ের জন্য অপেক্ষা করে না। প্রথম বিটটি স্থাপন হবার পরপরই EDODRAM পরবর্তী বিটটিকে খুঁজতে থাকে।

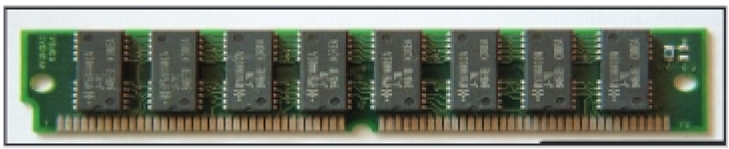

চিত্র ৩.১৪: EDODRAM

SDRAM (Synchronous Dynamic RAM)

SDRAM এর ক্ষেত্রে ব্রাস্ট মোড কনসেপ্টের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। যার ফলে সিস্টেমের ফারফরমেন্স আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইডিওডির‍্যাম এর চেয়ে এসডির‍্যাম দ্রুত কাজ করে। এ র‍্যামে ডাটা ট্রান্সফার রেট 528 MBPS।

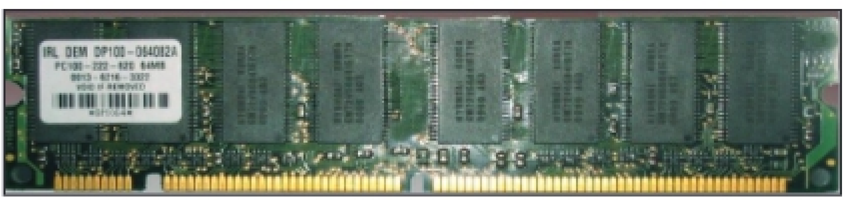

চিত্র৩.১৫: SDRAM

DDRSDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM)

DDRSDRAM র‍্যামে উচ্চ Bandwidth রয়েছে যার মানে হলো এটি দ্রুত গতি সম্পন্ন। এ র‍্যামে ডাটা ট্রান্সফার রেট 1064 MBPS।

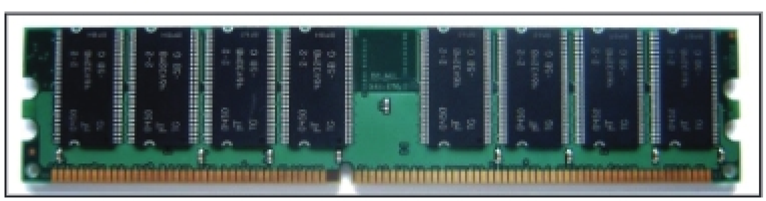

চিত্র ৩.১৬ : DDRSDRAM

ঙ) হার্ড ডিস্ক

হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ/হার্ড ডিস্ক/হার্ড ড্রাইভ/ফিক্সড ড্রাইভ একটি ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ডাটা স্টোরেজ ডিভাইস যা চৌম্বকীয় উপাদানের সাথে আবৃত এক বা একাধিক অনড় দ্রুত ঘূর্ণনকারী থালা ব্যবহার করে ডিজিটাল ডাটা জমা করে ও পুনরুদ্ধার করে। এটি একটি সেকেন্ডারি টাইপ মেমোরি। এটি একটি স্থায়ী মেমোরি। হার্ড ডিস্ক নষ্ট হওয়া বা মোছনীয় কোন কমান্ড ব্যতীত এখানকার তথ্যসমূহ নষ্ট হয় না। এ কারণে অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হার্ড ডিস্কে ইনস্টল করা হয় অথবা ব্যাকআপ রাখা হয়। এটির ধারণ ক্ষমতার একক হচ্ছে বাইট। বর্তমানে 20 TB (Tera Byte) হার্ড ডিস্ক ব্যবহৃত হচ্ছে। ডেস্কটপ কম্পিউটারে ৩.৫ ইঞ্চি সাইজের হার্ড ডিস্ক লাগানো হয়। হার্ড ডিস্কের কাজ বা উদ্দেশ্য এক হলেও এদের সংযোগ পদ্ধতি এক নয়। হার্ড ডিস্কের পোর্ট ভেদে এদের সংযোগ পদ্ধতি হার্ড ডিস্কের পোর্ট ও মাদার বোর্ডের পোর্টের সাথে মিল থাকতে হয়।

হার্ডডিস্কের প্রকারভেদ: হার্ড ডিস্কের পোর্টের উপর ভিত্তি করে হার্ড ডিস্ককে প্রধানত ৪ (চার) ভাগে ভাগ করা যায়।

আইডিই/পাটা (IDE-Integrated Drive Electronics/PATA-Parallel Advanced Technology Attachment) হার্ড ডিস্ক:

আইডিই হার্ড ডিস্কে চল্লিশ পিনের ক্যাবল কানেক্টর পোর্ট থাকে। একটি পাতা(PATA) ক্যাবলের মাধ্যমে এক মাথা হার্ড ডিস্কে ও অন্য মাথা মাদার বোর্ডে সংযুক্ত হয়। এ হার্ড ডিস্কে কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই থেকে একটি চার পিনের মোলেক্স পাওয়ার কান্টের হার্ড ডিস্কে সংযোগ করতে হয়।

চিত্র ৩.১৭: আইডিই পোর্টের হার্ড ডিস্ক (পাটা)

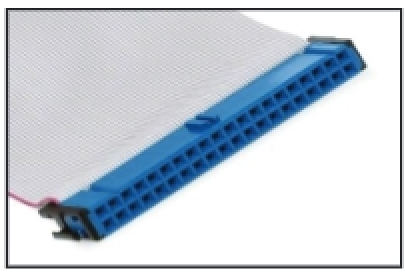
চিত্র ৩.১৮: আইডিই পাটা ক্যাবল

সাটা(SATA-Serial Advanced Technology Attachment)হার্ড ডিস্ক

পোর্টের নাম অনুসারে হার্ড ডিস্কের নামকরণ করা হয়েছে সাটা হার্ড ডিস্ক। এধরনের হার্ড ডিস্ক ৭ পিন বিশিষ্ট সাটা ক্যাবলের মাধ্যমে হার্ড ডিস্ককে মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ করা হয়। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে ১৫ পিনের সাটা পাওয়ার সাটা হার্ড ডিস্কের সাথে সংযোগ করা হয়।

চিত্র ৩.১৯: সাটা হার্ড ডিস্ক

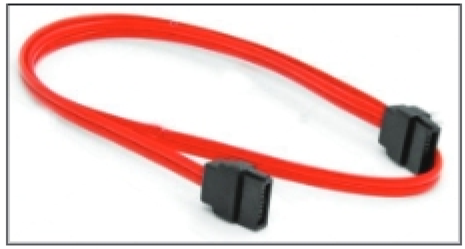

চিত্র ৩.২০: সাটা ক্যাবল

স্ক্যাজি (SCSI- Small Computer System Interface)হার্ড ডিস্ক

এ হার্ড ডিস্কের ডাটা পোর্টে ৫০ থেকে ৬৮টি পিন থাকে। এ হার্ড ডিস্ক মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ দেয়ার জন্য স্ক্যাজি ক্যাবল দরকার। এ ক্যাবলে সর্বোচ্চ ১৬ টি হার্ড ডিস্ক সংযোগ করা যায়।

চিত্র ৩.২১: স্ক্যাজি হার্ড ডিস্ক

চিত্র ৩.২২: স্ক্যাজি ক্যাবল

এসএসডি (SSD-Solid State Device)

এসএসডি সবচেয়ে আপডেট টেকনোলজি। এখনকার ল্যাপটপে এবং ডেক্সটপে এসএসডি টেকনোলজির হার্ড ড্রাইভ ব্যবহৃত হচ্ছে। এটির সুবিধা হলো পূর্বেল টেকনোলজির চেয়ে এটি ৩০০ গুণ দ্রুত গতিতে কাজ করে। এটি দুটি পোর্টের হয়। একটি সাটা পোর্টের অন্যটি M.2 পোর্টের। যে এসএসডি সাটা পোর্টের সেটি সাটা পোর্টের হার্ড ডিস্কের নিয়ম অনুযায়ী সংযোগ করতে হয়। আর এম.২ পোর্টের হার্ড ডিস্কটি মাদার বোর্ডে সরাসরি এম.২ পোর্টে সংযোগ

চিত্র ৩.২৩: সাটা পোর্টের এসএসডি

করতে হয়। এসএসডি ব্যবহারের সময় তোমার কম্পিউটারে ব্যবহৃত ইউন্ডোজটি ব্যবহার করতে হলে এএসডির সাথে দেয়া সফটওয়্যারটির মাধ্যমে তোমার ব্যবহৃত উইন্ডোজটিকে ক্লোন করে নিবে।

চিত্র ৩.২৪: M.2 স্লটের এসএসডি

এক্সটারনাল হার্ডডিস্ক

ইউএসবি/এক্সটারনাল হার্ডডিস্ক/পোর্টেবল হার্ড ডিস্ক কমিপউটার অথবা ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টে সংযোগ দিয়ে কাজ করা হয়। এ ডিভাইসটি সংযোগ দেয়ার জন্য ইউএসবি ৩.০ মাইক্রো-বি ১০ পিন প্লাগ এর ক্যাবল অথবা মিনি ইউএসবি ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। মিনি ইউএসবি/মাইক্রোবি হার্ড ডিস্কের সাথে ও অপর প্রান্ত কম্পিউটার/ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টের সাথে সংযোগ করা হয়।

চিত্র ৩.২৫: ইউএসবি হার্ড

চ) অপটিক্যাল ড্রাইভ

অটিক্যাল ড্রাইভটি সিডি (CD-Compact Disk) এবং ডিভিডি (DVD-Digital Versatile Disk) এ তথ্য স্থায়ীভাবে জমা রাখা এবং পরবর্তীতে পুনরুদ্ধার করার কাজে ব্যবহৃত হয়। কাজের উপর ভিত্তি করে অপটিক্যাল ড্রাইভকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

সিডি রিডেবল (Readable) অপটিক্যাল ড্রাইভঃ সিডি রিডেবল (Readable)অপটিক্যাল ড্রাইভটি শুধুমাত্র সিডিতে থাকা ডাটা যেমন–ছবির ফাইল, ভিডিও ফাইল, অডিও ফাইল, এমএসওয়ার্ডের ফাইল, ফটোশপের ফাইল ইত্যাদি পড়তে পারে। ব্লাঙ্ক(Blank) সিডিতে কোন ফাইল স্টোর করার ব্যবস্থা থাকে না। সিডি রিডেবল অপটিক্যাল ড্রাইভকে সিডি রম(ROM) বলে।

সিডি রিড/রাইটেবল(Writable) অপটিক্যাল ড্রাইভঃ সিডি রিড/রাইটেবল(Writable) অপটিক্যাল ড্রাইভটি সিডিতে থাকা ডাটা যেমন–ছবির ফাইল, ভিডিও ফাইল, অডিও ফাইল, এমএসওয়ার্ডের ফাইল, ফটোশপের

ফাইল ইত্যাদি পড়তে পারে এবং ব্লাঙ্ক (Blank)সিডিতে ফাইল স্টোর করতে পারে। সিডি রিড/রাইটেবল (Writable) অপটিক্যাল ড্রাইভ কে সিডি রাইটার(Writer) বলে।

ডিভিডি রিডেবল(Readable) অপটিক্যাল ড্রাইভ

ডিভিডি রিডেবল(Readable) অপটিক্যাল ড্রাইভটি শুধুমাত্র ডিভিডিতে থাকা ডাটা যেমন–ছবির ফাইল, ভিডিও ফাইল, অডিও ফাইল, এমএসওয়ার্ডের ফাইল, ফটোশপের ফাইল ইত্যাদি পড়তে পারে। ব্লাঙ্ক(Blank)ডিভিডিতে কোন ফাইল স্টোর করার ব্যবস্থা থাকে না। ডিভিডি রিডেবল (Readable) অপটিক্যাল ড্রাইভকে ডিভিডি রম বলে।

ডিভিডি রিড/রাইটেবল অপটিক্যাল ড্রাইভ

ডিভিডি রিড/রাইটেবল অপটিক্যাল ড্রাইভটি ডিভিডিতে থাকা ডাটা যেমন–ছবির ফাইল, ভিডিও ফাইল, অডিও ফাইল, এমএসওয়ার্ডের ফাইল, ফটোশপের ফাইল ইত্যাদি পড়তে পারে এবং ব্লাঙ্ক ডিভিডিতে ফাইল স্টোর করতে পারে। ডিভিডি রিড/রাইটেবল অপটিক্যাল ড্রাইভটি ড্রাইভটিকে ডিভিডি রাইটার বলে।

পোর্টের উপর ভিত্তি করে অপটিক্যাল ড্রাইভ তিন প্রকার

আইডিই /পাটা (IDE-Integrated Device Electronics / PATA-Parallel Advanced Technology

Attachment)অপটিক্যাল ড্রাইভ

আইডিই অপটিক্যাল ড্রাইভে চল্লিশ পিনের ক্যাবল কানেক্টর পোর্ট থাকে। একটি পাতা (PATA) ক্যাবলের মাধ্যমে এক মাথা অপটিক্যাল ড্রাইভে ও অন্য মাথা মাদার বোর্ডে সংযুক্ত হয়। এ অপটিক্যাল ড্রাইভে কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই থেকে একটি চার পিনের মোলেক্স পাওয়ার কান্টের অপটিক্যাল ড্রাইভে সংযোগ করতে হয়।

সাটা (SATA-Serial Advanced Technology Attachment)অপটিক্যাল ড্রাইভ

সাটা অপটিক্যাল ড্রাইভে সাটা ক্যাবল লাগানোর জন্য সাত পিনের একটি পোর্ট ও সাটা পাওয়ার লাগানোর জন্য ১৫ পিনের একটি পাওয়ার পোর্ট অপটিক্যাল ড্রাইভে সংয়োগ কার হয়। সাটা ক্যাবলের অপর প্রান্ত মাদারবোর্ডে সাটা পোর্টের সাথে সংযোগ করা হয়। পাওয়ার পোর্টের অপর প্রান্ত পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে সংযোগ থাকে।

এক্সটারনাল ডিভিডি

ইউএসবি/এক্সটারনাল ডিভিডি/পোর্টেবল ডিভিডি কমিপউটার অথবা ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টে সংযোগ দিয়ে কাজ করা হয়। এ ডিভাইসটি সংযোগ দেয়ার জন্য মিনি ইউএসবি ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। মিনি ইউএসবি ডিভিডির সাথে ও অপর প্রাপ্ত কম্পিউটার/ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টের সাথে সংযোগ করা হয়।

ছ) কুলিং ফ্যান (Cooling Fan)

কম্পিউটার চালু অবস্থায় এর অভ্যন্তরে ব্যবহৃত ডিভাইসসমূহে ডাটা (Data-মূলত ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল) এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে আসা যাওয়া করে। এ সময় ডাটার গতির কারণে ডিভাইসসূহে তাপ উৎপন্ন হয়। ফলে অতিরিক্ত তাপের কারণে ডিভাইস পুড়ে যায় অথবা অকেজো হয়ে যায়। এ ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে সেটির জন্য প্রয়োজন কম্পিউটার ডিভাইসসমূহকে ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা করা। কম্পিউটার এর ডিভাইসসমূকে ঠান্ডা রাখার জন্য যে ডিভাইস ব্যবহার করা হয় সেটি হলো কুলিং ফ্যান বা ডিভাইস ঠান্ডা করা পাখা। আমাদের ব্যবহৃত কম্পিউটারে সবচেয়ে বেশি গরম হয় সিপিইউ বা প্রসেসর। এ কারণে প্রসেসরের উপর সবসময় একটি ফ্যান সংযোগ দেয়া থাকে। এছাড়া পাওয়ার সাপ্লাই, কম্পিউটারের বডিতে, ল্যাপটপের ভিতর, গ্রাফিক্স কার্ডের উপর ইত্যাদি ডিভাইস সমূহে কুলিং ফ্যান সংযোগ থাকে। কিছু কিছু কুলিং ফ্যানের নীচে যে অংশটি প্রসেসর বা অন্য ডিভাইসের সংস্পর্শে থাকে সেখানে একটি হিট সিঙ্ক (Heat Sink)থাকে। হিট সিঙ্ক সাধারণত অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি হয়। যাতে দ্রুত তাপ ফ্যানের কাছে আসতে পারে। তাপ ফ্যানের কাজে আসলে ফ্যানের বাতাস গরম বাতাসকে বের করে দেয়। এভাবে কম্পিউটার ঠান্ডা থাকে।

- চিত্র.৩.২২ কুলিং ফ্যান

জ) থার্মাল গ্লু(Thermal Glue)

থার্মাল গ্লু এক ধরনের পেস্ট। যে পেস্টকুলিং ফ্যানের হিট সিঙ্ক এর তলায় ও যে ডিভাইসের উপর কুলিং ফ্যান লাগানো থাকে তার উপরে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রসেসরে কুলিং ফ্যান ব্যবহার করার সময় প্রসেসরের উপরে ও কুলিং ফ্যানের হিট সিঙ্কের নীচে থার্মাল গ্লু ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যবহারের ফলে প্রসেসর ও হিট সিঙ্কের মাঝে কোন এয়ার গ্যাপ(Air gap) থাকে না ফলে তাপ হিট সিঙ্কের মাধ্যমে দ্রুত ফ্যানের কাছে পৌছতে পারে। এ পেস্ট লাগানোর পরে শক্ত হয়ে যায় এবং অ্যালুমোনিয়াম কন্ডাক্টরের মতো কাজ করে। বাজারে এটি প্যাকেট ও টিউব আকারে পাওয়া যায়।

চিত্র৩.২৩ঃ থার্মাল গ্লু

ঋ) পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট

প্রত্যেকটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস কার্যোপযোগী করার জন্য একটি ইলেকট্রিক্যাল সোর্স বা সাপ্লাই প্রয়োজন। হোক সেটি এসি বা ডিসি কারেন্ট। কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস সুতরাং এর প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশসমূহ কার্যোপযোগী করার জন্য সাধারণত একটি ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন হয়। এ পাওয়ার সাপ্লাইটি বিভিন্ন যন্ত্রাংশসমূহ যেমন মাদারবোর্ড, হার্ড ডিস্ক, অপটিক্যাল ড্রাইভ, গ্রাফিক্স কার্ড, কেসিং ফ্যান ইত্যাদি যন্ত্রাংশসমূহে বিভিন্ন মানের ভোল্টেজ সরবরাহ করে থাকে। কম্পিউটারের যন্ত্রাংশসমূহে ± ১২, ± ৫ ও ± ৩.৩ এ তিন ধরনের ডিসি ভোল্টেজ ব্যবহার করা হয়। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের আউটপুটে অনেকগুলো ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। কোন ক্যাবল মাদারবোর্ডের জন্য আবার কোনটি হার্ড ডিস্কের জন্য ইত্যাদি। আমাদের দেশে ইনপুট ভোল্টেজ হিসেবে ২২০ ভোল্ট ব্যবহার করা হয়। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটগুলো সাধারণত ৩০০ ওয়াট থেকে ৫০০ ওয়াট পর্যন্ত হয়। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটে বিভিন্ন ধরনের আউটপুট কানেক্টর রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

চিত্র৩.২৪: পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট

বার্জ (Berg)পাওয়ার কানেক্টর

বার্জ কানেক্টর মিনি মোলেক্স বা মিনি কানেক্টর নামেও পরিচিত। ফ্লপি ড্রাইভে এ কানেক্টরটি ব্যবহৃত হয়। এটি চার পিনে একটি কানেক্টর। এ কানেক্টরে ± ৫ ও ± ১২ ভোল্ট ব্যবহার করা হয়।

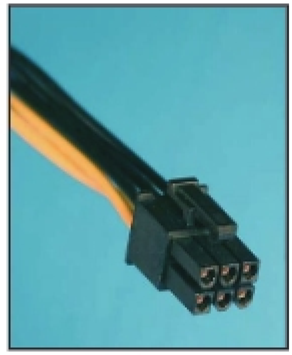

চিত্র ৩.২৫ : ৬ পিন

মোলেক্স (Molex) পাওয়ার কানেক্টর

মোলেক্স পাওযার কানেক্টরটি চার পিন বিশিষ্ট একটি পাওয়ার কানেক্টর। এ পাওয়ার কানেক্টরটি প্রসেসর কুলিং ফ্যান, পাটা পোর্টের হার্ড ডিস্ক ও অপটিক্যাল ড্রাইভ এবং কেসিং এর ফ্যানে ব্যবহার করা হয়। এ কানেক্টরে ± ৫ ও ± ১২ ভোল্ট ব্যবহার করা হয়।

SATA পাওয়ার কানেক্টর

SATA পাওযার কানেক্টরটি পনের পিন বিশিষ্ট একটি পাওয়ার কানেক্টর। এ পাওয়ার কানেক্টরটি SATA পোর্টের হার্ড ডিস্ক ও SATA পোর্টের ড্রাইভ হয়। এ কানেক্টরে ± ৩, (৫ ও (১২ ভোল্ট ব্যবহার করা হয়)।

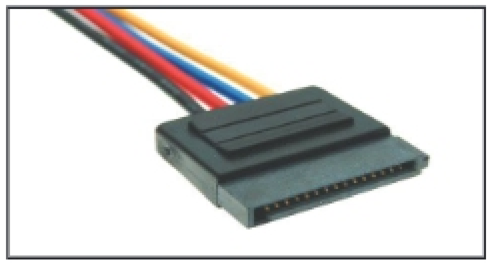

চিত্র ৩.২৬: SATA পাওয়ার কানেক্টর

২০/২৪ পিন মাদারবোর্ড পাওয়ার কানেক্টর

২০/২৪ পিন মাদারবোর্ড পাওয়ার কানেক্টরটি মাদারবোর্ডে সংযোগ দেয়া হয়। কোন কোন মাদার বোর্ডে ২০ পিনের পাওয়ার কানেক্টর ব্যবহার করা হয়। আবার কোন মাদারবোর্ডে ২৪ পিন ব্যবহার করা হয়। ছবিতে তোমরা ২৪ পিন একত্রে দেখতে পাচ্ছ। যখন ২০ পিন ব্যবহার করবে তখন ৪ পিনের কানেক্টরটি খুলে ফেলবে। এ কানেক্টরে ± ৩, ± ৫ ও ± ১২ ভোল্ট ব্যবহার করা হয়।

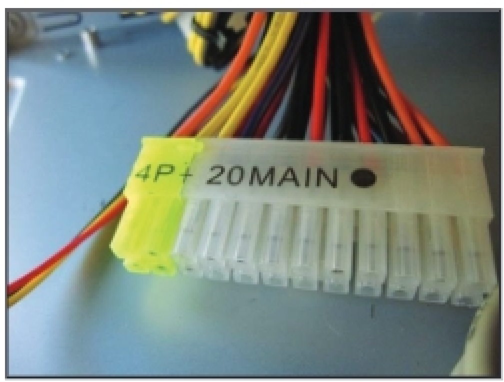

চিত্র: ৩.২৭ ২০/২৪পিন মাদারবোর্ড পাওয়ার কানেক্টর

৬ পিন PCIe (PCI Express expansion cards)পাওয়ার কানেক্টর

কম্পিউটারে এক্সট্রা PCI Express Expansion Cards সংযোগ করলে ৬ পিন PCIe Power Connector পাওয়ার কানেক্টরটি পিসিআই এক্সপ্রেস এক্সপানশন কার্ডের সাথে সংযোগ করা হয়। এটিকে পিসিআই এক্সপ্রেস ক্যাবলও

বলে। আবার এটিকে পিইজি (PEG-PCI Express Graphics)নামেও ডাকা হয়। এটি ৬ পিন বিশিস্ট একটি পাওয়ার কানেক্টর ও এটি ১২ ভোল্ট ব্যবহার করে।

৮ পিন PCIe (PCI Express expansion cards)পাওয়ার কানেক্টর

কোন কোন এক্সট্রা PCI Express Expansion Cards এ ৮ পিনের পাওয়ার কানেক্টর থাকে তখন ৬ পিনের কান্টের লাগানো যায় না। এ জন্য ৮ পিন PCIe (PCI Express expansion cards)পাওয়ার কানেক্টর ব্যবহার করা হয়। ৬ পিন ও ৮পিন উভয়ই পিসিআই এক্সপ্রেস কার্ডের সাথে সংযোগ হলেও এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো ০৬ পিনের পাওয়ার কানেক্টর ৭৫ ওয়াট সরবরাহ করে পক্ষান্তরে ৮ পিনের কানেক্টরটি ১৫০ ওয়াট সরবরাহ করে। এটি ৮ পিন বিশিষ্ট একটি পাওয়া কানেক্টর ও ১২ ভোল্টে কাজ করে।

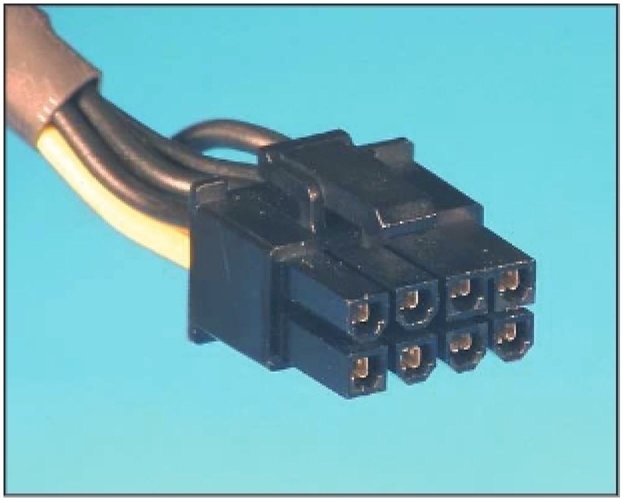

চিত্র ৩.২৮: ৮ পিন PCIeপাওয়ার কানেক্টর

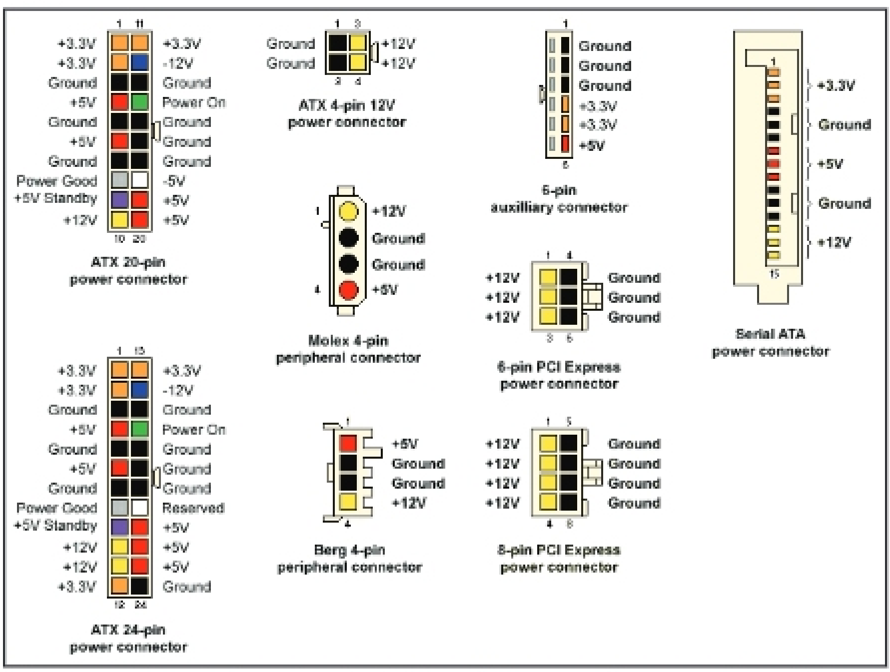

চিত্র:৩.২৯ মাদারবোর্ডের ও পাওয়ার সাপ্লাই এর বিভিন্ন কানেকটর সমুহের পিন ও সিগন্যাল।

ট) ডাটা ক্যাবল (Data Cable)

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) Cable: SATA (Serial Advanced Technology Attachment) Cable৭ **পিন বিশিষ্ট একটি ডাটা ক্যাবল। এটির এক প্রান্ত** SATA পোর্টের হার্ড ডিস্কের সাথে ও অপর প্রান্ত মাদারবোর্ডের SATA পোর্টে এবং অপটিক্যাল ড্রাইভের ক্ষেত্রে এক পান্ত SATA পোর্টের অপটিক্যাল ড্রাইভে ও অন্য প্রান্ত মাদার বোর্ডের SATA পোর্টে সংযোগ করা হয়।

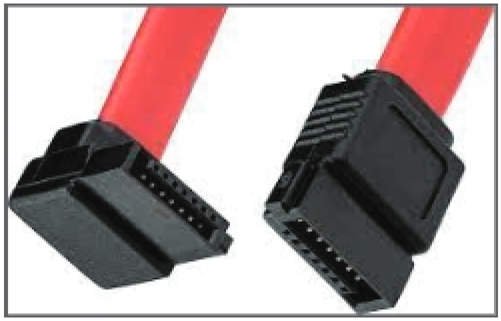

চিত্র ৩.৩০: SATA ক্যাবল

PATA (Parallel Advanced Technology Attachment) /IDE (Integrated Device Electronics) Cable: PATA /IDE Cable৪০ (চল্লিশ) **পিন বিশিষ্ট একটি বাস ক্যাবল। এটির এক প্রান্ত** PATA /IDE পোর্টের হার্ড ডিস্কের সাথে ও অপর প্রান্ত মাদারবোর্ডের PATA /IDE পোর্টে এবং অপটিক্যাল ড্রাইভের ক্ষেত্রে এক পান্ত PATA /IDE পোর্টের অপটিক্যাল ড্রাইভে ও অন্য প্রান্ত মাদার বোর্ডের PATA /IDE পোর্টে সংযোগ করা হয়। একটি ক্যাবলে দুটি ড্রাইভ যেমন দুটি হার্ড ডিস্ক অথবা একটি হার্ড ডিস্ক ও একটি অপটিক্যাল ড্রাইভ অথবা দুটি অপটিক্যাল ড্রাইভ সংযোগ দেয়া যায়।

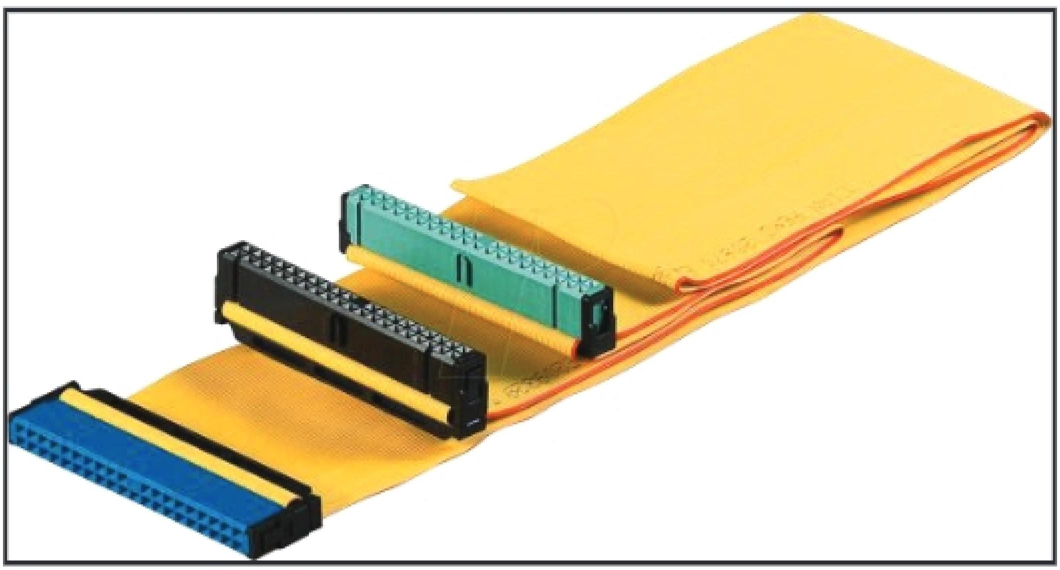

চিত্র ৩.৩১: PATA /IDE ক্যাবল

ঠ) কেসিং (Casing)

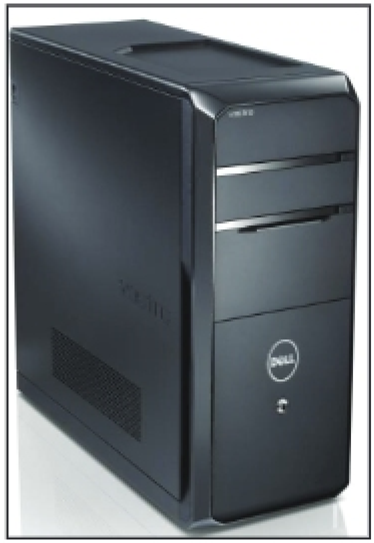

চিত্র ৩.৩২ : মাদারবোর্ডের কেসিং

কম্পিউটারের যন্ত্রাংশসমূহ যেমন– মাদারবোর্ড,হার্ড ডিস্ক, অপটিক্যাল ড্রাইভ ইত্যাদি সুরক্ষার জন্য আমারা সাধারণত একটি স্টিলের বাক্স ব্যবহার করি। ফলে আমাদের কম্পিউটার পোকা মাকড়, পানি পড়া, ধুলাবালি ইত্যাদি থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং কেসিং হলো একটি বাক্স যেখানে কমিপউটারের যন্ত্রাশসমূহ নিরাপদে রাখা হয়। কেসিং এর সাথে সাধারণত একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকে। পাওয়ার সাপ্লাই অনুসারে কেসিং এর নামকরণ করা হয়। যেমন– এটিএক্স (ATX-Extended Technology) কেসিং, এটি কেসিং (AT-Advanced Technology) ইত্যাদি। অনেকসময় সাইজ অনুযায়ী কেসিং এর নামকরণ করা হয়। যেমন–টাওয়ার কেসিং, মিনি টাওয়ার কেসিং ইত্যাদি।

কেসিং এর প্রধান অংশসমূহ–

পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট

চিত্র ৩.৩৩: ২২০ ভোল্ট পাওয়ার সকেট

কেসিং একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থাকে। যেটি মাদারবোর্ডসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশসমূহে পাওয়ার সরবারহ করে। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ইনপুট অংশ যেখানে আমারা ২২০ ভোল্টের পাওয়ার ক্যাবল সংযোগ করি সে পাওয়ার সকেটটি বাইরের দিকে থাকে।

ব্যাক প্যানেল

ব্যাক প্যানেল কেসিং এর পিছনে থাকে। এ প্যানেলে মাদারবোর্ডেল পোর্টের উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো খাঁজ কাটা জানলালার মতো ফাঁকা অংশ থাকে যাতে করে মাদারবোর্ডে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের পোর্টগুলো যেমন–ইউএসবি পোর্ট, ভিজিএ পোর্ট, আরজে-৪৫ পোর্ট, সাউন্ড পোর্ট ইত্যাদি কেসিং এর বাইরে থাকে। যাতে করে ফেরিফেরাসগুলো সহজে সংযোগ করা যায়।

চিত্র ৩.৩৪:ব্যাক প্যানেল

ড) ডেস্কটপ কম্পিউটারে ব্যবহৃত অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশসমূহ

ফ্রন্ট ইউএসবি/সাউন্ড পোর্ট

কেসিং এর সামনের দিকে ইউএসবি পোর্ট ও সাউন্ড পোর্ট থাকে। ফলে কেসিং এর সামনের দিকের অডিও পোর্টে হেড ফোন ও মাইক্রো ফোন ব্যবহার করা যায়। সামনের দিকের ইউএসবি পোর্টে সবধরণের ইউএসবি ডিভাইস ব্যবহার করা যায়।

চিত্র ৩.৩৫:ফ্রন্ট ইউএসবি/সাউন্ড সেট

হার্ড ডিক্স এলইডি(LED-Light Emiting Diode)

LED মূলত একটি ছোট আকারের বাতি। হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করার সময় যখন হার্ড ডিস্ক বেশি ব্যস্ত থাকে তখন এ LED টি জ্বলে। এ টি কেসিং এর সামনে থাকে। এটির লাল রঙের হয়।

পাওয়ার এলইডি (LED)

কম্পিউটার চালু বা বন্ধ আছে কিনা সেটা এ এলইডি টি জ্বলার মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়। এটি সাদা বা সবুজ রঙের হয়।

অপটিক্যাল ড্রাইভ বে(Bay)

এ অংশে অপটিক্যাল ড্রাইভ বসানো হয় এবং অপটিক্যাল ড্রাইভটি স্ক্রুদিয়ে কেসিং এর সাথে আটকানো থাকে।

হার্ড ড্রাইভ বে(Bay)

এ অংশে হার্ড ডিস্ক বসানো হয়। হার্ড ডিস্ককে স্ক্রু দিয়ে কেসিং এর সাথে আকাতে হয়।

এছাড়া এক্সটারনাল বিভিন্ন ধরেনর এক্সপানশন কার্ড, যেমন– গ্রাফিক্স কার্ড, সাউন্ড কার্ড, মডেম ইত্যাদি কেসিং এর সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকানোর ব্যবস্থা থাকে। কেসিং এ মাদারবোর্ড, হার্ড ডিক্স, অপটিক্যাল ড্রাইভ ও অন্যান্য যন্ত্রায়শসমূহ লাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের স্ক্রু প্রয়োজন হয়। সব ধরণের স্ক্রু সব ডিভাইসে ব্যবহার করা যায় না। নিম্নে কেসিং এ ব্যবহৃত কয়েকটি স্ক্রুর বর্ণনা দেয়া হলো–

অন সুইচ

অন সুইচ কেসিং এর সামনে থাকে যে সুইচের মাধ্যমে একবার চাপ চিয়ে কম্পিউটার চালু করা হয়।

রিসেট সুইচ

কম্পিউটার চলতে চলতে অনেক সময় হ্যাং করে। হ্যাং করলে কম্পিউটার ক্লিক করে বন্ধ করা যায় না। তখন রিসেট সুইচ এর মাধ্যমে কম্পিউটার বন্ধ করতে হয়। কিছু কিছু কেসিং এ রিসেট সুইচ আলাদা থাকে। আবার কোন কোন কেসিংএ রিসেট সুইচ ও অন সুইচ একটাই থাকে। সেক্ষেত্রে রিসেট করার জন্য অন সুইচ কয়েক সেকেন্ড চেপে ধরলে কম্পিউটার রিসেট হয়।

২০২৪

মেমোরি রিডার স্লট

কিছু কিছু কেস এর ফ্রন্ট এ মেমোরি কার্ড রিডার থাকে যেখানে বিভিন্ন ধরনের মেমোরি কার্ড ইনসার্ট করে ব্যবহার করা হয়। যেমন– MS (Memory Stick) Card, SD (Secure Digital) /Mini, MMC (Multimedia Card) /RS (Redused Size), CF (CompactFlash)/MD, MS/pro, Duo ইত্যাদি।

চিত্র৩.৩৬ 6-32 thumbscrew

কেসিং এ ব্যবহৃত স্ক্রুসমূহ

6-32 thumbscrew

6-32 thumbscrew স্ক্রু কেসিং এর কভার এ বাইরের দিকে লাগানো হয়। সাধারণত পিছনের দিকে ০৪ টি স্ক্রু লাগাতে হয়।

6-32 UNC screw

এ স্ক্রুটি হার্ড ড্রাইভ ও অপটিক্যাল ড্রাইভ কেসিং এর সাথে আটকানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ৩.৩৭: 6-32 screw

এমং স্ক্রু (M2 screw)

এ স্ক্রু মাদারবোর্ডকে কেসিংএ সেট করা স্ট্যান্ড অফ স্ক্রুর সাথে লাগানো হয়। যাতে মাদারবোর্ড শক্ত করে কেসিং এর সাথে আটকে থাকে।

চিত্র ৩.৩৮ : এমং স্ক্রু

স্ট্যান্ড অফ স্ক্রু

স্ট্যান্ড অফ স্ক্রু মাদারবোর্ডের বেজ এ সরাসরি লাগানো হয়। মূলত মাদারবোর্ড এ স্ট্যান্ড অব স্ক্রুর উপর বসে।

চিত্র ৩.৩৯: স্ট্যান্ড অফ স্ক্রু

ঢ) এক্সপানশন কার্ড/এডাপ্টারসমূহের তালিকা ও বৈশিষ্ট্য

এক্সপানশন কার্ডের তালিকা

- গ্রাফিক্স কার্ড
- এনআইসি (NIC-Network Interface Card) কার্ড
- ওয়্যারলেস (Wireless) কার্ড
- মিনি ওয়্যারলেস কার্ড
- সাউন্ড কার্ড

বিভিন্ন প্রকার এক্সপানশন কার্ডের বর্ণনা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

গ্রাফিক্স কার্ড

কম্পিউটারের প্রসেসকৃত ফলাফল মনিটরে প্রদর্শনের জন্য গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করা হয়। এটির একটি ফ্যাক্টর হলো ধারণ ক্ষমতা যার একক হলো এমবি ও রেজুলেশন যার একক হলো পিক্সেল। বিভিন্ন ধরণের গ্রাফিক্স কার্ড কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়। যেমন–ভিজিএ (VGA-Video Graphics Adapter), এজিপি (AGP-Acclerated Graphics Port), পিসিআইএক্সপ্রেস (Peripharal Component Interconnect Express), পিসিআইএক্সপ্রেস-২ ইত্যাদি। গ্রাফিক্স কার্ডে আউপপুটে মনিটর অথবা প্রজেক্টর সংযোগ করা হয়। প্রত্যেকটি গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর জন্য মাদার বোর্ডে আলাদা আলাদা স্লট রয়েছে। তোমার মাদার বোর্ডে যে কোন একধরণের গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে পারবে। কিছু কিছু গ্রাফিক্স কার্ডে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই সরবরাহ করাতে হয়। প্রতিটি কার্ডের আউপুট পোর্ট আবার ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন নামে থাকে। যেমন–এজিপি (AGP) পোর্ট, ভিজিএ পোর্ট (VGA), ডিভিআই (DVI-Digital Video Interface) পোর্ট, এইচডিএমআই (HDMI-High Definition Multimedia Interface) পোর্ট ইত্যাদি।

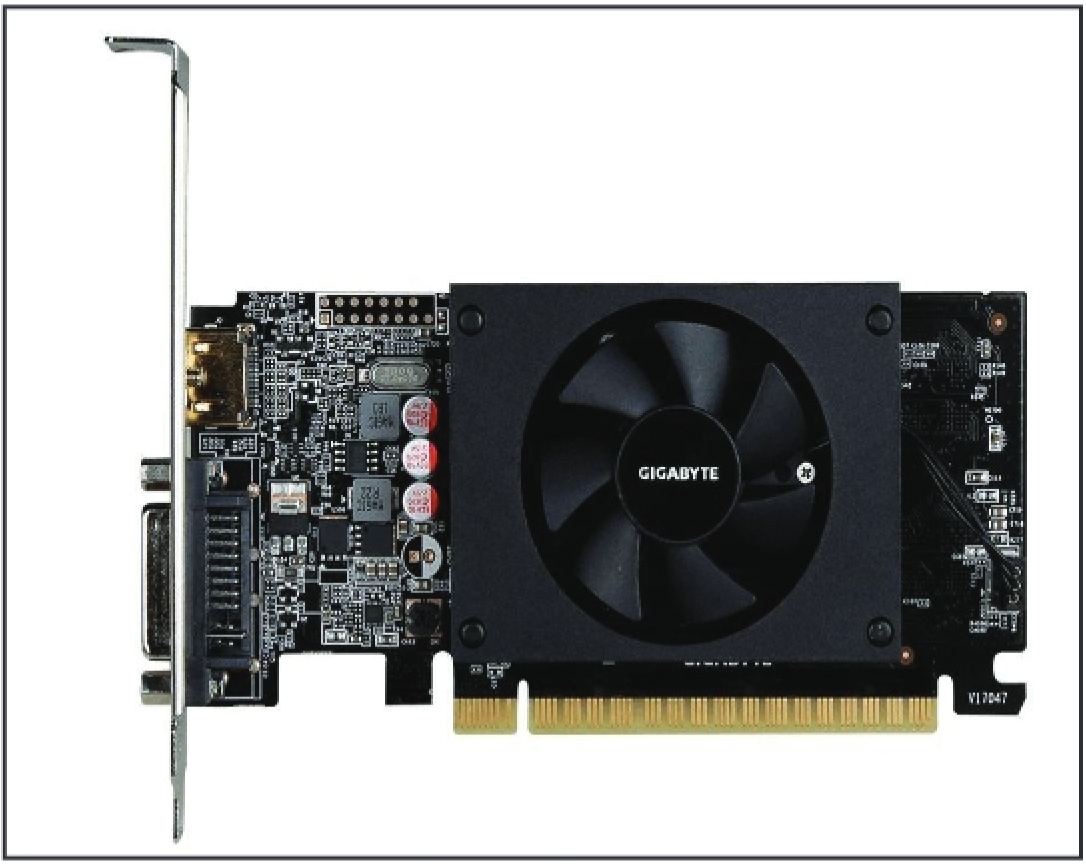

চিত্র ৩.৪০: গ্রাফিক্স কার্ড

এনআইসি (NIC-Network Interface Card) কার্ড

এনআইসি কার্ড কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কের আওতায়ে আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ কার্ডের আউটপুটে আরজে -৪৫ (RJ-Registard Jack-45) একটি পোর্ট থাকে। এ পোর্টে কানেক্টরের মাধ্যমে ইউটিপি (UTP-Unshelded Twisted Pair) ক্যাবলের সাথে সংযোগ স্থাপন করে কম্পিউটারকে নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। এ কার্ডটি পিসিআই স্লটে বসাতে হয়। একের অধিক এনআইসি কার্ড একত্রে সংযোগ করা যায়।

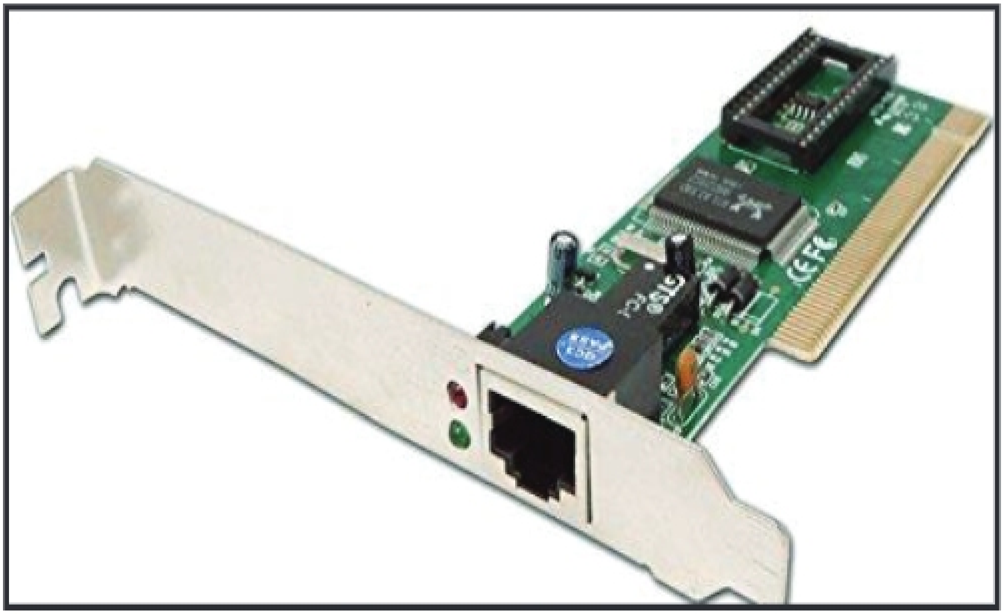

চিত্র ৩.৪১: এনআইসি কার্ড

ওয়্যারলেস (Wireless) কার্ড

ওয়ারলেস কার্ড কম্পিউটারকে ওয়্যারলেস (WiFi) নেটওয়ার্কের আওতায়ে আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। কোন বাধা না থাকলে এটি ৫০ মিটার পর্যন্ত সিগন্যাল আদান প্রদান করতে পারে। এটি পিসিআই স্লটে সংযোগ করা হয়। এ কার্ডে দুটি অ্যান্টিনা থাকে। এ কার্ডটি শুধুমাত্র ডেক্সটপ কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়।

মিনি ওয়্যারলেস কার্ড

মিনি ওয়ারলেস কার্ড কম্পিউটারকে ওয়্যারলেস (WiFi) নেটওয়ার্কের আওতায়ে আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। কোন বাধা না থাকলে এটি ৫০ মিটার পর্যন্ত সিগন্যাল আদান প্রদান করতে পারে। এটি মিনি পিসিআই স্লটে সংযোগ করা হয়। এ কার্ডে দুটি ক্যাবল বডির সাথে সংযোগ থাকে যেগুলি অ্যান্টিনা হিসেবে কাজ করে। । এ কার্ডটি শুধুমাত্র ডেক্সটপ কম্পিউটার ও ল্যাপটপ উভয়েই ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ৩.৪১: মিনি ওয়্যারলেস (Wireless)কার্ড

সাউন্ড কার্ড

সাউন্ড কার্ড মূলত ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালকে সাউন্ড সিগন্যালে রূপান্তর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। সাউন্ড কার্ডে স্পিকারের অডিও ইনপুট পোর্ট ও মাইক্রো ফোনের আউটপুট পোর্ট সাইন্ড কার্ডের যথাক্রমে স্পিকার আউট ও অডিও ইন পোর্টের সাথে সংযোগ করা হয়। যার ফলে আমারা কম্পিউটারে অডিও শুনতে পারি ও আমাদের কথা রেকর্ড অথবা অডিও /ভিডিও চ্যাটিং এর সময় কথা শুনতে পারি ও বলতে পারি।

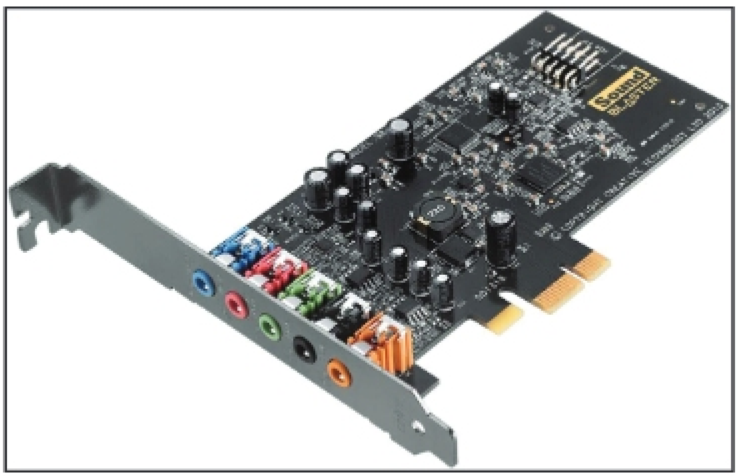

চিত্র ৩.৪২: সাউন্ডকার্ড

গ) কম্পিউটারে ব্যবহৃত ইনপুট/আউট ডিভাইস সমূহ

চিত্র ৩.৪৩: ওয়্যারলেস কী-বোর্ড

ইনপুট ডিভাইসের তালিকা:

- কী-বোর্ড
- মাউস
- মাইক্রোফোন

নিম্নে ইনপুট ডিভাইসসমূহের বর্ণনা দেয়া হলো–

- কীবোর্ড

কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইসগুলোর মধ্যে কীবোর্ড অন্যতম। কী-বোর্ডের মধ্যে বর্ণ, সংখ্যা, বিশেষ চিহ্নের বিভিন্ন কীগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। বর্তমানে প্রচলিত কী-বোর্ডগুলোতে ১০১টি, ১০২টি, ১০৪টি অথবা সর্বোচ্চ ১২৫ কী থাকে। ইংরেজী বর্ণ ও সংখ্যা এবং বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত কীগুলো সাধারণ টাইপরাইটারের মতো এবং বিণ্যাস বা সাজানোও একই রকম। টাইপরাইটারে কীবোর্ডের কীগুলো শুধু অক্ষর টাইপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, কম্পিউটারের কী-বোর্ডের কীগুলোর সাহায্যে টাইপ করা ছাড়াও কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় সব ধরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। কী-বোর্ড প্রায় সব কম্পিউটারেই থাকে। পোর্টভেদে কীবোর্ড তিন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন–সিরিয়াল পোর্টেল কী-বোর্ড, পিএস/২ পোর্টের কী বোর্ড ও ইউএসবি পোর্টের কী-বোর্ড। এ ছাড়া আরও একধরনের কী বোর্ড আছে যে কী-বোর্ডটি কম্পিউটারের ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ না দিয়েও কাজ করা যায়। সেটিকে আমারা ওয়্যারলেস কী-বোর্ড বলি।

- মাউস

চিত্র ৩.৪৪ : ওয়্যারলেস মাউস

চিকন লম্বা তার দিয়ে কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত ইঁদুর সদৃশ ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ যা দিয়ে কম্পিউটারের ইনপুট কমান্ড দেয়া হয় সেটিই মাউস। এটি একটি জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস। মাউস সমতলের উপর নাড়ালে মনিটরের পর্দায় মাউস পয়েন্টার নড়াচড়া করতে দেখা যায়। মাউস নড়াচড়া করে ইচ্ছেমতো পয়েন্টারকে দ্রুত স্থানান্তর করে কমান্ড অপশন অথবা আইকনের উপর নিয়ে মাউসের বাম বোতাম চেপে ক্লিক করে কম্পিউটারকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া মাউসের সাহায্যে পর্দায় লিখিত বিষয়, গ্রাফ ছবি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রনসহ আরো নান প্রকার কাজ করা যায়। পোর্টের উপর ভিত্তি করে মাউসকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–সিরিয়াল পোর্টের মাউস, পিএস/২ পোর্টের মাউস ও ইউএসবি পোর্টের মাউস। এ ছাড়া আরও একধরনের মাউস আছে যে মাউসটি কম্পিউটারের ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ না দিয়েও কাজ করা যায়। সেটিকে আমারা ওয়্যারলেস মাউস বলি।

- মাইক্রোফোন: পঞ্চম অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

আউটপুট ডিভাইস ও তাদের ফাংশন:

আউটপুট ডিভাইসের তালিকা:

- প্রিন্টার
- মনিটর
- প্রজেক্টর
- স্পিকার

নিম্নে আউটপুট ডিভাইসের বর্ণনা দেয়া হলো–

- প্রিন্টার

কম্পিউটারের তথ্যকে হার্ডকপিতে রূপান্তর করার জন্য প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। প্রিন্টারের অভ্যন্তরীণ গঠন অনুযায়ী প্রিন্টার নানান ধরণের হয়ে থাকে। যেমন-ডট মেট্রিক্স পিন্টার, ইঙ্কজেট প্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার, কালার লেজার প্রিন্টার ইত্যাদি। কখনও কখনও কত বড় সাইজের কাগজে প্রিন্ট করতে পারে সেটির উপর ভিত্তি করেও প্রিন্টারের নামকরণ করা হয়। যেমন–এ৪ (কাগজের

চিত্র ৩.৪৫: প্রিন্টার

সাইজ প্রস্থ ৮.২৭ ইঞ্চি, উচ্চতা ১১.৬৯) সাইজ প্রিন্টার, এ৩ (কাগজের সাইজ প্রস্থ ১১.৬৯ ইঞ্চি, উচ্চতা ১৬.৫৪) সাইজ প্রিন্টার ইত্যাদি। প্রিন্টার ক্যাবলের পোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রিন্টারকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–প্যারালাল পোর্টেল প্রিন্টার, ইউএসবি পোর্টের প্রিন্টার ইত্যাদি। বর্তমানে ওয়াইফাই প্রিন্টারও আছে এ প্রিন্টারে সরাসরি তারের মাধ্যমে কম্পিউটারে সংযোগ দেয়ার প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রিন্ট হয়।নেটওয়ার্কটি লোকাল অথবা ইন্টারন্যাশনাল হতে পারে।

মনিটর

মনিটর কম্পিটারের একটি আউটপুট ডিভাইস। কম্পিটারের সমাধানকৃত ফলাফল মনিটরে আমাদের বোধগম্য ভাষায় অথবা বোধগম্য চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করে। মনিটর বিভিন্ন সাইজের যেমন– ১৯ ইঞ্চি, ২০ ইঞ্চি, ২১ ইঞ্চি ২৪ ইঞ্চি ইত্যাদি সাইজের হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন রেজুলেশনের যেমন– ১২৮০ × ১০২৪ পিক্সেল, ১৬০০ × ১২০০ পিক্সেল, ১৬৮০ × ১০৫০ পিক্সেল, ১৯২০ × ১২০০ পিক্সেল ইত্যাদি পিক্সেলের হয়। কম্পিউটারের সাথে মনিটর সংযোগ ক্যাবল বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন-ভিজিএ ক্যাবল, ডিভিআই ক্যাবল ও এইচডিএমআই ক্যাবল।

চিত্র ৩.৪৬: মনিটর

প্রজেক্টর

প্রজেক্টর কম্পিটারের একটি আউটপুট ডিভাইস। কম্পিটারের সমাধানকৃত ফলাফল প্রজেক্টর বড় পর্দায় (প্রজেক্টর স্ক্রীণ) আমাদের বোধগম্য ভাষায় অথবা বোধগম্য চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করে। প্রজেক্টর বিভিন্ন রেজুলেশনের যেমন– ১২৮০ × ১০২৪ পিক্সেল, ১৬০০ × ১২০০ পিক্সেল, ১৬৮০ × ১০৫০ পিক্সেল, ১৯২০ × ১২০০ পিক্সেল ইত্যাদি পিক্সেলের হয় । কম্পিউটারের সাথে প্রজেক্টর সংযোগ ক্যাবল বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন-ভিজিএ ক্যাবল, ডিভিআই ক্যাবল ও এইচডিএমআই ক্যাবল। এটি সাধারণত সিলিং এ হ্যাং করে রাখা হয় এবং প্রজেকশন বড় পর্দায় ফেলা হয়। ফলে একই ক্লাশে অথবা হল রুমে থাকা ছাত্র-ছাত্রী অথবা দর্শক প্রায় ৪০ ফুট পিছন থেকে কম্পিউটারের স্ক্রিণ দেখতে পারে।

চিত্র ৩.৪৭: প্রজেক্টর

৩.২ কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং পদ্ধতি ও কৌশল:

অ্যাসেম্বলিং এর পূর্বে যথাযথ নিয়ম ও সেফটি মেনে শারীরিক ও মানুষিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কাজ শুরু করার পূর্বে প্রয়োজনীয় টুলস এর তালিকা তৈরি করবে ও সংগ্রহ করবে। একটি কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং এর জন্য মালামাল/ যন্ত্রাংশসমূহ / কম্পোনেন্ট সমূহ স্টোর থেকে সংগ্রহ করে যে টেবিলে অ্যাসেম্বল হবে সেখানে ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে কাজ শুরু করবে।

কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং এ প্রয়োজনীয় টুলস ও ইকুইপমেন্ট এর তালিকা ও প্রকারভেদ:

প্রয়োজনীয় টুলস:

কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং এর জন্য কিছু টুলস

টুলসের নাম	ছবি	কাজ
স্টার স্ক্রু ড্রাইভার		স্টার স্ক্রু লাগানো ও খোলার জন্য ব্যবহার করা হয়।
ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার		ফ্ল্যাট স্ক্রু লাগানো ও খোলার জন্য ব্যবহার করা হয়।
প্লায়ার্স		কেসিং এর বেজ এ স্ট্যান্ড অফ স্ক্রু লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
চিমটা		স্ক্রুকে ধরে বসানোর জন্য অথবা মাদার বোর্ডের বেজ এ কোন স্ক্রু পড়ে গেলে সেটি তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়।

২০২৪

ইকুইপমেন্ট/কম্পোনেন্ট ও মেটারিয়ালস:

মাদারবোর্ড, প্রসেসর, কুলিং ফ্যান, র‍্যাম, হার্ডডিস্ক, অপটিক্যাল ড্রাইভ, মিনি ওয়্যারলেস কার্ড, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, কেস, কীবোর্ড, মনিটর, মাউস, সাটা ক্যাবল, হিট সিঙ্ক, সুপার গ্লু, স্ট্যান্ড অফ স্ক্রু, এম ৩ স্ক্রু, 6-32 UNC স্ক্রু, গ্রাফিক্স কার্ড ইত্যাদি।

কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং এর ধাপসমূহ:

অ্যাসেম্বলিং কে প্রধান কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়।

ধাপ-১: মাদারবোর্ডে প্রসেসর, র‍্যাম, কুলিং ফ্যান, মিনি ওয়্যারলেস কার্ড ও অ্যান্টিনা ক্যাবল সংযোগ করা।

ধাপ ২: স্ট্যান্ড অফ স্ক্রু বসানোর পর মাদারবোর্ড কেসে বসানো।

ধাপ ৩: হার্ড ডিস্ক ও অপটিক্যাল ড্রাইভ কেস এ বাসানো।

ধাপ ৪ : পাওয়ার সাপ্লাই কেস এ বসানো।

ধাপ ৫: সকল প্রকার ক্যাবল সংযোগ দেয়া।

ধাপ ৬: বিভিন্ন ধরনের কার্ড সংযোগ করা।

ধাপ ৭: কভার বন্ধ করা ও স্ক্রু দিয়ে আটকানো।

ধাপ ৮: কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার সংযোগ করা।

পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটকে কেসিং এর মধ্যে স্থাপনের সতর্কতা ও পদ্ধতি:

পাওয়ার সাপ্লাই বসানোর সময় খেয়াল কর যেন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের লেভেলটি উপরের দিকে থাকে এবং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে সকেটে পাওয়ার ক্যাবল লাগানো হয় সেটি যেন বাইরের দিকে থাকে। স্ক্রুগুলো সঠিক ভাবে লাগাতে হবে।

মাদারবোর্ড ও মাদারবোর্ডর পার্টস ও কম্পোনেন্টসমূহ:

মাদারবোর্ড মূলত বিভিন্ন ধরণের ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের আইসি (IC-Integrated Circuit) মাদার বোর্ডে এমবেডেড (Embeded) করা থাকে।

এন্টি-স্ট্যাটিক রিস্ট ব্যান্ড বা গ্লোভসের প্রয়োজনীয়তা:

কম্পিউটারে কাজ করার জন্য নিজেকে ইলেকট্রিক সক থেকে সুরক্ষা করা সহ কম্পিউটারে ব্যবহৃত কম্পোনেন্টগুলো পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এন্টি স্ট্যাটিক রিস্ট ব্যান্ড বা গ্লোভসের ব্যবহার করা হয়।

মাদারবোর্ডের পার্টস ও ইন্টারফেসসমুহের পরিচিতিঃ

মাদার বোর্ডে যেসকল পার্টস ব্যবহার করা হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– ১। রেজিস্টর ২। ক্যাপাসিটর ৩। ইন্ডাক্টর ৪। ট্রান্সফরমার ৫। আই সি ৬। মেমোরি চিপ ৭। ডায়োড ৮। সি মস (CMOS) ব্যাটারি ৯। বিভিন্ন ধরণে জাম্পার ১০। রম (ROM) চিপ।

একটি মাদার বোর্ডের দুটি ইন্টারফেস থাকে।

- সাউথ ব্রিজ (South Bridge) ও
- নর্থ ব্রিজ (North Bridge)

সাউথ ব্রিজঃ সাউথ ব্রিজ ইন্টেলের একটি চিপসেট যেটি ইনপুট/আউটপুট সিস্টেম যেমন ইউএসবি বাস, সিরিয়াল পোর্ট, অডিও, আইডিই, আইএসএ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত হয়।

নর্থ ব্রিজঃ নর্থ ব্রিজের আওতাও যে সকল ইন্টারফেস পরিচালিত হয় তা হলো– প্রসেসর, মেমোরি, পেরিফেরাল কম্পোনেন্ট, পিসিআই বাস, লেভেল ২ ক্যাশ, গ্রাফিক্স পোর্ট ইত্যাদি

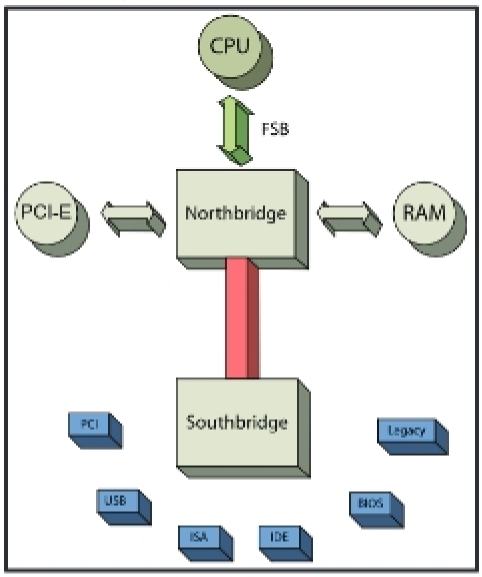

চিত্র ৩.৪৮: সাউথ ব্রিজ ও নর্থ ব্রিজ

প্রসেসর ও হিটসিংকসহ কুলিং ফ্যান সেট করার সতর্কতা, পদ্ধতি ও কৌশলঃ

প্রসেসরকে ঠান্ডা রাখার জন্য হিটসিংকসহ কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা হয়। হিটসিংক তাপ পরিবাহী একটি একটি মেটালের বার যা ফ্যানের নীচে ও প্রসেসরের উপরে থাকে। প্রসেসর যখন অতিরিক্ত গরম হয় তাখন তাপ হিট সিংক এ পরিবাহিত হয়। হিটসিংক এর উপরে ফ্যান থাকায় হিটসিংকটি ঠান্ডা হয়ে যায়। এভাবে কুলিং ফ্যান

২০২৪

প্রসেসরকে ঠান্ডা রাখে। কুলিং ফ্যান লাগানোর জন্য সতর্ক থাকতে হবে যেন হিট সিংক এর নীচে এবং প্রসেসরের উপরে থার্মাল গ্লু ব্যবহার করা হয়। কুলিং ফ্যান লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হয়ে কোন অবস্থাতেই যেন ফ্যানটি লুজ না থাকে এবং শক্ত করে মাদার বোর্ডের সাথে স্ক্রু দিয়ে লাগানো থাকে। সাধারণত কুলিং ফ্যানে ৪ টি স্ক্রু থাকে এবং মাদার বোর্ডে ৪টি স্ক্রু হোল থাকে। মাদার বোর্ডে প্রসেসরের উপরে ৪টি স্ক্রু হোল বরাবর কুলিং ফ্যানটিকে সাবধানে হোল বরাবর বসিয়ে স্ক্রু টাইট দিতে হয়।

র‍্যাম স্লটের প্রকারভেদ

মাদার বোর্ডের ফরম ফ্যাক্টর অনুযায়ী র‍্যামে স্লট ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

র‍্যামকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়

- সিম (SIMM-Single Inline Memory Module) স্লট
- ডিম (DIMM-Double Inline Memory Module) স্লট

ডিম র‍্যাম দুভাগে ভাগ করা যায়।

- এস (S-Static) স্লট
- ডি (D-Dynamic) স্লট

ডি র‍্যামকে চারভাগে ভাগ করা যায় (স্লট অনুসারে)

- ডিডিআর (DDR-Double Data Rate) -১ স্লট
- ডিডিআর (DDR-Double Data Rate) -২ স্লট
- ডিডিআর (DDR-Double Data Rate) -৩ স্লট
- ডিডিআর (DDR-Double Data Rate) -৪ স্লট

র‍্যাম সেট করার কৌশল

র‍্যাম স্পর্শ করার পূর্বে অবশ্যই হাতে হ্যান্ড গ্লাবস্ পরে নিতে হবে। র‍্যামের গায়ে লেখা লেভেল দেখে অথবা খাঁজ দেখে কোন প্রকারের র‍্যাম সেটি জেনে নিতে হবে। এরপর মাদার বোর্ডের র‍্যাম স্লটটি কোন প্রকারের সেটি মাদার বোর্ডের ম্যানুয়াল দেখে অথবা খাঁজ দেখে চিনে নিতে হবে। এর পর র‍্যামের খাঁজের সাথে মাদার বোর্ডের র‍্যাম স্লটের খাঁজ বরাবর রেখে হালকাভাবে চাপ দিয়ে র‍্যামটি বসাতে হবে। র‍্যাম স্লটের দু পাশে দুটি লক থাকে লক দুটি সঠিকভাবে লাগল কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে।

এম.২ এক্সপানশন স্লটের কাজ

এম.২ এক্সপানশন স্লটে এসএসডি সংযোগ করা হয়।

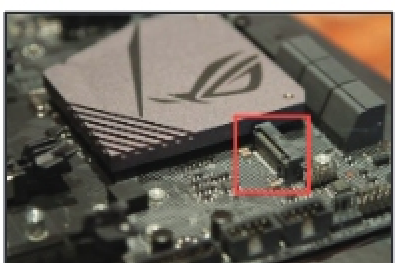

চিত্র ৩.৪৯.১: এম.২ স্লট

চিত্র ৩.৩৯.২: এসএসডি

মাদারবোর্ডে এসএসডি সেট করার কৌশল

মাদার বোর্ডে এসএসডি লাগানোর স্লট থাকে। এ স্লটে একটি খাঁজ থাকে। এসএসডিতেও একটি খাঁজ থাকে। মাদার বোর্ডের স্লটের খাঁজ যে দিকে থাকে এসএসডির খাঁজ সে বরাবরে রেখে এসএসটি সংযোগ করবে। এর পর এসএসডিটি একটি স্ক্রু দিয়ে মাদার বোর্ডের বোর্ডের সাথে লাগাতে হয়।

মাদারবোর্ডে এক্সপানশন কার্ড সংযোজনের কৌশল

মাদার বোর্ডে বিভিন্ন ধরণের এক্সপানশন কার্ড সংযোজন করা হয়। প্রত্যেকটি এক্সপানশন কার্ডের জন্য মাদার বোর্ডে আলাদা আলাদা স্লট থাকে। মাদার বোর্ডের সবগুলো এক্সপানশন স্লটের সাইজ, পিন সংখ্যা এবং খাঁজ সমান থাকে না। আবার এক্সপানশন কার্ডগুলোর সাইজ, পিন সংখ্যা ও খাঁজ সমান থাকে না। এজন্য এক্সপানশন কার্ডের সাইজ, পিন সংখ্যা, ও খাঁজ যে স্লটে ম্যাচিং হয় সাধারণত সে স্লটে এক্সপানশন কার্ড লাগানো হয়। এক্সপানশন কার্ডে সাধারণত একটি পোর্ট থাকে। মাদার বোর্ডে কার্ডসমূহ এমনভাবে লাগাতে হবে যেন পোর্টটি কেসিং এর বাইরের দিকে থাকে। এক্ষেত্রে মাদার বোর্ডের ম্যানুয়াল ও এক্সপানশন কার্ডের ম্যানুয়াল দেখে কার্ড লাগাতে হবে।

৩.৪ কেসিং এ মাদারবোর্ড ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সংযোজন

প্রথমে মাদারবোর্ডে প্রসেসর, র‍্যাম, কুলিং ফ্যান, মিনি ওয়্যারলেস কার্ড ও অ্যান্টিনা ক্যাবল সংযোগ করতে হয়। এর পর মাদার বোর্ড টি কেসিং এ বসাতে হয়। এক্সপানশন (Expansion) কার্ড বসানোর প্রয়োজন হলে কেস এ মাদারবোর্ডের স্লট বরাবর ফাঁকা জায়গায় বিভিন্ন ধরণের এক্সপানশন কার্ড বাসাতে হয় এবং কার্ডগুলি কেস এর সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকাতে হয়। যেমন-গ্রাফিক্স কাড, এনআইসি কার্ড, সাউন্ড কার্ড ইত্যাদি।

৩.৪.১ হার্ডডিক্স ও অপটিক্যাল ড্রাইভ কেসিং এ ইনস্টল করার পদ্ধতি

হার্ডডিস্ককে (Hard Disk) কেস (case) এর হার্ড ডিস্ক বে (bay) তে এবং অপটিক্যাল ড্রাইভকে অপটিক্যাল ড্রাইভ (Optical Drive) বে (bay) তে বসানো হয়। হার্ড ডিস্ক বসানোর পর স্ক্রু দিয়ে এটি কেস এর সাথে শক্ত করে লাগাতে হয়। হার্ড ডিস্ক বসানোর পরে এর সাথে দুটি ক্যাবল সংযোগ দিতে হয়। একটি সাটা (SATA) ক্যাবল ও অন্যটি সাটা পাওয়ার (Power) ক্যাবল। অপটিক্যাল ড্রাইভটি কেস এ এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে এর ফ্রন্ট সাইড কেস এর ফ্রন্ট সাইডের দিকে থাকে এবং কেস বরাবর ড্রাইভটি থাকে, ভিতরে এবং সামনে যেন কম বেশি না হয়। এর পর স্ক্রু দিয়ে বে'র সাথে আটকাতে হবে। অপটিক্যাল ড্রাইভের সাথে দুটি ক্যাবল সংযোগ করা হয় একটি সাটা ক্যাবল ও অন্যটি সাটা পাওয়ার ক্যাবল।

৩.৫ বায়োস কনফিগারেশন

বায়োস (BIOS-Basic Input Output System) একটি সিস্টেম প্রোগ্রাম। প্রতিটি কম্পিউটারে রোম চিপে বায়োস থাকে। রোম চিপটি সাধারণত মাদার বোর্ডে এমবেডেড থাক। বায়োসে বিভিন্ন ধরণের মেনু থাকে। এ সকল মেনুতে প্রবেশ করে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করাকে বায়োস কনফিগারেশন বলে।

বায়োস ও বায়োস সেটিং এর গুরুত্ব

কোন কম্পিউটারই বায়োস ছাড়া চালনা সম্ভব নয়। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার নিয়ে কাজ করার সময় আমাদের প্রয়োজনে বায়োস সেটিং করা প্রয়োজন হয়। অপারেটিং সিস্টেম চালু হওয়ার পূর্বে কম্পিউটারটি বিভিন্ন হার্ডওয়্যার সনাক্ত করতে পারল কিনা তা বায়োসে প্রবেশ করে নিশ্চিত হওয়া যায়। কখনও কখনও বুট ডিস্ক প্রাধান্যতা পরিবর্তন করে কাজ করতে হয়। যেমন– যখন পেন ড্রাইভ থেকে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করব তখন পেন ড্রাইভকে প্রথম ড্রাইভ হিসেবে প্রাধান্য দিতে হয়। এভাবে প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের সেটিং পরিবর্তন করে বায়োসের মাধ্যমে আমরা কাজ করে থাকি।

বায়োস এ পরিবর্তনীয় প্যারামিটারসমূহ

বায়োসে যে সকল প্যারামিটার রয়েছে এদের মধ্যে কিছু প্যারামিটার পরিবর্তন করা যায়। আবার কিছু প্যারামিটার পরিবর্তন করা যায় না। যেসকল প্যারামিটার পরিবর্তন করা যায় সেগুলো হল–

তারিখ ও সময়, বুট অর্ডার, পোর্ট এনাবল ও ডিসএ্যাবল ইত্যাদি।

বায়োস কনফিগারের সময় সতর্কতা

বায়োস কনফিগারের সময় এমন কোন পরিবর্তন করবে না, যেটি তোমার প্রয়োজন হবে না। না বুঝে কোন অপশন পরিবর্তন করবে না।

বায়োস সেভ ও বায়োস থেকে বের হওয়া

বায়োসে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার পর বায়োস সেভ করতে হয়। কম্পিউটার রিস্টার্ট হলেও এ পরিবর্তন ঠিক থাকে। বায়োস প্রোগ্রামে সেভ করার মেনু থাকে। সব সেটিং পরিবর্তন হলে বায়োস মেনু থেকে সেভ অপশনে যেয়ে **তা সেভ করে** বায়োস থেকে বের হতে হয়।

জব শিট

জব ১ : আধুনিক একটি ডেক্সটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন তৈরি করণ

জব ২: কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা;
- নিয়মনীতি মেনে মাদারবোর্ডে বিভিন্ন ডিভাইস ও সরঞ্জামাদি সেট করা।
- মাদার বোর্ডে যন্ত্রাংশ সেট করার পর স্ক্রু লাগানো;
- পাওয়ার ক্যাবল ও ডাটা ক্যাবল সংযোগ করা;
- হার্ড ড্রাইভ ও অপটিক্যাল ড্রাইভ সংযোগ করা;
- ফ্রন্ট প্যানেলের কানেকটরসমূহ সংযোগ করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অ্যাপ্রন	সাধারণ	০১ টি
০২	মাস্ক	সাধারণ	০১ টি
০৩	হ্যান্ড ওয়াশ/সাবান	সাধারণ	০১ টি
০৪	রাবারের স্যান্ডেল/জুতা	সাধারণ	০১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতি/ডিভাইস / নাম	যন্ত্রপাতি/ডিভাইস সমূহের বিবরন
১	কম্পিউটার কেস	

বিশেষ নির্দেশনা: শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীগন ব্যবহারিক ক্লাসের পুর্বেই যন্ত্রপাতি/ডিভাইসসমূহের স্পেসিফিকেশন তৈরি করবে। ২০২৪

২	**মাদরবোর্ড ও সংশ্লিষ্ট ডাটা ক্যাবলসমূহ**	
৩	**প্রসেসর ও কুলিং ফ্যান**	
৪	র‌্যাম	
৫	**হার্ডডিস্ক**	
৬	**এসএসডি**	
৭	**এনপানশন কার্ডসমূহ**	
৮	**কন্ট্রোল অ্যান্ড কানেকটর সমূহ**	

৯	পাওয়ার সাপ্লাই	
১০	কিবোর্ড	
১১	মনিটর/ডিসপ্লে	
১২	বিশেষ/অতিরিক্ত ডিভাইস	

সিস্টেম ইউনিট অ্যাসেম্বলিং এর ধাপসমূহ

ধাপ-১: প্রসসেরটিকে মাদারবোর্ডের সকেটে বসাও। বসানোর সময় খেয়াল কর মাদারবোর্ডের সকেটের খাঁজ যেদিকে আছে প্রসেসরের খাঁজও যেন সে দিকে থাকে। যেন খাপে খাপ মিলে যায়। প্রসেসর বসানোর পরে

প্রসেসর মাদার বোর্ডের সকেটে বসানো

লিভারটিকে চাপ দিয়ে বসিয়ে দাও।

ধাপ-২: হিট সিঙ্ক সহ কুলিং ফ্যানটিকে প্রসেসরের উপরে বসাও। বসানোর পূর্বে দেখে নাও হিট সিঙ্কের তলায় থার্মাল **গ্লু** আছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে থার্মাল **গ্লু** প্রসেসরের উপর এক ফোঁটা দিয়ে ফ্যান লাগাও ও **গ্লু** দিয়ে ফ্যানটিকে মাদারবোর্ডের সাথে **আটকিয়ে দাও।**

হিট সিঙ্কসহ কুলিং ফ্যান প্রসেসের উপর বসানো

ধাপ-৩: র‍্যাম স্লটে র‍্যাম **বসাও** । র‍্যাম **বসানোর** সময় দেখে নাও মাদার বোর্ডের র‍্যাম **স্লটের** খাঁজ এবং র‍্যামের খাঁজ **যেন মিলে যায়।**

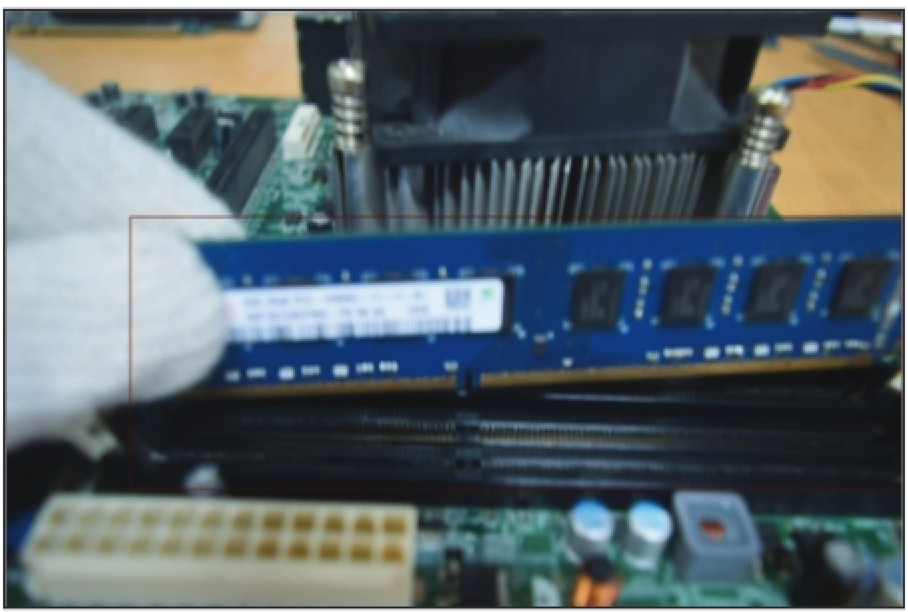

র‍্যাম স্লটে র‍্যাম বসানো

মাদার বোর্ডের খাঁজ বরাবর র‍্যা**মের** খাঁজ মিলিয়ে হালকা ভাবে একটু চাপ দাও।দেখবে র‍্যামের লিভারটি লেগে গেছে। এ সময় কট করে হালকা একটা শব্দ শুনবে।

ধাপ-৪: মাদার বোর্ডে মিনি এনআইসি কার্ডটি সংযোগ কর এবং স্ক্রু দিয়ে মিনি এনআইসি কার্ডটি ম্যাদার বোর্ডের সাথে আটকিয়ে দাও। মিনি কার্ডের সাথে অ্যান্টিনা তার দুটি লাগাও।

মাদারবোর্ডে মিনি এনআইসি সংযোগ

ধাপ-৫: মাদারবোর্ডের হোল (Hole)বরাবর স্ট্যান্ড অফ (Stand off) স্ক্রু লাগাও।

ধাপ-৬: মাদারবোর্ডের ব্যাক প্যানেলের সাথে কেস এর ব্যাক প্যানেল ম্যাচ করে কেস এস ব্যাক প্যানেল লাগাও।

ধাপ-৭: মাদারবোর্ড কেসএ স্ট্যান্ড অফ স্ক্রু এর উপর মাদারবোর্ডটিকে বসাও ও এম ৩ স্ক্রু দিয়ে মাদারবোর্ড স্ট্যান্ড অফ স্ক্রুর সাথে লাগাও। এসে মাদারবোর্ড কেস এ কার্ডটি শক্ত করে লেগে যাবে।

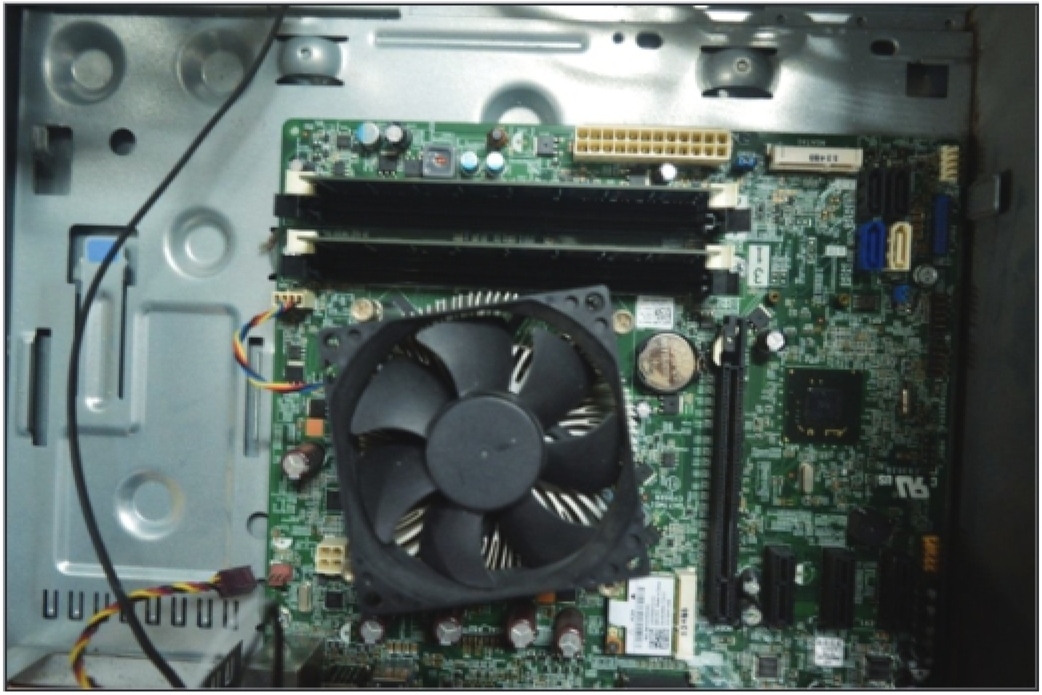

মাদারবোর্ড কেস এ বসানো

ধাপ-৮: হার্ড ডিস্কটি হার্ড ডিস্ক বে (Bay) তে এমনভাবে বসাও,যাতে সাটা পাওয়ার পোর্ট ও সাটা পোর্ট মাদারবোর্ডের দিকে থাকে। হার্ড ডিস্ককে সামনে পিছনে এমনভাবে কর যাতে হার্ড ডিস্কের স্ক্রু হোল ও কেস এর হোল বরাবরে

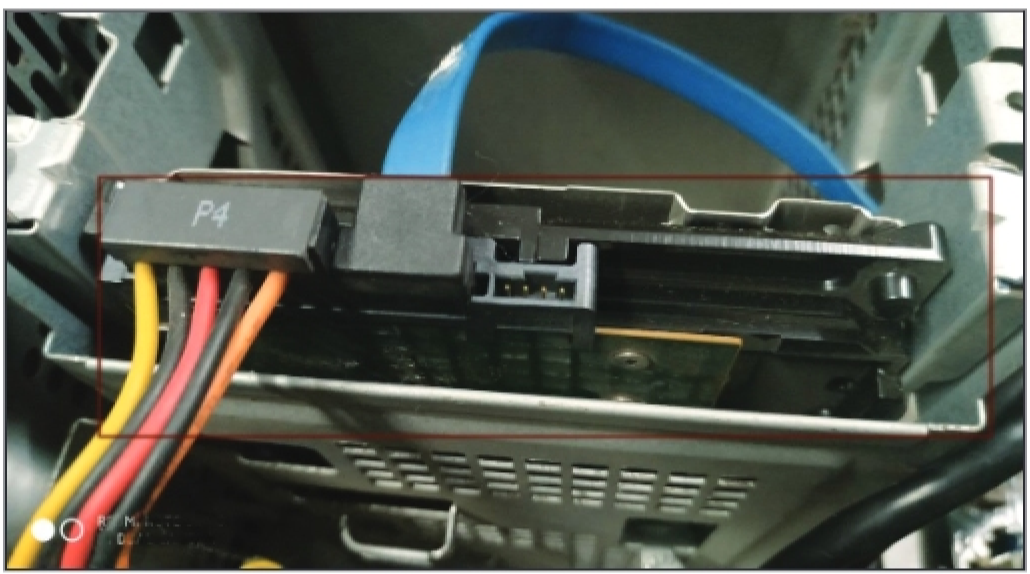

হার্ড ডিস্ক কেস এ বসানো

থাকে। এরপর 6-32 UNC স্ক্রু দিয়ে হার্ড ডিস্ককে কেস এর সাথে লাগাও।

ধাপ-০৯: ডিভিডি ড্রাইভটি ডিভিডি বে (Bay) বসাও,যাতে সাটা পাওয়ার পোর্ট ও সাটা পোর্ট মাদারবোর্ডের দিকে থাকে। ডিভিডিটিকে সামনে পিছনে এমনভাবে মুভ কর,যাতে ডিভিডির স্ক্রু হোল ও কেস এর হোল বরাবরে সেট হয়। আরও একটি বিষয় খেয়াল কর কেস এর বরাবর যেন ডিভিডির শেষ প্রান্ত থাকে। এরপর 6-32 UNC স্ক্রু দিয়ে ডিভিডিটি কেস এর সাথে সংযোগ সম্পন্ন কর।

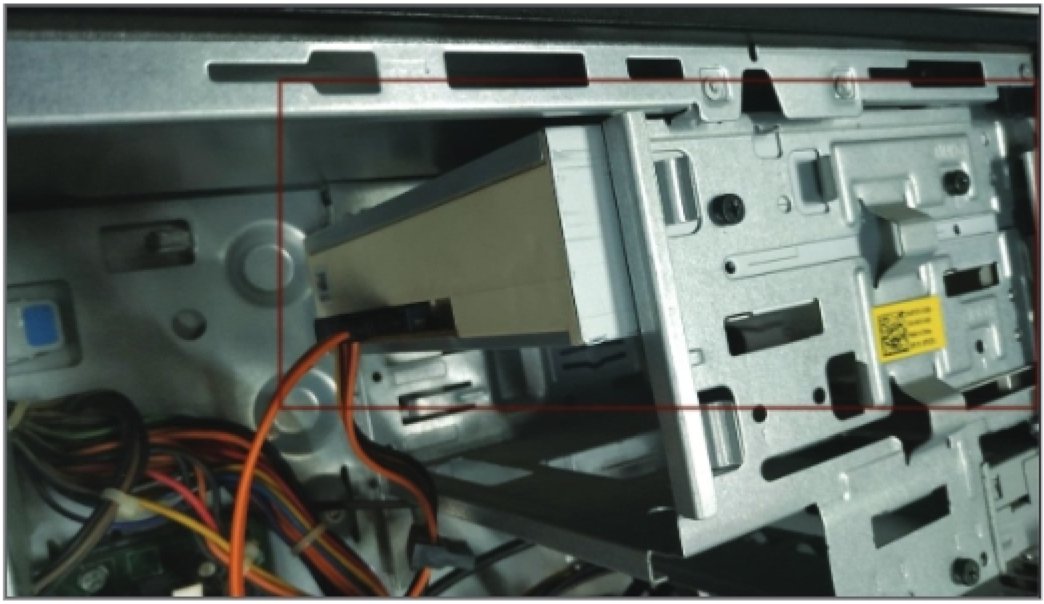

হার্ড ডিস্ক কেস এ বসানো

ধাপ-১০: পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটটি কেস এ বসাও। বসানোর সময় খেয়াল কর যেন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের লেবেল উপরে থাকে এবং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে সকেটে পাওয়ার ক্যাবল লাগানো হয় সেটি বাইরের দিকে রাখ। 6-32 UNC স্ক্রু দিয়ে কেস এর সাথে পাওয়ার সাপ্লাই শক্ত করে লাগাও।

পাওয়ার সাপ্লাই কেস এ বসানো

ধাপ-১১: হার্ড ডিস্কে সাটা ক্যাবল এর একপ্রান্ত লাগাও। অন্য প্রান্ত মাদারবোর্ডের সাটা ১ এ লাগাও। পাওয়ার সাপ্লাই উইনিটের সাটা পাওয়ার হার্ডডিস্কে লাগাও। উভয় ক্ষেত্রে ক্যাবলের খাঁজ ও হার্ড ডিস্কের খাঁজ দেখে ক্যাবল লাগাও।

ধাপ-১২: ডিভিডিতে সাটা ক্যাবল এর একপ্রান্ত লাগাও। অন্য প্রান্ত মাদারবোর্ডের সাটা ২ এ লাগাও। পাওয়ার সাপ্লাই উইনিটের সাটা পাওয়ার ডিভিডিতে লাগাও। উভয় ক্ষেত্রে ক্যাবলের খাঁজ ও ডিভিডির খাঁজ দেখে ক্যাবল লাগাও।

ধাপ-১৩: পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে ২৪ পিনের পাওয়ার কানেক্টরটি মাদারবোর্ডের ২৪ পিনের পাওয়ার সকেটে বসাও। বসানোর সময় খেয়াল কর মাদারবোর্ডের পাওয়ার সকেটে যে দিকে ক্লিপ আছে পাওয়ার কানেক্টরের সকেট যেন সেদিকে থাকে।

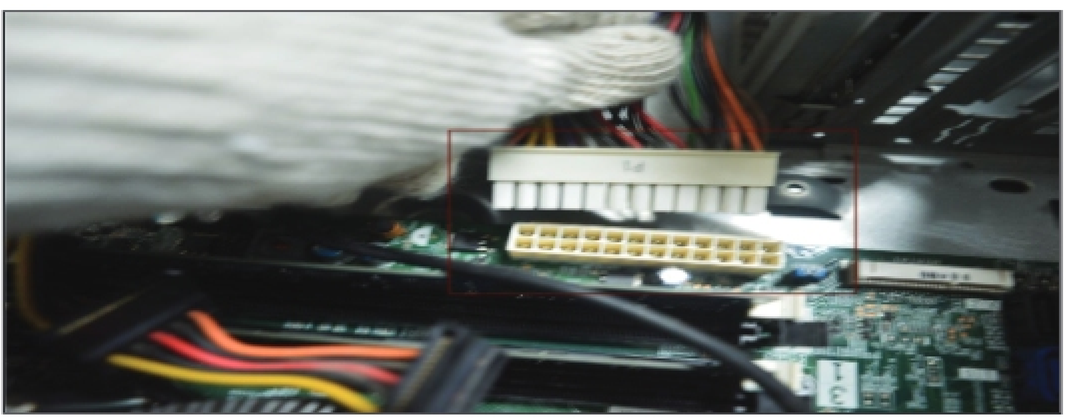

২৪ পিনের পাওয়ার কানেক্টর মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ করা

ধাপ-১৪: পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে ৪ পিনের ± ১২ ভোল্টের পাওয়ার কানেক্টরটি মাদারবোর্ডের ৪ পিনের পাওয়ার সকেটে বসাও। বসানোর সময় খেয়াল কর মাদারবোর্ডের পাওয়ার সকেটে যে দিকে ক্লিপ আছে ± ১২ ভোল্টের পাওয়ার কানেক্টরের সকেট যেন সেদিকে থাকে। ৪ পিনের পাওয়ার কানেক্টর মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ করা

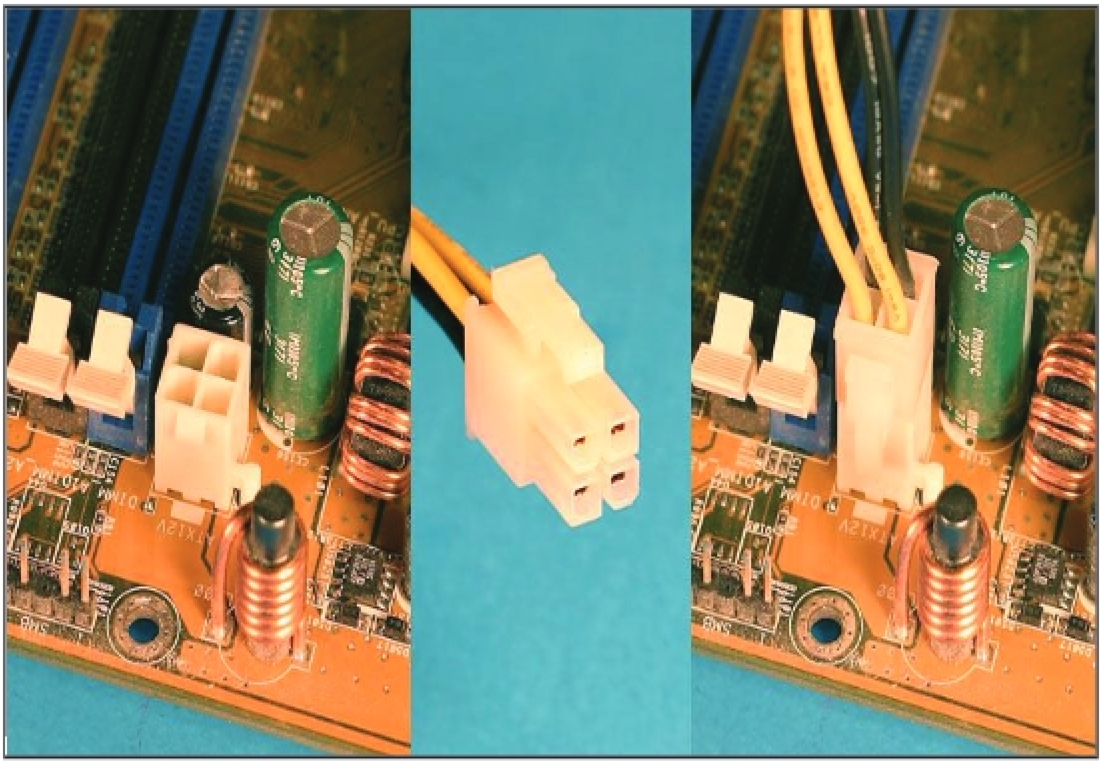

সমূহ

ধাপ-১৫: ফ্রন্ট ফ্রানেলের ক্যাবল ড্রায়াগ্রাম দেখে **মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ কর।**

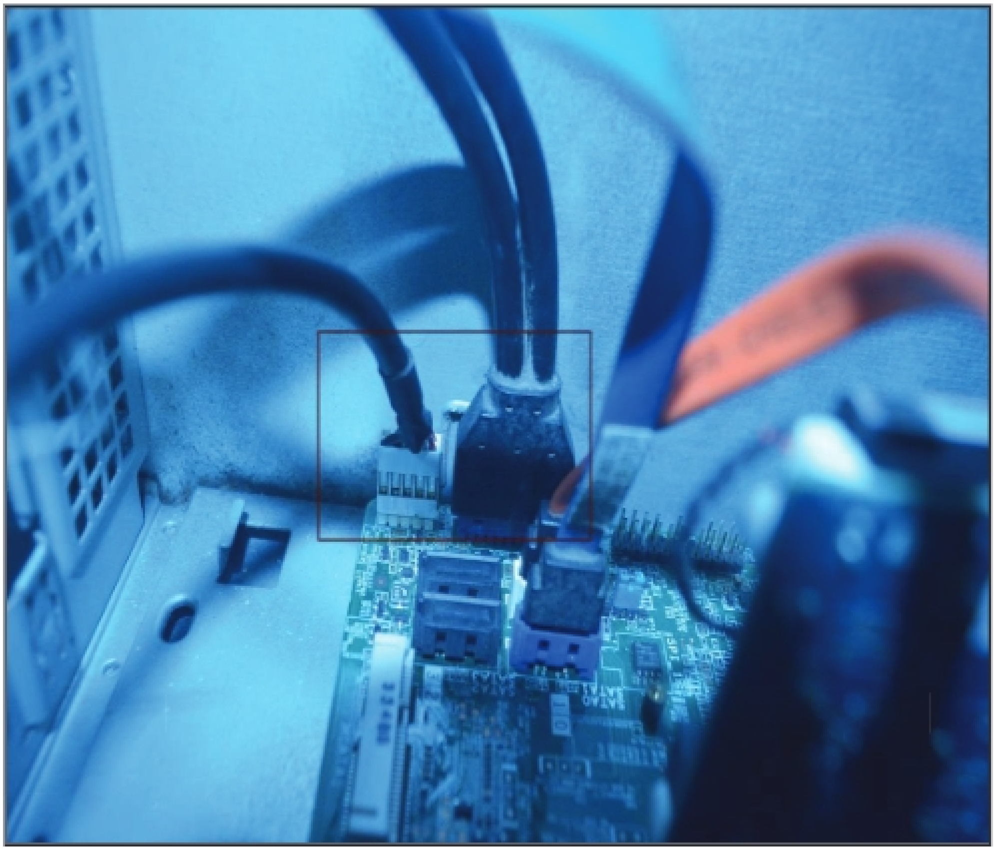

ফ্রন্ট প্যানেল সংযোগ করা

ধাপ-১৬: গ্রাফিক্স কার্ডটি পিসিআই স্লটে বসাও ও স্ক্রু দিয়ে কেস এর সাথে আটকাও।

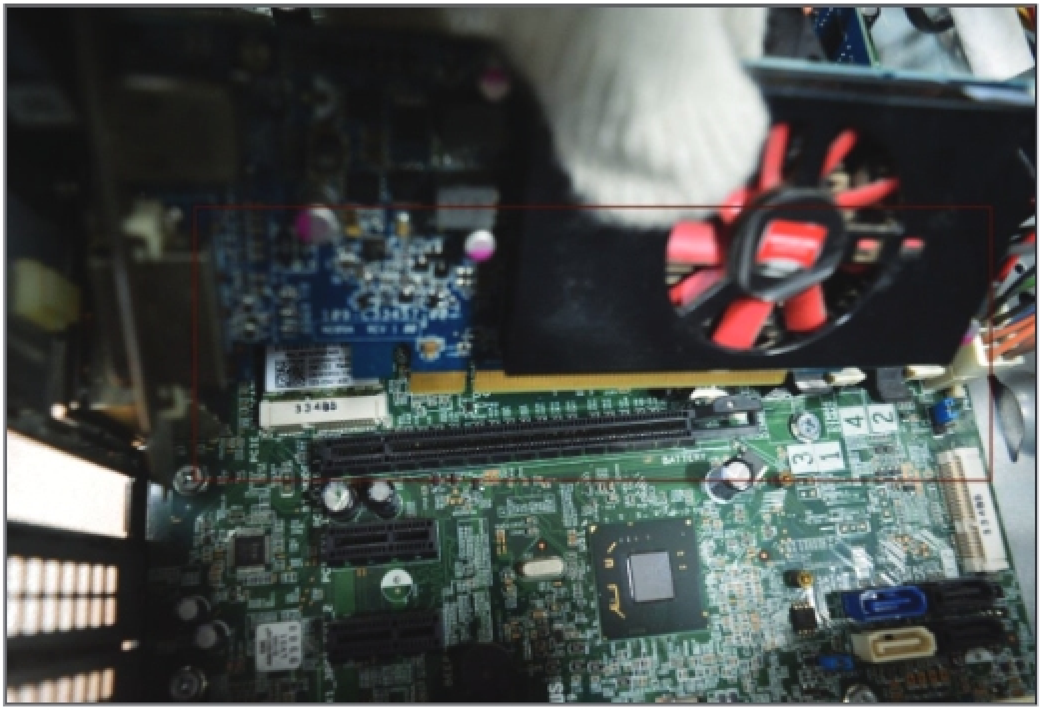

গ্রাফিক্স কার্ড সংযোগ

ধাপ-১৭: পুনরায় পুরো প্রক্রিয়াটি চেক কর, কোন অসংগতি থাকলে সংশোধন কর।

ধাপ-১৮: কভার লাগাও ও স্ক্রু দিয়ে আটকাও।

কভার লাগিয়ে স্ক্রু সংযোগ

ধাপ- ১৯: কী-বোর্ড ও মাউস সংযোগ কর।

ইউএসবি পোর্টের কীবোর্ড ও মাউস ব্যাক প্যানেলের ইউএসপি পোর্টের সাথে সংযোগ করো

ধাপ-২০: মনিটর এর ক্যাবল সিস্টেম ইউনিটের সাথে সংযোগ কর । মনিটরের ডাটা ক্যাবল গ্রাফিক্স কার্ডের ডিভিআই পোর্টের সাথে সংযোগ কর ও মনিটরে পাওয়ার সাপ্লাই দাঁও।

ধাপ-২১: সিস্টেম ইউনিটে পাওয়ার ক্যাবলের সংযোগ দাও।

অনুশীলনী-৩

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। কম্পিউটারের সিপিইউ কোথায় থাকে?

২। Core i7 এ কয়টি কোর থাকে?

৩। NLX পূর্ণ নাম কী?

৪। SATA পোর্টের পিন সংখ্যা কত?

৫। PATA পোর্টের পিন সংখ্যা কত?

৬। SD RAM কয়টি খাঁজ থাকে?

৭। পোর্ট অনুযায়ী হার্ড ডিস্ক কয় প্রকার?

৮। অপটিক্যাল ড্রাইভ কয় প্রকার?

৯। স্ট্যান্ড অফ স্ক্রু কোথায় ব্যবহার করা হয়?

১০। কুলিং ফ্যানের ভোল্টেজ সাপ্লাই কোথায় থেকে দেয়া হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। থার্মাল গ্লু এর কাজ কী?

২। ব্যাক প্যানেল কী?

৩। প্রজেক্টর ও মনিটরের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করো।

৪। ওয়্যারলেস কার্ড কোথায় ব্যবহার করা হয় এবং কেন?

৫। মাদার বোর্ডের ফরম ফ্যাক্টর কী?

৬। চিপসেট কী?

২০২৪

৭। বাস লজিক কী?

৮। পিসিআই বাস কী?

৯। ইউএসবি পোর্টে কত ভোল্টেজ ব্যবহার করে?

১০। এসএসডি কোথায় ব্যবহার করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রসেসর কী? core i9 প্রসেসর সম্পর্কে বর্ণনা করো।

২। মাদারবোর্ড কী? মাদার বোর্ডের বিভিন্ন স্লট সম্পর্কে বর্ণনা করো।

৩। এলজিএ (LGA-Land Grid Array) 1366 সকেট সম্পর্কে বর্ণনা করো।

৪। এসএসডি এর বর্ণনা দাও।

৫। কুলিং ফ্যানের কাজ কী?

৬। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের আউটপুট পোর্ট সম্পর্কে বর্ণনা করো।

৭। কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং এর সময় কী কী স্ক্রু প্রয়োজন তা বর্ণনা করো।

৮। ওয়্যারলেস কার্ডের বর্ণনা দাও।

০৯। সাধারণ কীবোর্ড-মাউস ও ওয়্যারলেস কীবোর্ড-মাউসের মধ্যে মূল পাথর্ক বর্ণনা করো।

১০। ১৩। মাদার বোর্ডে সাধারণত কিকি যন্ত্রাংশসমূহ/ কম্পোনেন্ট বসানো হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

১১। হার্ডডিক্স ও অপটিক্যাল ড্রাইভ কেসিং এ ইনস্টল করার পদ্ধতি বর্ণনা করো।

চতুর্থ অধ্যায়
সফটওয়্যার ইনস্টলেশন
Software Installation

প্রাণহীন মানুষ যেমন একটি জড় বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়, ঠিক তেমনি সফটওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার একটি অচল যন্ত্র মাত্র। এ জন্য কম্পিউটার চালনা ও কার্যপোযোগী করার জন্য প্রত্যেকটি কম্পিউটারে সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। সকল সফটওয়্যার কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের সাথে সচারচার ইনস্টল করা থাকে না। ব্যবহারকারীকে প্রয়োজনমত সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিতে হয়। কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন কাজ,যেমন ডকুমেন্ট তৈরি, হিসাব নিকাশ, উপস্থাপনা, ডিজিটাল ছবির সম্পাদনা, অত্যাধুনিক কম্পিউটার গেমিং, ভিডিও স্ট্রিমিং ইত্যাদি করে থাকি। এ জন্য কম্পিউটারে সফটওয়্যার ইনস্টলেশন একটি অপরিহার্য কাজ। সফটওয়্যার ডেভলোপাররা সর্বদা নতুন সফ্টওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে, যাতে আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করে আরও বেশি কাজ করতে পারি। আমরা যে সফটওয়্যার ব্যবহার করো বা যে সফটওয়্যার প্রয়োজন তা কম্পিউটারে ইনস্টলেশনের প্রক্রিয়া এই অধ্যায়ে শিখাব এবং হাতে কলমে করে দেখাব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারব
- অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পারব
- ড্রাইভার সফ্টওয়্যার ইনস্টল এবং আপডেট করতে পারব
- অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার ইনস্টল করতে পারব।

উপরোক্ত শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা তিনটি জব সম্পন্ন করব। এই তিনটি জবের মাধ্যমে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল, ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল, এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল ও ইউটিলিটি সফটওয়্যার ইনস্টল করার দক্ষতা অর্জন করব এবং জবগুলো সম্পন্ন করার পূর্বে প্রথমেই প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

৪.১ অপারেটিং সিস্টেম ও এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের ধারণা

চিত্র৪.১: উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম লোগো

অপারেটিং সিস্টেম: অপারেটিং সিস্টেম (ইংরেজি: Operating System, সংক্ষেপে OS) হলো একটি সিস্টেম সফটওয়্যার যা কম্পিউটার ও সফটওয়্যার এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামের জন্যে সাধারণ সেবা সরবরাহ করে। অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার ও ব্যহারকারীদের ইনপুট নেয় এবং বিভিন্ন টাস্ক ও কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সিস্টেম সম্পদগুলি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা করে ব্যবহারকারী ও অন্যান্য প্রোগ্রামকে সেবা প্রদান করে। মেমরি বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ, সিস্টেম অনুরোধগুলির অগ্রাধিকার নির্ণয়, ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ও ফাইল সিস্টেম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অপারেটিং সিস্টেমের কাজ। উইন্ডোজ, উবুন্টু, আইওএস, ক্রোম ওএস, ম্যাক ওএস ও অ্যানড্রয়েড প্রচলিত কয়েকটি অপারেটিং সিস্টেম। অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলি চালাবার পরিবেশ তৈরি করে।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার: অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এমন এক ধরণের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত, শিক্ষামূলক বা ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদনএর কাজে ব্যাবহৃত হয় প্রতিটি প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীকে কোন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াতে সহায়তা করা জন্য ডিজাইন করা,যেমন: ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার (মাইক্রোসফট ওয়ার্ড), ছবি এডিটিং এর জন্য সফটওয়্যার,ফটোশপ,ইত্যাদি।

সফটওয়্যারের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

সফটওয়্যার: কোন কাজের (সমস্যা) উদ্দেশ্যে যখন মানুষের বোধগম্য কম্পিউটারের ভাষা (সি, বেসিক, পাইথন, জাভা) ব্যবহার করে কতগুলি গাণিতিক ও যৌক্তিক নির্দেশকে যখন সারিবদ্ধভাবে ও সুশৃংখল ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন তাকে সফটওয়্যার বলে। যেমন উইন্ডোজ একটি অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার, এমএস ওয়ার্ড একটি আপ্লিকেশন সফটওয়্যার। সফটওয়্যারের মূল কাজ হলো কম্পিউটারকে কার্যপোযোগী করা এবং এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা।

সফটওয়্যার এর শ্রেণি বিভাগ

সফটওয়্যারকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১) সিস্টেম সফটওয়্যার ও

২) অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

সিস্টেম সফটওয়্যার: সিস্টেম সফটওয়্যার হচ্ছে এমন ধরনের সফটওয়্যার যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলোকে ব্যবহারকারীর ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে সহায়তা করে। এই সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে ও ব্যবহারিক প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য কম্পিউটারের সামর্থকে সতর্কভাবে নিয়োজিত রাখে। কম্পিউটারের কাজের প্রকৃতির উপযোগী করে সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। তাই বিভিন্ন প্রকারের কাজের জন্য সিস্টেম সফটওয়্যার বিভিন্ন রকমের হয়। এক ধরনের কম্পিউটারের উপযোগী করে তৈরি সফটওয়্যার পরিবর্তন করে না নিলে অন্য এক ধরনের কম্পিউটারের ব্যবহার করা যায় না।

সিস্টেম সফটওয়্যারকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১) সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার
২) সিস্টেম সাপোর্ট সফটওয়্যার
৩) সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার

সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম

সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম দিয়ে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ডেটা এবং নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম নিম্নলিখিত ইউনিটগুলো নিয়ে গঠিত। যথা–

১) অপারেটিং সিস্টেম
২) ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও
৩) নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সিস্টেম সাপোর্ট সফটওয়্যার

সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম দিয়ে কম্পিউটারে ব্যবহারকারী সার্ভিস প্রোগ্রাম, নিরাপত্তা প্রদানের প্রোগ্রাম কাজের হিসাব নিকাশসহ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করতে পারে। সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম নিম্নলিখিত প্রোগ্রামগুলো নিয়ে গঠিত। যথা-

১) সিস্টেম ইউটিলিটি প্রোগ্রাম
২) সিস্টেম পারফরমেন্স মনিটর প্রোগ্রাম ও

৩) সিস্টেম সিকিউরিটি মনিটরিং সফটওয়্যার

সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার

ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রোগ্রাম উন্নয়নের জন্য সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহার হয়ে তাকে। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১) প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক প্রোগ্রাম
২) প্রোগ্রামিং এডিটর ও টুলস
৩) কম্পিউটার এইডেড ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার

ব্যবহারিক ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে প্যাকেজ প্রোগ্রামকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১) ইন্টিগ্রেটেড প্যাকেজ সফটওয়্যার
২) একক প্যাকেজ সফটওয়্যার

ইন্টিগ্রেটেড প্যাকেজ সফটওয়্যার

একাধিক সমস্যা সমাধানের জন্য বাণিজ্যিকভাবে এই সফটওয়্যার তৈরি হয়। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এ ধরনের প্যাকেজ সফটওয়্যারে বিভিন্ন ধরনের প্রোগামের সমন্বয়ে উন্নয়ন করা হয়। যেমন–স্প্রেডশীট, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট, ওয়ার্ডপ্রসেসিং ও প্রেজেন্টেশনের জন্য মাইক্রোসফট এর ইন্টেগ্রেটেড প্যাকেট সফটওয়্যার হলো Ms office, Application .

একক প্রক্রিয়া প্যাকেজ সফটওয়্যার

একক প্যাকেজ সফটওয়্যারের সাহায্যে নিদিষ্ট ধরনের সমস্যা সমাধান করা হয়। যেমন ওয়ার্ড প্রসেসিং এর জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, প্যাকেজ সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও কিছু কিছু সফটওয়্যার কোম্পানি আছে যারা বিনামূল্যে ব্যবহারকারীদের সফটওয়্যার ব্যবহার করার সুযোগ দেয়, এ ধরনের সফটওয়্যারকে ফ্রিওয়্যার বলে। আর যে সফটওয়্যার ব্যবহারকারীরা গ্রুপে মিলেমিশে উন্নয়ন করে ব্যবহার করে তাকে শেয়ারওয়্যার বলে।

ফার্মওয়্যার

ফার্মওয়্যার হচ্ছে বিশেষে ধরনের সফটওয়্যার যা সুনির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন পড়ে। সাধারণত হার্ডওয়্যার প্রস্তুকারী প্রতিষ্ঠান নিজেদের যন্ত্রপাতির সাথে এ ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে থাকে। কম্পিউটরে বহুল ব্যবহৃত একটি ফার্মওয়্যার হলো Basic Input Output System (BIOS) যা কম্পিউটারের স্টার্ট চালুর জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্রত্যেকটি হার্ডয়্যারের সাথে থাকে তার নিজস্ব ডিভাইস ড্রাইভার। ফার্মওয়্যারগুলো সাধারন মেশিন নির্ভর হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক এক মেশিনের জন্য আলাদা আলাদা ডিভাইস ড্রাইভারের প্রয়োজন পড়ে। এ মাধ্যমটি হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে গঠিত। কম্পিউটার তৈরি করার

সময় রোম (ROM) নামক হার্ডওয়্যারে কিছু স্থায়ী প্রোগ্রাম তৈরি করে দেওয়া হয়।এটি হচ্ছে ফার্মওয়্যার।এগুলির পড়া যায় কিন্তু পরিবর্তন করা যায় না। এটি এক ধরনের আইসি, যেমন পিসিতে ব্যবহৃত ROM BIOS (Read Only Memory Basic Input Output System) একটি ফার্মওয়্যার। এটিতে কিছু প্রোগ্রাম জমা করে রখা হয় যা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে যোগাযোগ ঘটায়।

অপারেটিং সিস্টেম ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

অপারেটিং সিস্টেম

অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন এক ধরনের সিস্টেম প্রোগ্রাম যা কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত সকল প্রকার রিসোর্সকে নিয়ন্ত্রণ এর পরিচালনা করে। অপারেটিং সিস্টেমের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে রিসোর্স ম্যানেজার হিসেবে কাজ করা। মূল লক্ষ্য হলো প্রসেসর ব্যবস্থাপনা, মেমরি ব্যবস্থাপনা, ফাইল ব্যবস্থাপনা, ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা ও ডাটার নিরাপত্তা বিধান করা।

সুতরাং,"যে সফটওয়্যার কম্পিউটার প্রোগ্রামের চালনার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শিডিউলিং,ডিবাগিং, ইনপুট/আউটপু নিয়ন্ত্রণ, একাউন্টিং, কম্পাইলেশন, তথ্যাবলি সংরক্ষণ কার্যক্রম, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং আনুষঙ্গিক কাজসমূহ করতে পারে তাকে অপারেটিং সিস্টেম" বলে।

কম্পিউটার পরিচালনার জন্য অপারেটিং সিস্টেম ধারাবাহিকভাবে কাজ করে থাকে। এই কাজগুলো করার জন্য অপারেটিং সিস্টেমের ভেতরে বিভিন্ন সাব সিস্টেম থাকে তাদের মধ্যে আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম আছে। অপারেটিং সিস্টেমের উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হলো–

১. কম্পিউটার চালু ও পরিচালানা করা
২. অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করা
৩. ইনপুট/আউটপুট অপারেশন সম্পন্ন করা
৪. ফাইল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ
৫. কার্যাবস্থায় সমস্যার রিপোর্ট করা ও সমাধান দেয়া
৬. রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট
৭. একাউন্টিং
৮. তত্ত্বাবধান
৯. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
১০. নেটওয়াকিং

অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যারের বিবর্তন

প্রাথমিক অবস্থায় অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করা হয়েছিল মেইনফ্রেম কম্পিউটারের জন্য ১৯৫১ সালে। অপারেটিং সিস্টেমটি যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মটর রিসার্স ল্যাবরেটরি কর্তৃক আইবিএম (IBM –International Business Machine) কর্পোরেশনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পার্সোনাল কম্পিউটার বা মাইক্রোকম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হতে থাকে ১৯৭১ সাল থেকে। এই অপারেটিং সিস্টেমের নাম ছিল সিপি/এম (CP/M) পর্যায়ক্রমে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ কিংবা লিনাক্স একটি পর্যায়ে এসেছে।

বহুল ব্যবহৃত কিছু অপারেটিং সিস্টেম হলো-

১. ইউনিক্স
২. এমএস-ডস, পিসি ডস
৩. এমএস উইন্ডোজ
৪. লিনাক্স
৫. জেনিক্স
৬. ম্যাক ওএস
৭. সোলারিজ
৮. ওএস/২ র‍্যাপ
৯. নোভেল নেটওয়্যার

অপারেটিং সিস্টেমের কার্যাবলি

অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্ব

অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে। এটি কম্পিউটার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করে। অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই ব্যবহারকারী কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ও এর মধ্যবর্তী ব্যবহারিক সফটওয়্যারসমূহ চালাতে সক্ষম হয়। কাজেই অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কম্পিউটার একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই না। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে অপারেটিং সিস্টেম এর গুরুত্ব দেখানো হলো-

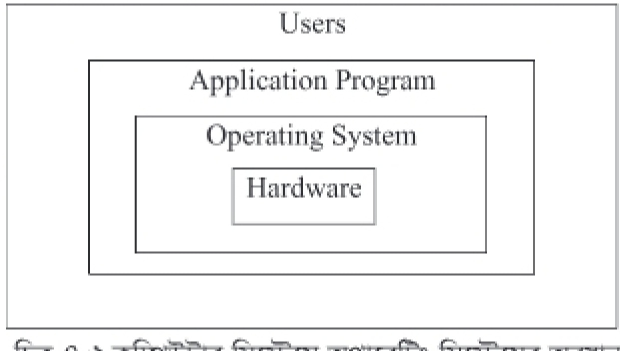

চিত্র: ৪.২ কম্পিউটার সিস্টেমে অপারেটিং সিস্টেমের অবস্থান

২০১৪

অপারেটিং সিস্টেমের কাজ: কম্পিউটারের আকার, গঠন ও প্রয়োগের উপর নির্ভর করে অপারেটিং সিস্টেমের গঠন ও আকার ছোট বা বড় এবং কাজের পরিধি কম বা বেশি হয়। নিম্নে অপারেটিং সিস্টেমের প্রধান কাজগুলো চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

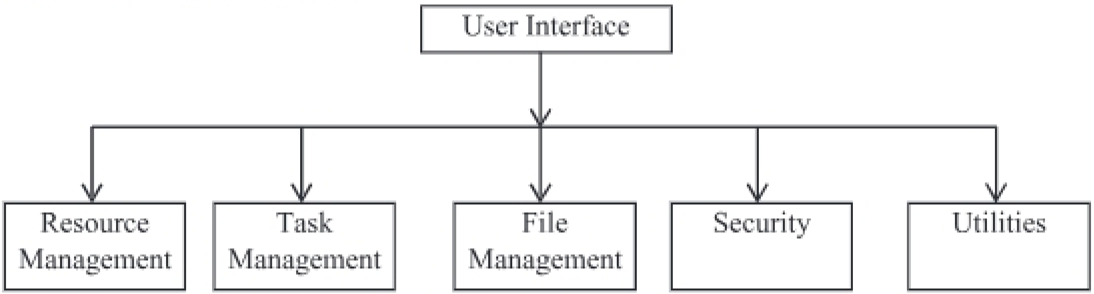

ইউজার ইন্টারফেস: ইউজার ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেমের এমন একটি অংশ যা ব্যবহারকারীর সাথে বিভিন্ন সফটওয়্যারের সংযোগ, সমন্বয় সাধন, পরিচালনা ও নির্দেশ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করে। তাছাড়া সফটওয়্যারগুলো নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন প্রোগ্রাম লোড করা ও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। অপারেটিং সিস্টেমে সাধারণত তিন ধরনের ইউজার ইন্টারফেস দেখা যায়। যথা– কমান্ড চালিত, মেন্যু চালিত ও গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস।

রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট: অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারকে সচল ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। এটি কম্পিউটারের বিভিন্ন রিসোর্স যেমন, ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস (কী বোর্ড, মাউস, মনিটর, ফ্লপি/সিডি/হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, প্রিন্টার, স্ক্যানার প্রভৃতি) ও অন্যান্য ডিভাইসগুলোর নিয়ন্ত্রণ, ত্রুটি ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয় সাধন করে। তাছাড়া মেমোরি ম্যানেজমেন্ট করে কম্পিউটারের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

সিকিউরিটি: অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের রিসোর্সকে অনাকাঙ্খিত ব্যবহারকারীর হাত থেকে রক্ষা করে। এটা ডেটা ও ইনফরমেশন চুরি রোধেও সহায়তা করে।

টাস্ক ম্যানেজমেন্ট: অপারেটিং সিস্টেমের টাস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীর নির্দেশ গ্রহণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাচ প্রসেসিং করে। এতে সিপিইউ এর টাইম স্লাইসকে বিভিন্ন টাস্কের মধ্যে বন্টন করে এবং ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোল করে যাতে সকল কাজই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।

ফাইল ম্যানেজমেন্ট: অপারেটিং সিস্টেম ফাইল ম্যানেজমেন্ট, যেমন ফাইল তৈরি, ফাইল ডিলেট, অ্যাকসেস, কপি, মুভ, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। তাছাড়া ডেটা ও প্রোগ্রাম ম্যানিপিউলেশন যেমনঃ ডেটা আদান প্রদান, স্থানান্তর ও সংরক্ষণের কাজ করে থাকে।

ইউটিলিটিস সুবিধা প্রদানঃ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা যেমন ফাইল ডিফ্রাগমেন্টেশন, ডেটা কম্প্রেশন, ব্যাকআপ, ডেটা রিকোভারি, এন্টিভাইরাস সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করে।

অপারেটিং সিস্টেমের শ্রেণিবিভাগ: মেমোরি সংগঠন, বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালানো বা কার্যকরীকরণ এবং সেকেন্ডারি বা সহায়ক মেমোরি ডিভাইসগুলোর উপর নির্ভর করে সাধারণত অপারেটিং সিস্টেমগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। কাজ করার পরিবেশ এবং ইন্টারফেসের উপর ভিত্তি করে এদেরকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। বর্ণ-ভিত্তিক (Text based/ Character User Interface-CUI)অপারেটিং সিস্টেম এবং

২। চিত্র-ভিত্তিক (Graphical User Interface-GUI) অপারেটিং সিস্টেম

৩। উইনডোজ ভিত্তিক (Windows Based) আপারেটিং সিস্টেম

১। বর্ণ-ভিত্তিক (Text based/ Character User Interface-CUI) অপারেটিং সিস্টেম

বর্ণ-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কী-বোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণ টাইপ করে এবং কী-বোর্ডের বিভিন্ন বোতাম ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়। ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুর করে ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহারের সকল পর্যায়ের কাজই করতে হয় কী বোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণ টাইপ করে এবং কী-বোর্ডের বিভিন্ন বোতাম ব্যবহার করে। উদাহরণ: MS DOS, PC DOS, UNIX ইত্যাদি।

২। চিত্র-ভিত্তিক (Graphical User Interface-GUI) অপারেটিং সিস্টেম

চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুরু করে ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহারের সকল পর্যায়ের কাজই করতে হয় বিভিন্ন প্রকার আইকন এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড ব্যবহার করে। আইকন এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড নির্বাচন, ব্যবহার এবং কার্যকর করা হয মাউসের সাহায্যে। চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কম্পিউটার চালু করার পর পর্দার উপরে বা ডেস্কটপে বিভিন্ন প্রোগ্রামের আইকন বা প্রতিকী চিত্র থাকে। প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের আইকনের উপর মাউস পয়েন্টর দিয়ে ডাবল ক্লিক করলেই প্রোগ্রামটি চালু হয়ে যায়। চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কোন কমান্ড মুখস্থ করে রাখার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ: MS-WINDOWS-10, Mac OS, Linux.

৩। উইন্ডোজ ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম

মাইক্রোসফটের কর্ণধার মি. বিল গেটস গত শতাব্দির আশির দশকের প্রথম দিকে আইবিএম (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন) পারসোনাল কম্পিউটারের জন্য সহজবোধ্য ও সরল একটি অপারেটিং সিস্টেম তৈরী করেন এর নাম ডস(DOS-Disk Operating System) বা ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম।এটি ছিলCUI (Character User Interface) মোডে। অর্থাৎ এটি অক্ষর ভিত্তিক হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা লাভে ব্যর্থ হয়।ইতিমধ্যে অ্যাপলকোম্পানী তাদের ম্যাকেনটশ কম্পিউটারের জন্য ইউজার ফ্রেন্ডলি ও সহজ অপারেটিং সিস্টেমGUI(Graphical User Interface)মোডে অপারেটিং চালু করে।

১৯৮৪ সালে মাইক্রোসফটও চিত্র ভিত্তিক(Graphical User Interface) ইউজার ফ্রেন্ডলি সফটওয়্যার চালু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং ১৯৮৫ সালের দিকে উইন্ডোজ নামে বাজারে আসে কিন্তু এটি ছিল ম্যাক প্রযুক্তির গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। ইউন্ডোজ সাফল্য লাভ করে আপগ্রেড ভার্সন উইন্ডোজ ৩.১ এর মাধ্যমে অতপর একের পরে এক নিত্য নতুন ও যুগোপযোগী অপারেটিং সিস্টেম উপহার দিয়ে আসছে মাইক্রোসফট। উইন্ডোজ ৯৫, উইন্ডোজ এনটি,

২০০০,এমই,এক্সপি,ভিসতা,উইন্ডোজ-৭,উইন্ডোজ-১০ এবং উইন্ডোজ -১১এর মাধ্যমে অপারেটিং সিস্টেমের বাজারের প্রায় সবটাই দখলে নিতে সক্ষম হয়েছে মাইক্রোসফট। এটি বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যবসা সফল অপারেটিং সিস্টেম।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার: বিভিন্ন কাজ যেমন– চিঠিপত্র টাইপ করা, বিল তৈরি করা, একাউন্টিং এর হিসাব রাখা, গ্রাফিক্স ডিজাইন করা, অডিও-ভিডিও শোনা ইত্যাদি কাজের জন্য আলাদা আলাদা সফটওয়্যার আছে। এর সবগুলোই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগাম। এটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন–

১) ব্যবহারকারী লিখিত প্রোগ্রাম

২) প্যাকেজ প্রোগ্রাম

ব্যবহারকারী লিখিত প্রোগ্রাম: কম্পিউটারের মাধ্যমে যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব। কম্পিউটার ব্যবহাকারী তার চাহিদা অনুযায়ী যে কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের মতো করে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম রচনা করতে পারেন। ব্যবসায়ী বা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে তথ্য ব্যবস্থাপনা, হিসাব নিকাশসহ অন্যান্য কাজের জন্য অনেক সময় বিশেষভাবে সফটওয়্যার তৈরি করে নেয়ার প্রয়োজন পড়ে। তবে এ কাজে অবশ্য একজন অভিজ্ঞ প্রোগ্রামার এর শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। অন্য পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যসহ পরীক্ষার ফলাফল তৈরির প্রোগ্রাম, ইনভেনটরি কন্ট্রোল বা পন্যদ্রব্যের বিস্তারিত তথ্যের তালিকা নিয়ন্ত্রনের প্রোগ্রাম, রেলওয়ে বা বিমানের আসন সংরক্ষণ উৎপাদন দ্রব্যের অনুসূচির প্রোগ্রাম ইত্যাদি ব্যবহারকারী লিখিত প্রোগামের উদাহরণ।

প্যাকেজ প্রোগ্রাম

ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য বেশ কিছু প্রোগ্রাম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাওয়া যায়। এ ধরণের প্রোগ্রাম দিয়ে নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করা যায়। এ প্রোগ্রামে ব্যবহারিক সমস্যা পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। এ সব প্রোগ্রামকে প্যাকেজ প্রোগ্রাম বলে। নিম্নে কয়েকটি প্যাকেজ প্রোগ্রামের উদাহরণ দেয়া হলো।যেমন–

১) ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার যেমন– মাইক্রোসফট ওয়ার্ড
২) ডেস্কটপ পাবলিশিং সফটওয়্যার যেমন–অটোক্যাড
৩) স্পেডশিট সফটওয়্যার যেমন–এমসএস এক্সেল
৪) ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার যেমন–এমএস এক্সিস
৫) গ্রাফিক্স, মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার যেমন– Coursera
৬) এন্টারটেইনমেন্ট ও এডুকেশন সফটওয়্যার যেমন– ফটোশপ
৭) ইউটিলিটি সফটওয়্যার যেমন– এন্টিভাইস মাইক্রসফট ডিফেন্ডার
৮) কম্পিউনিকেশন সফটওয়্যার যেমন– জুম
৯) বিভিন্ন ধরনের ইন্টারনেট ব্রাউজার যেমন– Chrome

২০২৪

কম্পিউটার বুটিং এর ধারনা

বুটিং(Booting)

বুটিং করার অর্থ কম্পিউটার সিস্টেমকে চালু করা। সাধারণত পাওয়ার বাটন চেপে আমরা এ কাজটি করে থাকি। যখনই আমরা কোন কম্পিউটারকে স্টার্ট হওয়ার নির্দেশ দেই তখন সে নিজের মধ্যে অনেকগুলো কাজ করে থাকে। যে কারণে এটিকে বুটিং বলে। কাজগুলি হল কম্পিউটারের নিজের মধ্যে যে Component আছে সেগুলিকে প্রাথমিকভাবে চেক করে এবং এটির মধ্যে থাকা প্রোগ্রামগুলোকে চালু হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। এই সমস্ত কাজের মাধ্যমেই কম্পিউার নিজেকে চালু হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। যখন কোন কম্পিউটারকে স্টার্ট বা রিস্টার্ট এর নির্দেশ দেয়া হয় তখন কম্পিউটার রোম বায়োস চিপ(ROM BIOS Chip) এর মধ্যে থাকা ইনস্ট্রাকশনগুলিকে পড়ে এবং এই ইনস্ট্রাকশনগুলি তখন কম্পিউটার এর নিজের সিস্টেমকে একবার পরীক্ষা করার নির্দেশ দেয় এটিকে POST (Power On Self Test) পোস্ট বলে। CMOS Chip এর মধ্যেও কম্পিউটার সিস্টেম সম্পর্কিত কিছু ইনফরমেশন স্টোর করা থাকে। যেমন কম্পিউটার এর মধ্যে কয়টি মেমোরি রয়েছে ও এদের ধারণ ক্ষমতা কত এবং কম্পিউটারটির মধ্যে ইনস্টল করা ডিস্ক ড্রাইভ বা স্টোরেজ ডিভাইস কি ধরণের তা উল্লেখ থাকে। কম্পিউটার বুটিং এর সময় এ সকল তথ্যগুলিকে ভেরিফাই করে থাকে। এ সমস্ত কাজ হয়ে যাবর পরে কম্পিউটার হার্ডডিস্ক এর মধ্যে থাকা অপারেটিং সিস্টেম কে লোড করে। অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কম্পিউটার কোন কাজ করতে পারে না।

বুটিং এর প্রকারভেদ: বুটিং দুই ধরনের(১) শীতল বুটিং ও (২) উষ্ণ বুটিং

শীতল বুটিং: কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করে প্রথমবার চালু হওয়ার সময় যে বুটিং হয় তাকে শীতল বুটিং বলে।

উষ্ণ বুটিং: কম্পিউটার কাজ করতে করতে আর কাজ করে না অথবা কাজ করতে করতে কম্পিউটার হ্যাঙ্গ হয়ে গেলে পাওয়ার সুইচ অফ না করে রিস্টার্স বা রিসেট সুইচ চেপে যে বুটিং করা হয় তাকে উষ্ণ বুটিং বলে।

বুট-অ্যাবল মিডিয়া

চিত্র ৪.৩: বুটঅ্যাবল পেন ড্রাইভ

কম্পিউটার বুট হওয়ার পরে যে সকল মিডিয়া থেকে অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে কম্পিউটার চালু হয় তাকে বুটঅ্যাবেল মিডিয়া বলে। বুটঅ্যাবল মিডিয়া হিসেবে ফ্লোপি ডিস্ক, হার্ডডিস্ক, এসএসডি, পেন ড্রাইভ, অপটিক্যাল ড্রাইভ ব্যবহৃত হচ্ছে। কাম্পিটার বায়োস থেকে বুট অর্ডার পরিচর্তন করা হয়। উইন্ডোজ-১০ ব্যবহৃত বুটিং ফাইলসমূহ (১) Windows Boot Manager (Bootmgr.exe) (3) Windows operating system loader (Winload.exe) (3) Windows resume loader (Winresume.exe)

ব্যাকআপ সিষ্টেম

তথ্য সংরক্ষণ কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার কোন সময় অকার্যকর হতে পারে, তথ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ চুরি কিংবা হারিয়ে যেতে পারে বা অন্য কোন উপায়ে নষ্ট হতে পারে। তোমার কম্পিউটার/ল্যাপটপে নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম বা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রয়োজন হতে পারে। এসব কারণে অনেক সময় তুমি তোমার মূল তথ্য হারাতে পার। এ জন্য সবসময় তোমাকে তথ্যের ব্যাকআপ রাখা উচিত। নতুবা আর কোন দিনই তোমার মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করতে পারবে না। সুতরাং তথ্য ব্যাকআপ বলতে বুঝায় তোমার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো অন্যত্র একটি কপি পেন ড্রাইভ, ডিভিডি, হার্ডডিস্ক অথবা অন্য কোন মিডিয়াতে পরবর্তীতে ব্যবহার করার জন্য নিরাপদে সংরক্ষণ করে রাখা।

চিত্র ৪.৪ : ব্যাকআপ সিম্বল

সফটওয়্যার ব্যাকআপ বলতে বুঝায় কোন প্রোগ্রাম ভবিষ্যতে ইনস্টল করার জন্য/সেট আপ করার জন্য সংরক্ষণ রাখা। যারা আইটি প্রফেশনাল তাদেরকে প্রতিনিয়ত কম্পিউটার এ অপারেটিং সিস্টেম, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারসহ আরও অনেক সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় ব্যবহার জনিত কারণে সিডি/ডিভিডি নস্ট হয়ে হয়ে যায়। এ জন্য সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হল সফটওয়্যার পেন ড্রাইভ অথবা এক্সটারনাল হার্ড ডিস্ক অথবা ডিভিডিতে সংক্ষেন বা ব্যাকআপ রাখা।

চিত্র ৪.৫:ইউন্ডোজ ব্যাকআপ সফটওয়্যার

তথ্য ও সফটওয়্যার ব্যাকআপ রাখার প্রয়োজনীয়তা

কম্পিউটারের ভিতরে জমাকৃত তথ্য যেকোন সময়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বর্তমানে যত মানুষ কম্পিউটার ব্যবহার করে তাদের অনেকেই ব্যাকআপ এর ধারণা না থাকায় প্রতিনিয়ত তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ব্যাকআপের ধারণা না থাকার কারণে সময় এবং অর্থ দু'ইই অপচয় হচ্ছে। যেসকল কারণে আমাদের ব্যাকআপ রাখা দরকার তার কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যাওয়াঃ বিভিন্ন কারণে একটি কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ডাটা ব্যাকআপ না থাকলে এ কারণে ব্যাবহারকারী ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন। গরম চা বা কফি ফেলে তুমি তোমার ল্যাপটপের হার্ড ড্রাইভ নষ্ট করতে পারো।

চুরি হয়ে যাওয়া

হতে পারে তোমার কম্পিউটারটি চুরি হয়ে গেছে। কোন এক্সটারনাল মিডিয়াতে ব্যাকআপ রাখলে তুমি সেখান থেকে পূণরায় ব্যবহার করতে পারবে। এতে তোমার সময় সাশ্রয় হবে।

সময় ও শ্রমের সাশ্রয়

তুমি হয়তো অনেক বড় কোন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছ। যে কাজটি করেছে সেটি হয়তো দশ দিনের কাজ। কাজের প্রেসারে অনেক সময় ভুল করে তথ্য মুছে দিতে পার। এজন্য সব সময় কাজ শেষে বিকল্প পদ্ধতিতে একটি ব্যাকআপ কপি সংগ্রহ করবে। এতে তোমার সময় ও শ্রম সাশ্রয় হবে।

অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক দূর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে অনেক বড় বড় কোম্পানী ধবংস হয়ে গেছে। অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত ঠান্ডা, বন্যা, ভূমিকম্প, সাইক্লোন বা আগুন যেকোন সময় সংগঠিত হতে পারে। তাই যদি তোমার কোন ভালো ব্যাকআপ প্ল্যান থাকে তা হলে বড় বিপদ থেকে বাঁচতে পারো।

ভাইরাস ও হ্যাকার

তোমার কম্পিউটার ভাইরাস আক্রমন করে সব তথ্য মুছে দিতে পারে। অনেক সময় হ্যাকার তোমার তথ্য চুরি করতে পারে। তাই ব্যাকআপ তোমার ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদের রাখার পাশাপাশি হ্যাকারদের হাত থেকেও রক্ষা করে।

ব্যাকআপ পদ্ধতি

প্রত্যেক কম্পিউটার ব্যবহারকারীর উচিত ডেটা ব্যাকআপ রাখা। আমাদের দেশে প্রায় ৩০ শতাংশ কম্পিউটার ব্যবহারকারী ব্যাকআপ রাখার জন্য আগ্রহ দেখায় না। বেশীরভাগ ব্যবহারকারি বিষয়টাকে বাড়তি ঝামেলা মনে করে এড়িয়ে যায়। এটি উচিত নয়। এদিকে অবশ্যই নজর দেয়া উচিত। আগে কম্পিউটার ব্যাকআপ একটু জটিল হলেও বর্তমানে সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার বা অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে অনেক সহজ হয়ে গেছে। বিভিন্ন উপায়ে এখন ডেটা ব্যাকআপ নেয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি উপায় আলোচনা করা হলো-

চিত্র ৪.৬: ইউএসবি হার্ড ড্রাইভ

এক্সটারনাল ড্রাইভে ডেটা ব্যাকআপ

ডেটা ব্যাকআপ করার সবথেকে সহজ উপায় হল কোনো এক্সটারনাল ড্রাইভে ডেটা স্টোর করা। বাজারে অনেক ধরণের অনেক সাইজের ইউএসবি হার্ড ড্রাইভ তুমি পাবে। এ ধরণের এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভে ডেটা ব্যাকআপ করা সব থেকে জনপ্রিয় একটি উপায়।

অনলাইন এ তথ্য ব্যাকআপ

অনলাইন ব্যাকআপ সার্ভিস সবথেকে নির্ভরযোগ্য ডেটা ব্যাকআপ পদ্ধতি। অনলাইন ব্যাকআপ সার্ভিস তোমার ডিভাইসের হার্ড ড্রাইভ প্রথমে স্ক্যান করে তারপর সিকিউরিটি এনক্রিপ্ট করে সার্ভারে পাঠিয়ে দেয় প্রোটেক্ট করার জন্য। এরপর ফাইল আপলোড হয়ে গেলে তুমি যেকোন জায়গা থেকে তোমার ব্যাকআপ ফাইল অ্যাকসেস করতে পারবে ও সময়মতো তথ্য উদ্ধার করতে পারবে। এ ব্যাকআপের সুবিধা হল এ সার্ভিস তোমাকে যেকোন প্রকার ডেটা লসের হাত থেকে বাঁচায়। তবে এ সার্ভিস অনেকটা খরচ সাপেক্ষ কারণ সবসময় ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি থাকতে হয়। **Google Drive** একটি অন লাইন তথ্য ব্যাকআপ অ্যাপস।

চিত্র ৪.৭: গুগল ড্রাইভে ব্যাকআপ

ক্লাউড স্টোরেজ সার্ভিস

ক্লাউড স্টোরেজ সার্ভার সেন্টারে তোমার ফাইলগুলি গচ্ছিত রাখতে পার। খুব সহজেই তোমার ফাইল শেয়ার করতে পারো। তোমার ফাইলগুলো ড্রপ বক্স, ওয়ান ড্রাইভ, স্কাই ড্রাইভ সার্ভিসের সাহায্যে ব্যাকআপ রাখতে পারো।

চিত্র ৪.৮: ওয়ান ড্রাইভ

চিত্র ৪.৯: স্কাই ড্রাইভ

চিত্র ৪.১০: ড্রপ বক্স

৪.২ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল

আমরা যারা কম্পিউটার অথবা মোবাইল ফোন ব্যবহার করছি আমরা প্রায়ই একটি শব্দ শুনে থাকি তা হলো অপারেটিং সিস্টেম যেমন: উইন্ডোজ বা এনড্রয়েড। প্রত্যেক ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা স্মার্ট ফোনটির সফটওয়্যার প্রোগ্রাম এবং হার্ডওয়্যার পরিচালনার জন্য একটি অপারেটিং সিস্টেম প্রয়োজন। সুতরাং আমরা বলতে পারি উইন্ডোজ হলো কম্পিউটারে ব্যবহৃত একটি অপারেটিং সিস্টেম এবং এনড্রয়েড হলো মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত একটি অপারেটিং সিস্টেম।

ডিস্ক পার্টিশন, পার্টিশনের ধরন ও প্রকারভেদ

ডিস্কপাটিশন: পার্টিশন করা মানে তোমার কম্পিউটারে ব্যবহৃত হার্ড ড্রাইভকে একাধিক ভাগে ভাগ করা। তুমি বাস্তবে একটি হার্ডড্রাইভ কম্পিউটারে সংযোগ করলেও বাস্তবে তোমার কম্পিউটারে C Drive, D Drive, E Drive ইত্যাদি দেখা যায়। একটি হার্ড ডিস্কে পার্টিশন করে আমরা এ ড্রাইভগুলো পেয়ে থাকি। যাদি তুমি তোমার কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভকে পার্টিশন না করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল কর তাহলে তুমি তোমার কম্পিউটারে শুধু মাত্র C Drive, দেখতে পাবে। এ ভাবে আমারা একটি হার্ড ড্রাইভকে সাধারণত ৩ থেকে ৫ টি পার্টিশন করে থাকি। অপারেটিং সফটওয়্যার ইনস্টলের সময় আমরা পার্টিশন করি। তবে অপারেটিং সিস্টেম ইনষ্টলেশনর সময় পার্টিশন না করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল হওয়ার পরেও করা যায়। আবার পার্টিশন করার জন্য ইউটিলিটি সফটওয়্যারও ব্যবহার করে করা যায়। পার্টিশন কয়টি হবে এবং কোন পার্টিশনের ধারণ ক্ষমতা কত হবে তা পার্টিশন করার পূর্বে ব্যবহারকারীকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

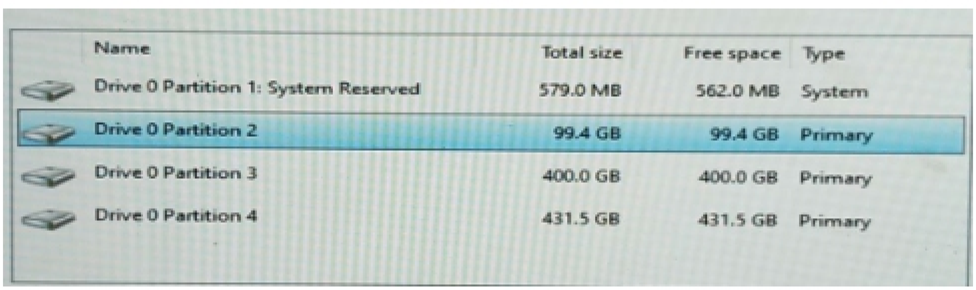

চিত্র ৪.১১: হার্ড ডিস্ক পার্টিশন

একটি ১টিবি (TB- Teara Byte = 1024 GB) হার্ড ডিস্ককে ৩ টি পার্টিশন করে চিত্রে দেখানো হয়েছে।

পার্টিশনের সুবিধা

১) প্রত্যেকটি পার্টিশন আলাদাভাবে একটি হার্ড ডিস্কের মতো বৈশিষ্ট্য থাকে, ফলেএকটির উপর অন্যটির প্রভাব পরে না।

২) আলাদা পার্টিশনে আলাদা অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যা ইনস্টল করা যায়।

৩) একটি লজিক্যাল ড্রাইভকে কম্পিউটারের ডাটা ব্যাকআপের জন্য ব্যবহার করা যা।

পার্টিশনের প্রকারভেদ

পার্টিশনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা- ১) প্রাইমারি পার্টিশন ও ২) সেকেন্ডারি পার্টিশন

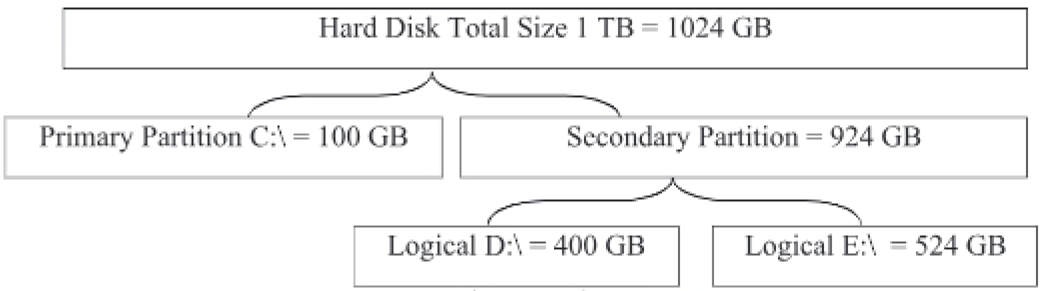

চিত্র: হার্ড ডিস্ক পার্টিশন ড্রায়াগ্রাম

সেকেন্ডারি পার্টিশনকে লজিক্যালি ২ বা ততোধিত ভাগে ভাগ করা যায়।

অপারেটিং সিস্টেম কে অ্যাক্টিভেশন এবং গঠন

অপারেটিং সিস্টেম এ্যাক্টিভেশন

সফটওয়্যার অ্যাক্টিভেমন হলো একটি এন্টি পাইরেসি পলিসি। যাতে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শেষ ব্যবহারকারীদের সাথে লাইসেন্স চুক্তির সাথে সম্মতিতে বৈধভাবে লাইসেন্স দিয়ে তা যাচাই করার জন্য ডিজাইন করা হয়। এটি একটি বিজনেস পলিসি। সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান যাতে তাদের রয়্যালিটি সঠিকভাবে পান সে জন্য তারা সফটওয়্যারের মধ্যে একটি বিশেষ কোডিং এর ব্যবস্থা রাখেন। ঐ বিশেষ কোড ইউনিক হয় এবং ব্যবহারকারীকে অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত আমরা যে সকল সফটওয়্যার ব্যবহার করি সেগুলোর প্রত্যেকেরই পাইরেসি আইন আছে। আমাদের দেশে হয়তো একনও পাইরিসি আইন সঠিক ভাবে মানা হয় না। তবে উন্নবিশ্বে এ্যাক্টিভেশনের জন্য পাইরেসি আইন কঠোর ভাবে মানা হয়।

চিত্র ৪.১২: উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেশন কী

সফটওয়্যার আপডেট

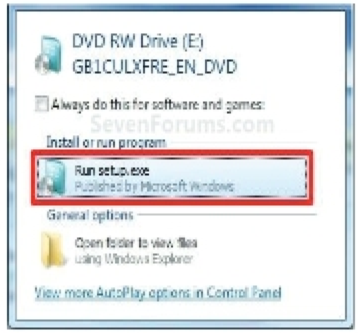

চিত্র ৪.১৩: সেট আপ

সফটওয়্যারের মধ্যে ক্রটিপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে অথবা অসুবিধাসমূহ দূর করে বর্তমানের চেয়ে আরও বেশি সুবিধা দেয়ার প্রক্রিয়াকে আপডেট বলে। আমাদের ব্যবহৃত সফটওয়্যারটি প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে। এ জন্য আমাদেরকে বর্তমানেরপ্রচলিত সুবিধাপাবার জন্য সফটওয়্যার আপডেট করতে হয়। এটি দু ভাবে হতে পারে অফ লাইন আপডেট অথবা অন লাইন আপডেট। অফ লাইনে সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তাদের তৈরি করা আপডেট ফাইলসমূহ ব্যবহৃত কম্পিউটারে কপি করে দেন। অন লাইন আপডেটসমূহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। বর্তমানে অনলাইন আপডেট প্রক্রিয়া বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪.৩ ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল এবং আপডেট

ড্রাইভার সফটওয়্যার

চিত্র ৪.১৪: ড্রাইভার সিডি

তুমি বাজার থেকে একটি প্রিন্টার অথবা স্ক্যানার ক্রয় করে সঠিকভাবে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ দেয়ার পর প্রিন্ট অথবা স্ক্যান করতে চাইলে। তুমি কি প্রিন্ট অথবা স্ক্যান করতে পারবে। পারবে না। কারণ; প্রিন্টার অথবা স্ক্যানারটিকে কার্যোপযোগী করার জন্য উক্ত প্রিন্টার অথবা স্ক্যানারের ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয়। ড্রাইভারসমূহ হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এবং হার্ডওয়্যার এর সাথে সরবরাহ করে। সুতরাং হার্ডওয়্যারকে কার্যোপোযোগী করার জন্য যে সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়, তাকে ড্রাইভার সফট্ওয়্যার বলে। ব্যবহৃত ড্রাইভার অনলাইনে অথবা অফ লাইনে মাঝে মাঝে আপডেট করতে হয়।

৪.৪ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল এর ধারণা

আমরা যারা কম্পিউটার ব্যবহারকারী আমারা মূলত অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার নিয়েই বেশি কাজ করি। আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল করে নেই। কম্পিউটারে কি ধরণের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল হবে তা গ্রাহকের চাহিদার উপর নির্ভর করে। কারও হয়তো ফটোশপ, কারও হয়তো বা অটোক্যাড সফটওয়্যার এর প্রয়োজন হয়। এসকল সফটওয়্যার ইনস্টল করার জন্য আমাদের Setup ফাইল থাকে। এ ফাইল রান করে স্টেপ বাই স্টেপ আমারা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়ার ইনস্টল করে থাকি।

৪.৫ কাজের পর্যালোচনা এবং পরিচ্ছন্নতা

ইনস্টল কাজটি ধারাবহিকভাবে শুরু করার জন্য প্রথমে বই পড়ে অথবা ম্যানুয়াল দেখে বুঝে নিয়ে কাজ করতে হয়। না বুঝে কোন কাজ করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজ শেষে কাজের জায়গাটি অপরিষ্কার হয়ে যায়। এজন্য কাজ করার সময় যে জায়গাটি অপরিষ্কার হবে সেটি তোমরা নিজারাই পরিষ্কার করবে।

২০২৪

জবের নাম : কম্পিউটারে সফটওয়্যার ইনষ্টল করন

জব শিট

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী সচল কম্পিউটার, ওপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশন মিডিয়া ও সফটওয়্যার সংগ্রহ করা;
- কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ইনস্টল করা।
- কার্টুন/প্যাকেট নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্যার্পগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল গুছিয়ে রাখা ।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অ্যাপ্রন	সাধারণ	০১ টি
০২	মাস্ক	সাধারণ	০১ টি
০৩	হ্যান্ড ওয়াশ/সাবান	সাধারণ	০১ টি
০৪	রাবারের স্যান্ডেল/ জুতা	সাধারণ	০১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমান
০১	কম্পিউটার	ডেস্কটপ/ ল্যাপটপ, কোর আই-৭ /আপার ভার্সন	০১ টি
০২	বুটঅ্যাবল পেনড্রাইভ	ব্যাকআপ অপারেটিং সিস্টেম	০১ টি
০৩	ড্রাইভার ডিভিডি	চিপসেট, সাউন্ড, নেটওয়ার্ক, গ্রাফিক্স ড্রাইভার	০১ টি

০৪	বাংলা বিজয় ডিভিডি	বিজয়-২০১১	০১টি
০৫	এন্টিভাইরাস ডিভিডি	ক্যাসপারস্কি-২০২০	০১টি

সফটওয়্যার (Software)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমান
০১	অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার	উইন্ডোজ-১০/আপার ভার্সন	০১ টি
০২	এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যর	অফিস এ্যাপ্লিকেশন-১০/আপার ভার্সন	০১ টি
০৩	এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার	প্রাপ্যতা অনুযায়ী , আপডেট ভার্সন	০১ টি
০৪	ড্রাইভার সফটওয়্যার	মাদারবোর্ডের সাথে দেয়া সিডি	০১ টি
০৪	পেন ড্রাইভ	উইন্ডোজ ISO	০১ টি

কাজের ধাপ সমূহ উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশন

১. কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করবে

২. যেকোন ইউএসবি পোর্টে বুটঅ্যাবল পেন ড্রাইভ প্রবেশ করাবে

বুটঅ্যাবল পেন ড্রাইভ

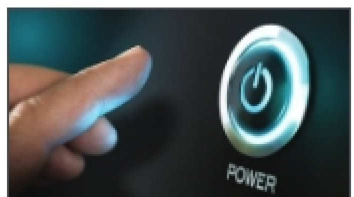

কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ

৩. F2 / F12 /Del কী চেপে BIOS এ প্রবেশ করবে

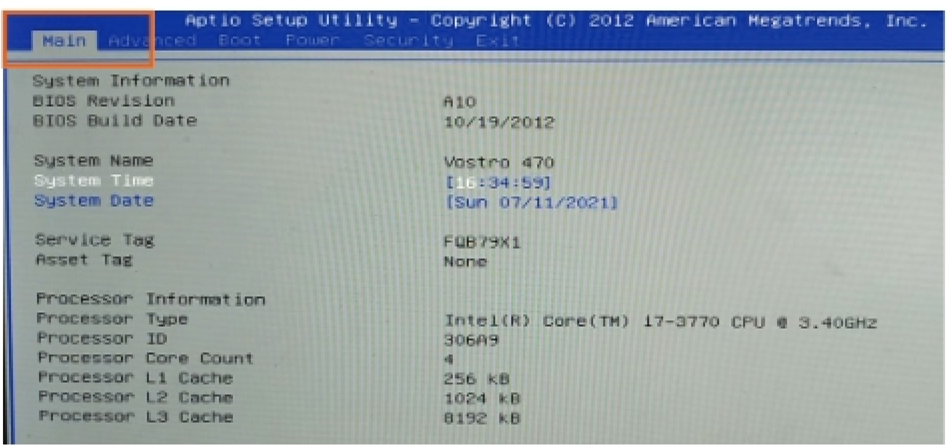

BIOS Main Menu

২০২৪

৪. ডান এ্যারো কী ব্যবহার করে কার্সরকে BOOT এ আনবে

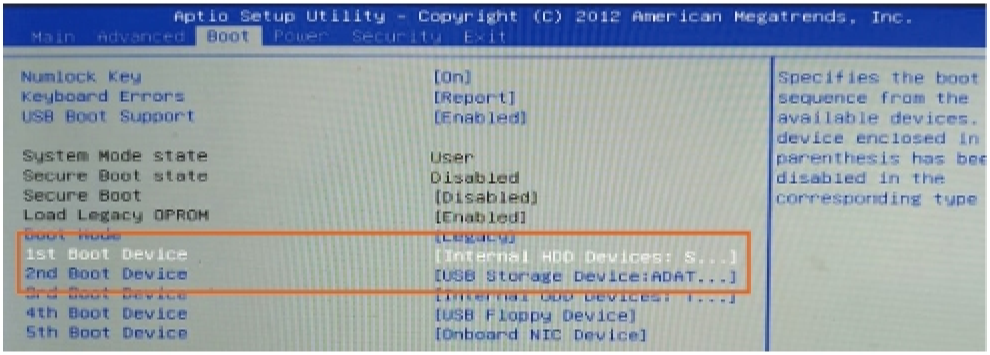

Boot Menu

চিত্রে দেখা যাচ্ছে 1st Boot Device এ Internal HDD Device আছে অর্থ্যাৎ তোমাকে যে কাজটি করতে হবে তা হলো তুমি হার্ড ডিস্ক থেকে কম্পিউটার বুট না করে বুটেবল পেন ড্রাইভ থেকে কম্পিউটার বুট করতে হবে। কারণ এ সময়ে তোমার কম্পিউটারে কোন বুট ফাইল থাকেনা যার ফলে কম্পিউটার চালু হতে না। আমরা নতুন একটি হার্ড ড্রাইভে অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ-১০ ইনস্টলের কাজ করবো। সেজন্য 1st Boot Device পেন ড্রাইভ হতে হবে। অর্থ্যাৎ চিত্র অনুযায়ী 2nd Boot Device "USB Storage Device" কে 1st Boot Device এ আনতে হবে। এ জন্য ডাউন এ্যারো কী ব্যবহার করে কার্সর পয়েন্টকে 2nd Boot Device এর উপর রেখে এন্টার কী চাপতে হবে। তাহলে ডিভাইসটি জায়গা বদল করে 1st Boot Device টি 2nd Boot Device এর স্থানে এবং 2nd Boot Device টি 1st Boot Device এর স্থানে যাবে। যা নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

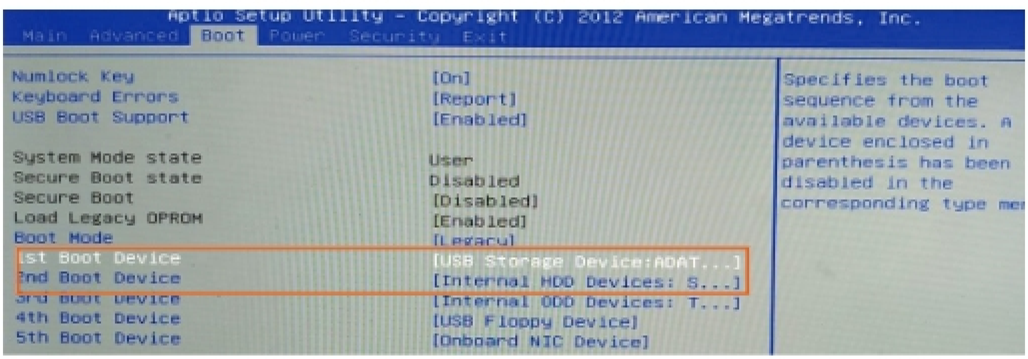

পেন ড্রাইভ হার্ড ডিস্কের জায়গায় এবং হার্ড ডিস্ক পেন ড্রাইভের জায়গায় স্থান বদল করেছে

৫. রাইট এ্যারো কী ব্যবহার করে Exit এ যাবে এবং কার্সর Save Changes and Reset এ রেখে এন্টার কী চাপবে।

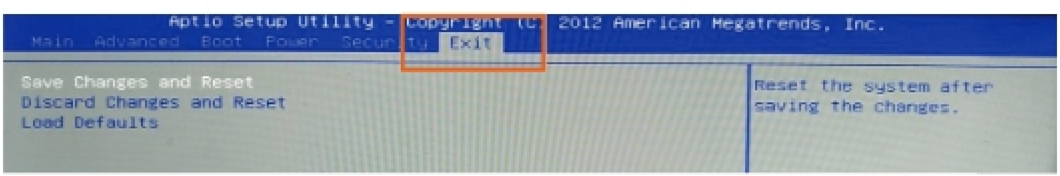

ডান এ্যারো কী ব্যবহার করে Exit এ কার্সর আছে

৬ . Save and Reset ডায়ালগ বক্স আসলে Yes এ কার্সর রেখে এন্টার কী চাপতে হবে।

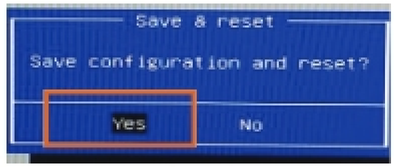

বায়োস সেভ

৭. My language is English সিলেক্ট করবে

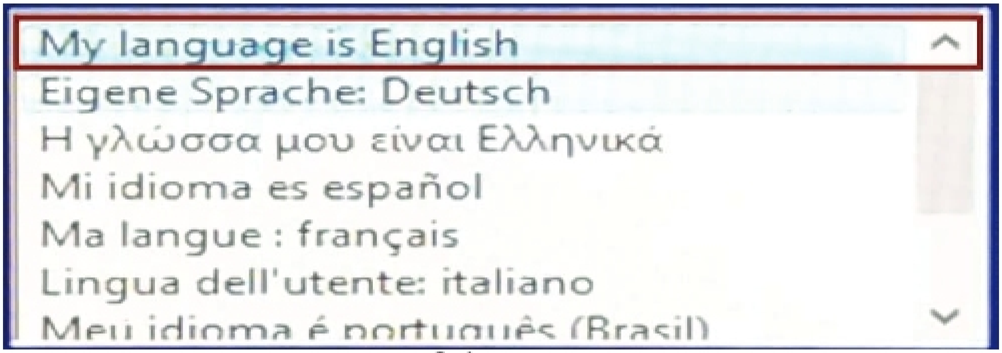

ভাষা নির্বাচন

৮. Language to Install এ English (United States), Keyboard or Input: US Select করবে

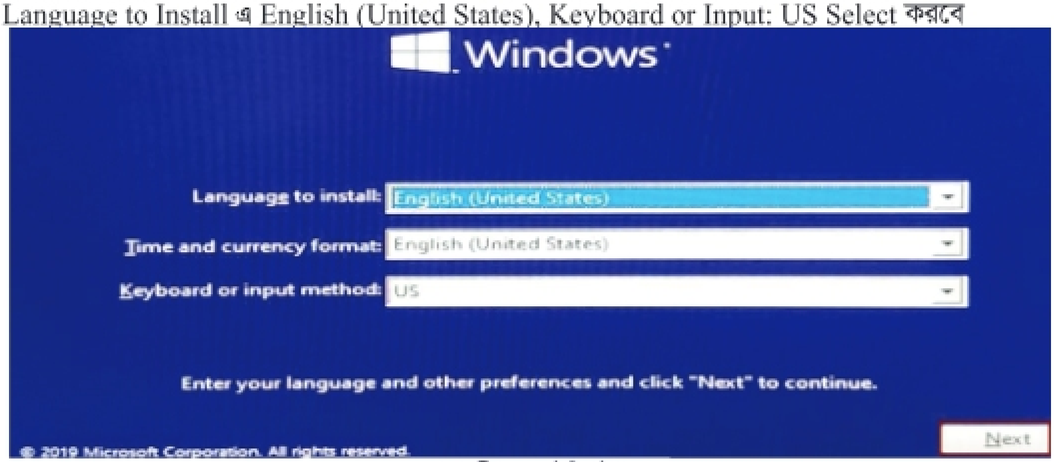

ভাষা ও কী বোর্ড নির্বাচন

৯. Windows 10 Pro (Professional) নির্বাচন করবে

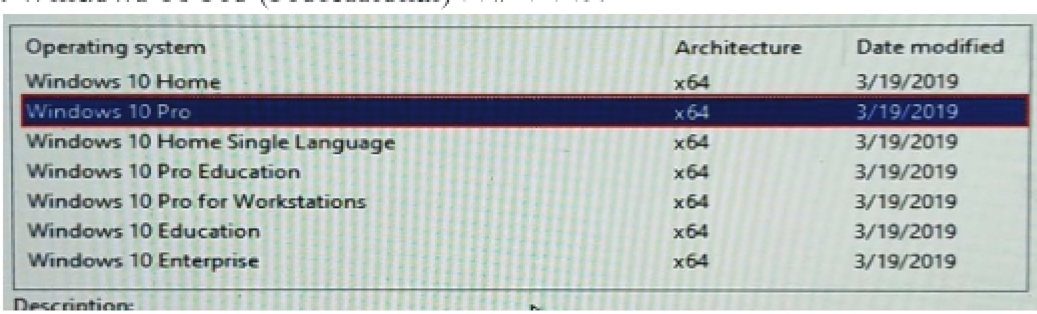

উইন্ডোজ প্রো নির্বাচন

১০. I accept the license terms এ Click করে Next এ Click করো।

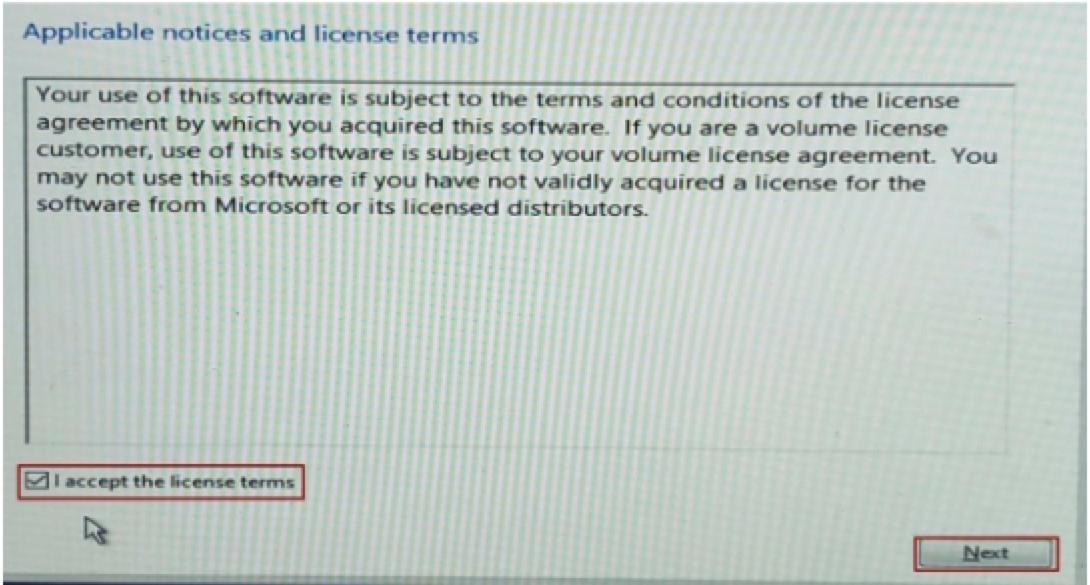

নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের শর্ত মেনে নেয়া (Accept করা)

১১. Custom Install Windows only (advanced) এ ক্লিক করো।

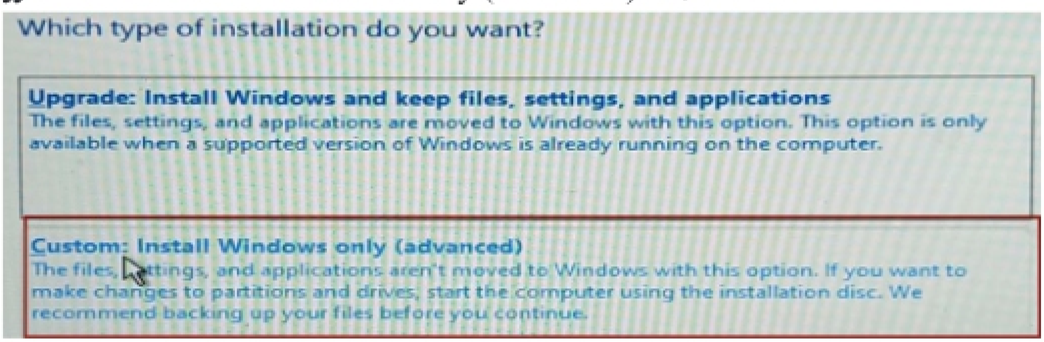

Custom Install Windos dialog box

১২.Drive 0 Unallocated Space 931.5 GB ক্লিক করো, New তে ক্লিক করো, Next ক্লিক করো।

আমরা যে হার্ড ডিস্কটি নিয়ে কাজ করছি এটির সাইজ 1TB (Tera byte) = 1024 GB (Giga Byte). যা বাস্তবে 931.5 GBদেখাচ্ছে। অপারেটিং সিস্টেম দেয়ার পূর্বে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তুমি কয়টি পার্টিশন করবে এবং প্রত্যেক পার্টিশনের সাইজ কত হবে। এ হার্ড ডিস্কে আমারা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমারা এটিতে ৩টি পার্টিশন করব। C Drive এর সাইজ হবে 102 GB (102400 MB), D Drive এর সাইজ হবে 409 GB (409600 MB), E Drive এর সাইজ হবে 441GB (441867 MB)। হার্ড ডিস্কের

২০২৪

সাইজ যদিও GB অথবা TB হয়ে থাকে কিন্তু পার্টিশন করার সময় সাইজ MB (Mega byte) তে দেয়া হয়। ডায়ালগ বক্সগুলো একটু ভালো মতো খেয়াল কর বিষয়টি তোমার কাছে আরো সহজ হবে।

১৩. Drive 0 Unallocated Space 931.5 GB ও New তে ক্লিক করো।

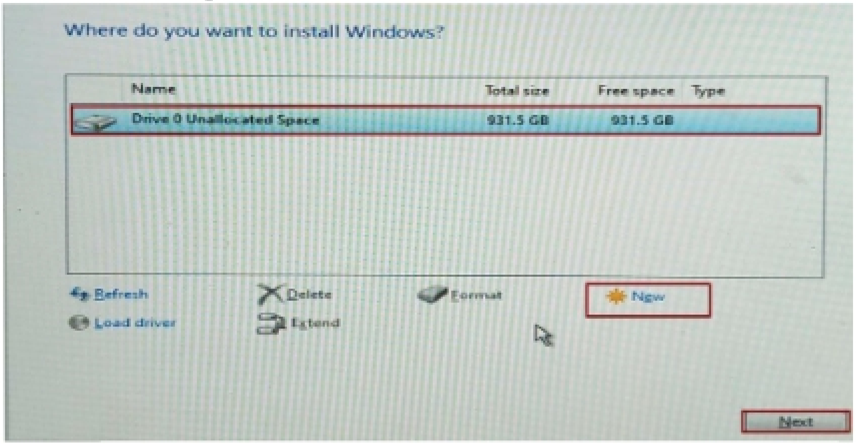

C drive তৈরি প্রক্রিয়া

১৪. সাইজের বক্সে 102400 টাইপ করে Apply ও Next এ ক্লিক করো। C drive তৈরি হলো।

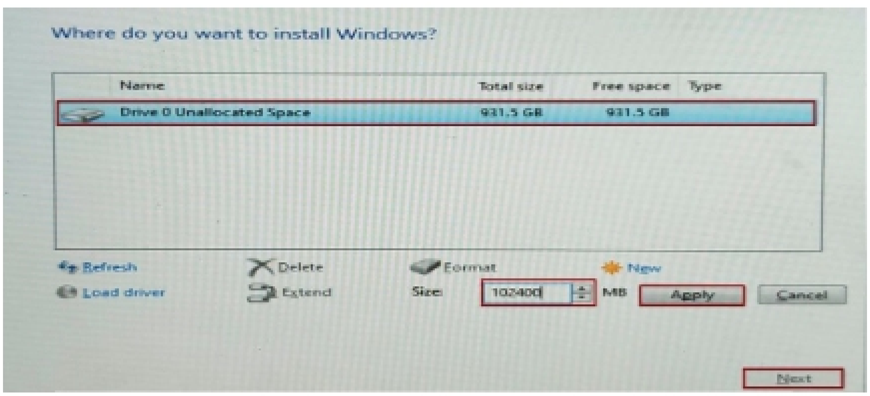

C drive তৈরি হলো

১৫. Additional Partition তৈরির জন্য OK তে ক্লিক করো।

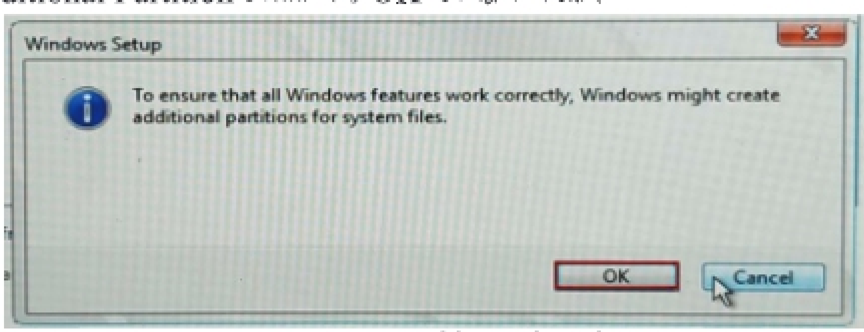

Additional Partition পার্টিশন তৈরির প্রক্রিয়া

১৬. D Drive তৈরির জন্য Drive 0 Unallocated Space 831.5 এ রেখে New তে ক্লিক করো।

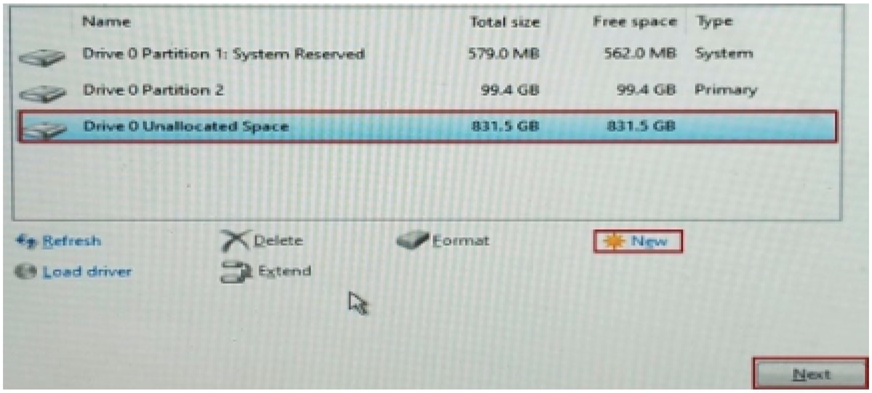

D drive তৈরি প্রক্রিয়া

১৭. Size এ 409600 টাইপ করে Apply ও Next এ ক্লিক করো।

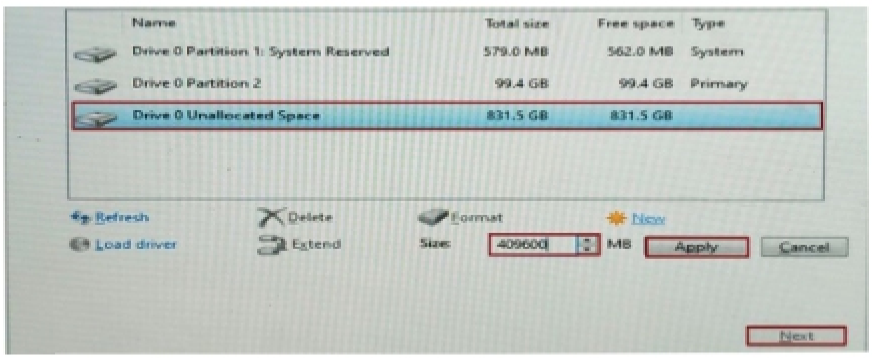

D drive তৈরি হলো

১৮. মাউস দিয়ে Drive 0Unallocated Space 431.5 GB তে ক্লিক করে Size এ 441867 টাইপ করে Apply ও Next এ ক্লিক করো।

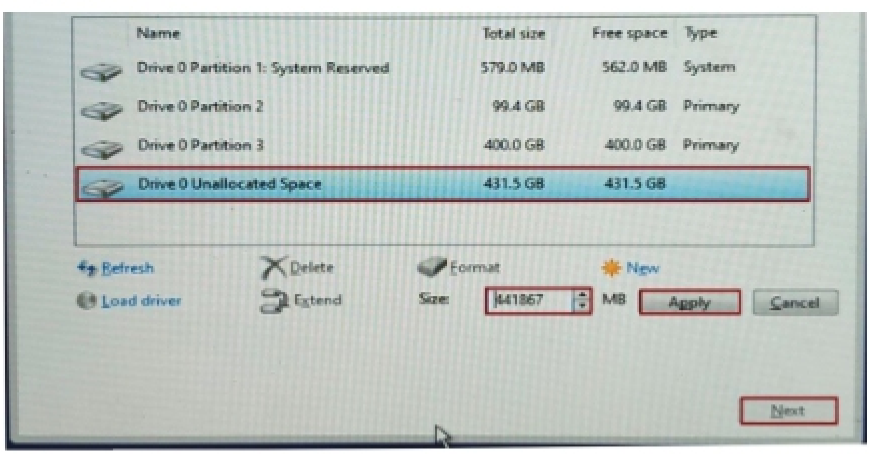

E drive তৈরি

২০২৪

১৯. Drive 0 Partition 2 99.4 GB তে ক্লিক করে Next এ ক্লিক করো। এই ড্রাইভে উইন্ডোজ ইনস্টল হবে।

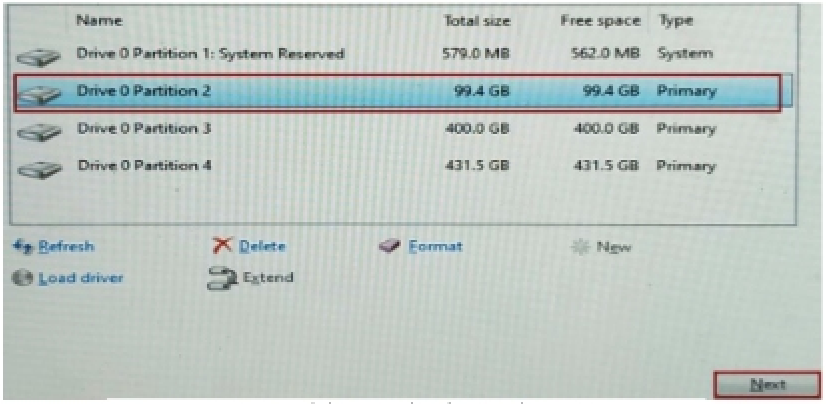

উইন্ডোজ ইনস্টল ড্রাইভ

২০. ইনস্টল হচ্ছে

উইন্ডোজ ইনস্টল

২১. অঞ্চল হিসেবে United statesএ ক্লিক করে Next এ ক্লিক করো।

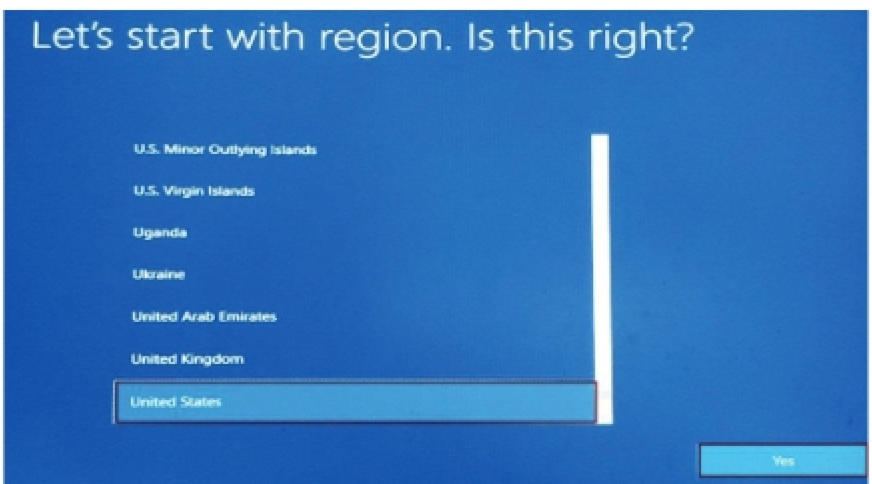

অঞ্চল নির্বাচন করা

২২. কী বোর্ড হিসেবে US এ ক্লিক করে Next এ ক্লিক করো।

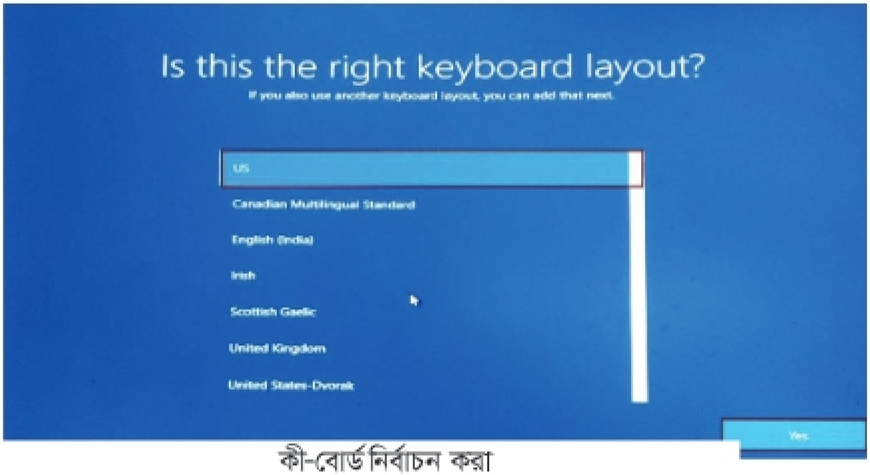

কী-বোর্ড নির্বাচন করা

২৩. দ্বিতীয় কী-বোর্ড লে আউট তুমি সংযোগ করবে না। সে জন্য Skip এ ক্লিক করো।

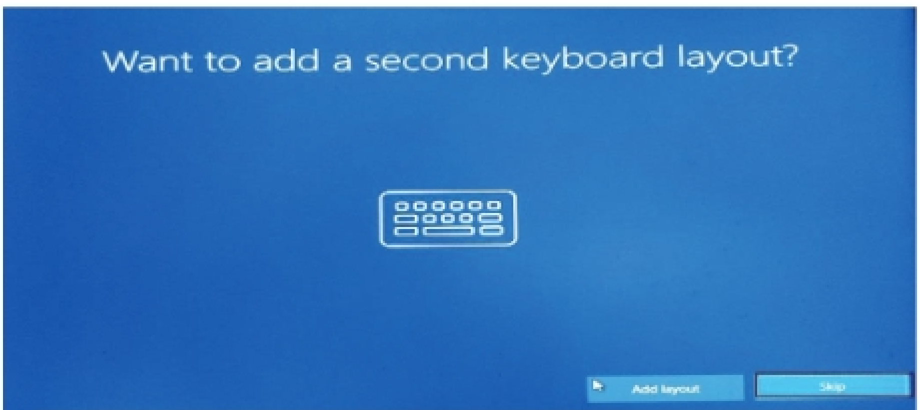

দ্বিতীয় কোন ভাষার কী বোর্ড ইনস্টল না করা

২৪. নেটওয়ার্ক কানেকশন আপাতত দিবে না। সেজন্য I don’t have Internet এ ক্লিক করো।

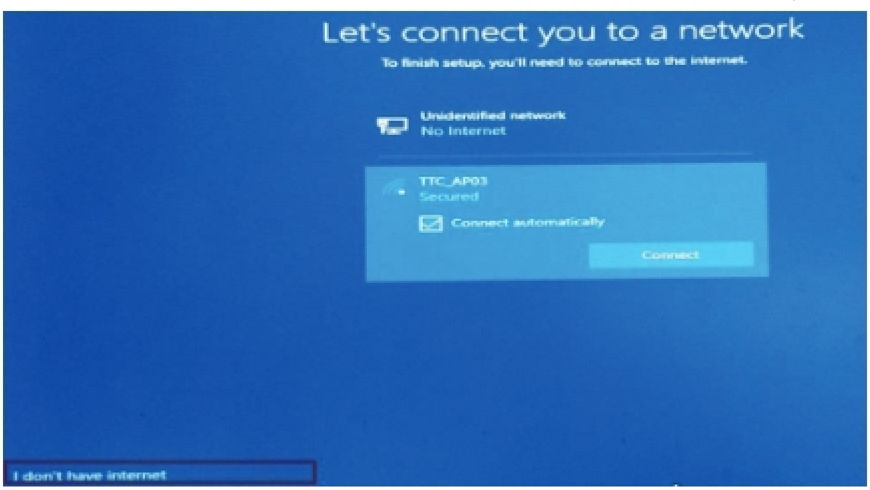

ইন্টানেট কানেকশন অপশন নির্বাচন

২৫. এ ডায়ালগ বক্সে তুমি তোমার নাম টাইপ করে Next এ ক্লিক করো। আমি আমার নাম ইউজার এর নাম টাইপ করে Next এ ক্লিক করেছি।

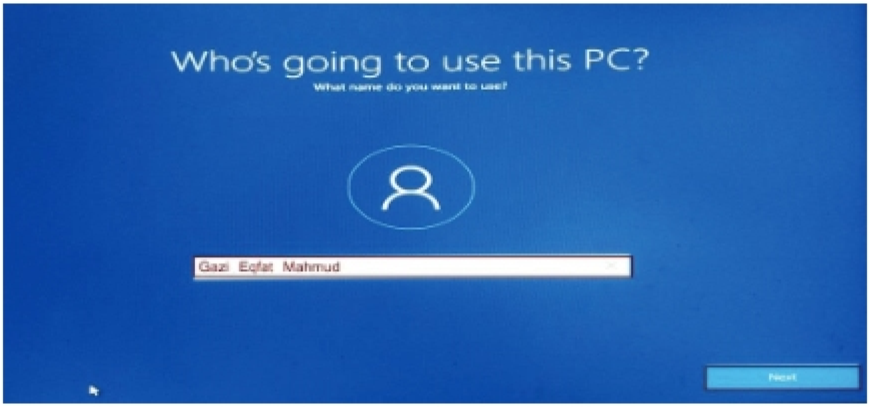

ব্যবহারকারী তার নিজের নাম টাইপ করবে

২৬. Privacy Settings এ Accept এ ক্লিক করো।

Privacy Accept করা

২৭. সফল ভাবে উইন্ডোজ ১০ ইনস্টল হয়েছে

উইন্ডোজ ১০ ইনস্টলেশন চলমান

২০২৪

কাজ ২ : ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টলেশন

আমরা এ কাজের সময় সাউন্ড ড্রাইভার, চিপসেট ড্রাইভার, নেটওয়ার্ক ড্রাইভার ও গ্রাফিক্স ড্রাইভার ইনস্টল করব।

ড্রাইভার ডিভিডি

সাউন্ড ড্রাইভার ইনস্টল করা

১. মাদার বোর্ডের সাথে দেয়া ড্রাইভার ডিভিডিটি তোমার কম্পিউটারের ডিভিডি ড্রাইভে ইনসার্ট করবে।

২. ডিভিডি ড্রাইভে ডিভিডি প্রবেশ করানোর পর নিম্নের চিত্রের ন্যায় একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। উক্ত ডায়ালগ বক্স থেকে ক্লিক Next করবে।

ড্রাইভার ডায়ালগ বক্স

৩. Audio Driver Realtek ALC887 Audio Driver RevA00 এ ক্লিক করো।

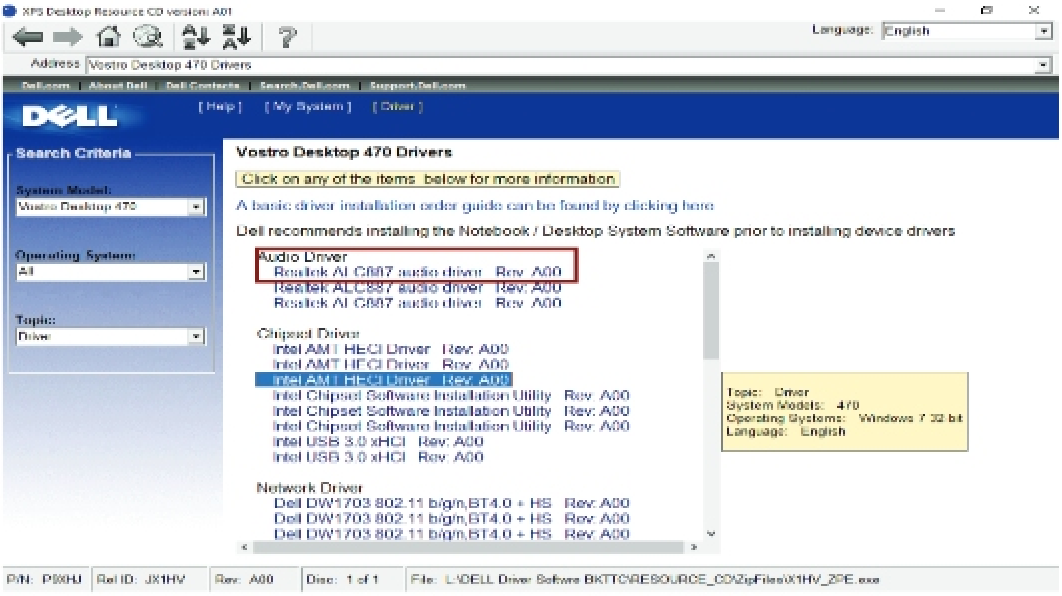

ড্রাইভার ডায়ালগ বক্স

৪. Extract এ ক্লিক করো।

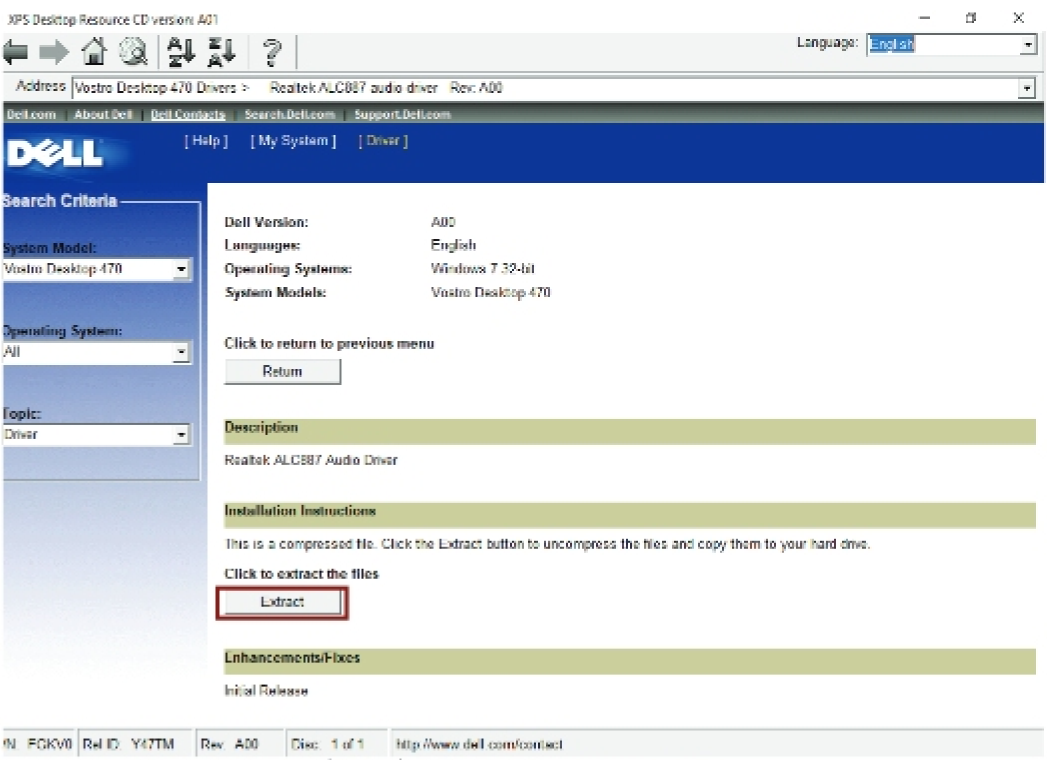

সাউন্ড ড্রাইভার এর Extract ডায়ালগ বক্স

৫.Continueএ ক্লিক করো।

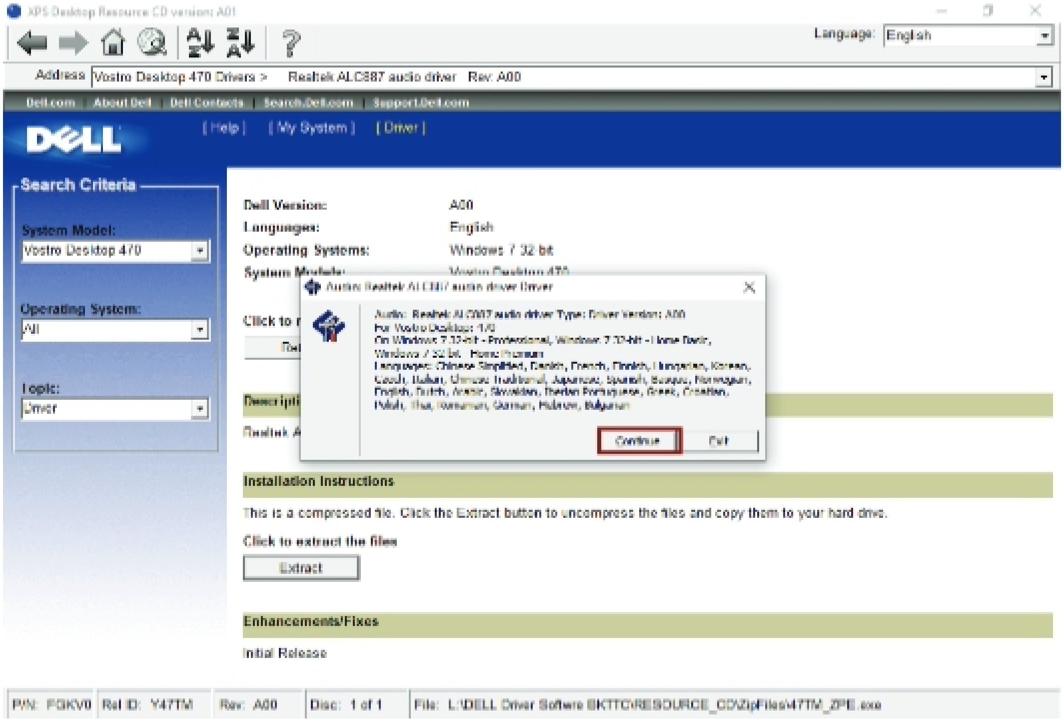

সাউন্ড ড্রাইভার এর Continue ডায়ালগ বক্স

৬. OK এ ক্লিক করো।

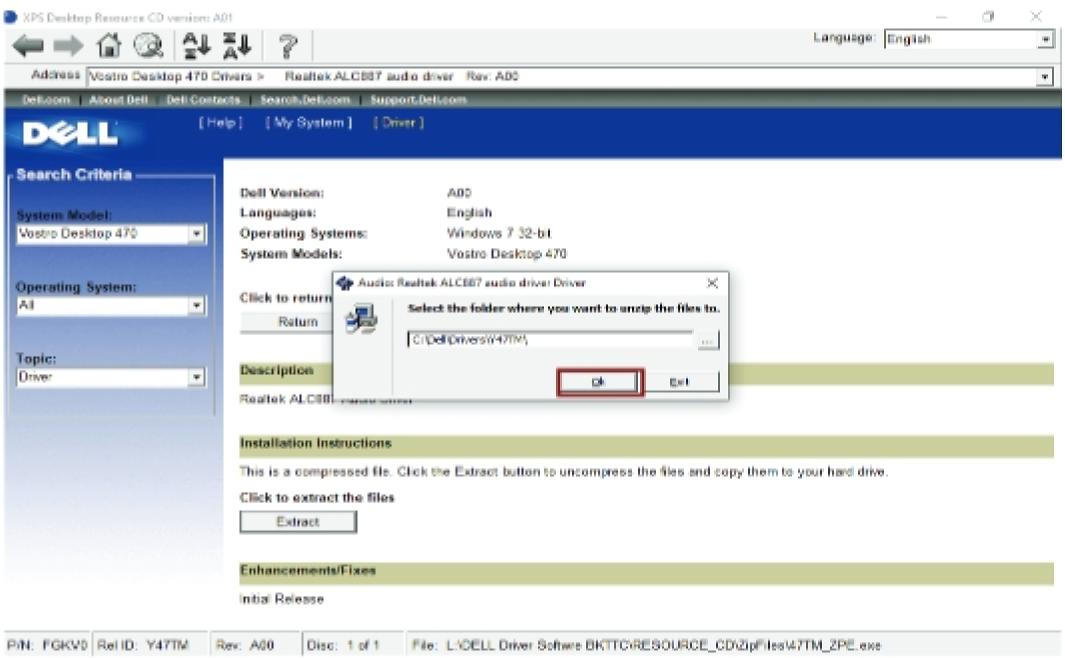

সাউন্ড ড্রাইভার এর OK ডায়ালগ বক্স

৭. Yesএ ক্লিক করো।

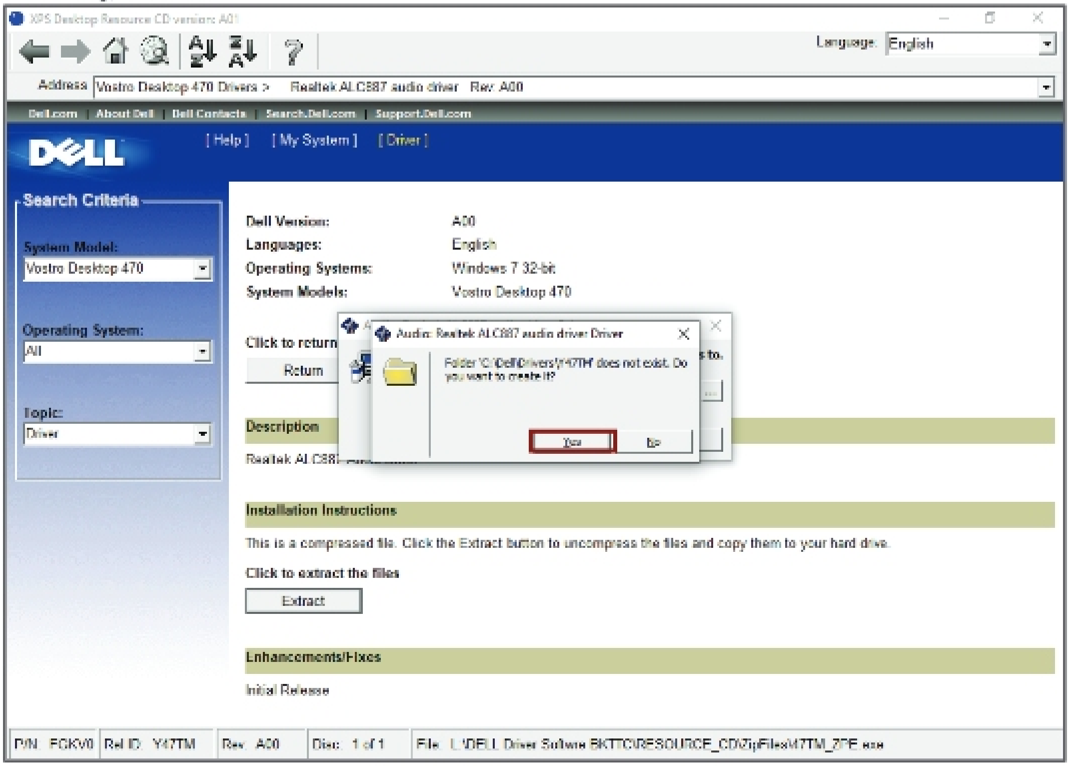

সাউন্ড ড্রাইভার এর Yes ডায়ালগ বক্স

৮. OKএ ক্লিক করো।

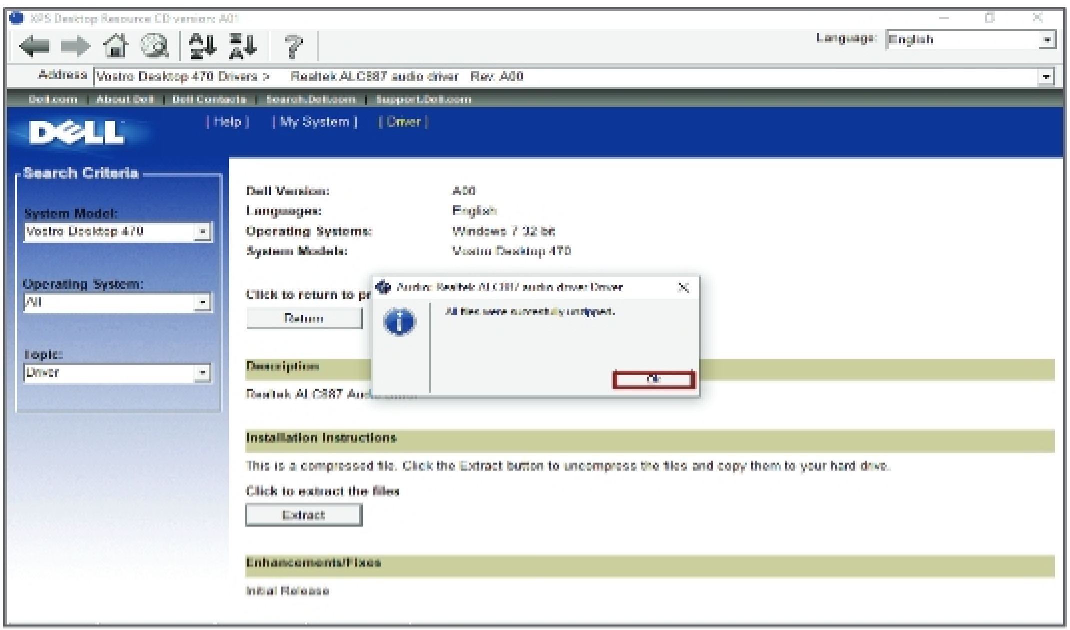

সাইন্ড ড্রাইভার এর Ok ডায়ালগ বক্স

কাজ-৩: অফিস এ্যাপ্লিকেশন ২০১০ ইনস্টলেশন

১. অফিস এপ্লিকেশন সফটওয়্যারটি আমরা পেন ড্রাইভ থেকে ইনস্টল করব। সে ক্ষেত্রে পেন ড্রাইভে পূর্ব থেকে সফটওয়্যারটি ব্যাকআপ হিসেবে রাখব। আমরা ইউএসবি পোর্টে পেন ড্রাইভ ইনসার্ট করে পেন ড্রাইভের ড্রাইভ টি অপেন করব। আমাদের পেন ড্রাইভটি দেখা যাচ্ছে।

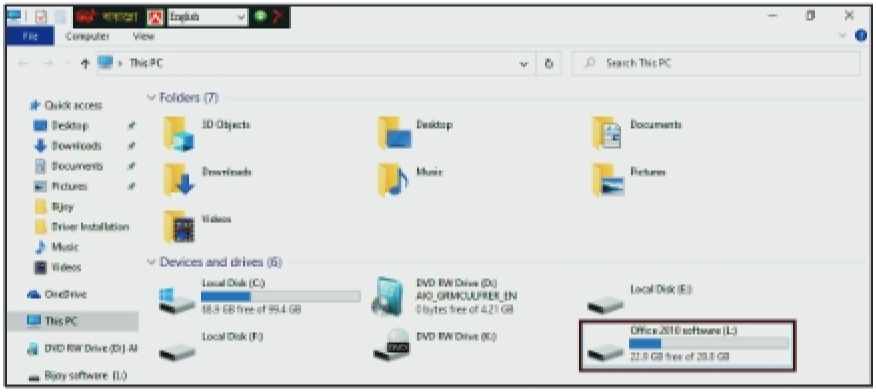

অফিস এ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার জন্য পেন ড্রাইভ ইনসার্ট করা হয়েছে

২. Microsoft Office 2010 ফোল্ডারে ডাবল ক্লিক করো।

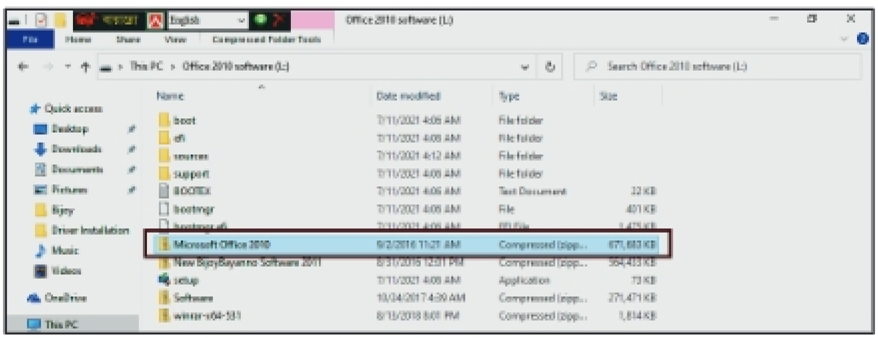

মাইক্রোসফট অফিস ফোল্ডার

৩. সেট আপ ফাইল 14.0.4734.1000_Professional এ ডাবল ক্লিক করো।

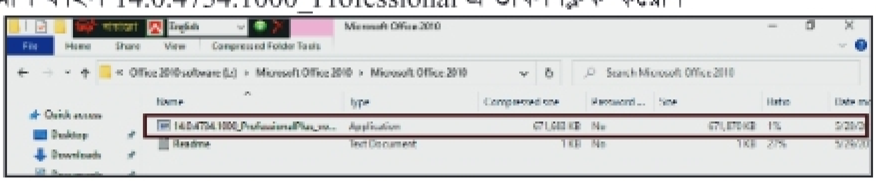

14.0.4734.1000_Professional সেট আপ ফাইল

৪. Extract all এ ক্লিক করো।

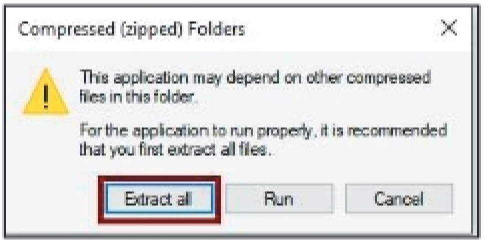

Extract all ডায়ালগ বক্স

৫. Unzip করার জন্য .Extract এ ক্লিক করো।

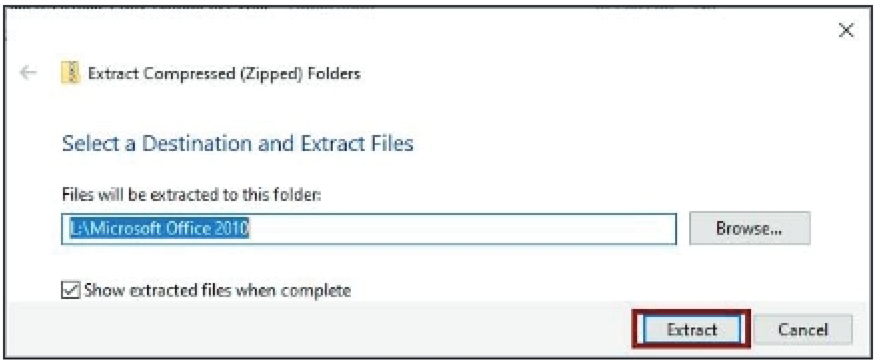

ফাইল Unzip

৬. আনজিপকৃত ইনস্টল সেটআপ ফাইল 14.04734.1000_Professional_Volume এ ডাবল ক্লিক করো।

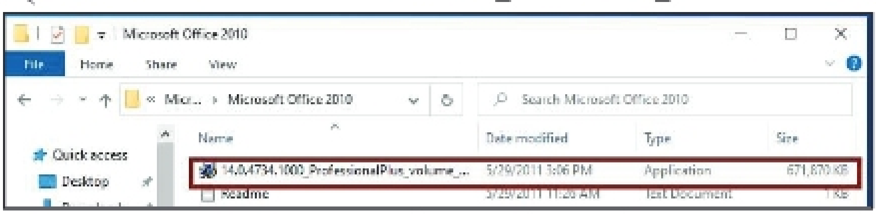

৭. I accept the terms of the Agreement আনজিপকৃত সেটআপ ফাইল

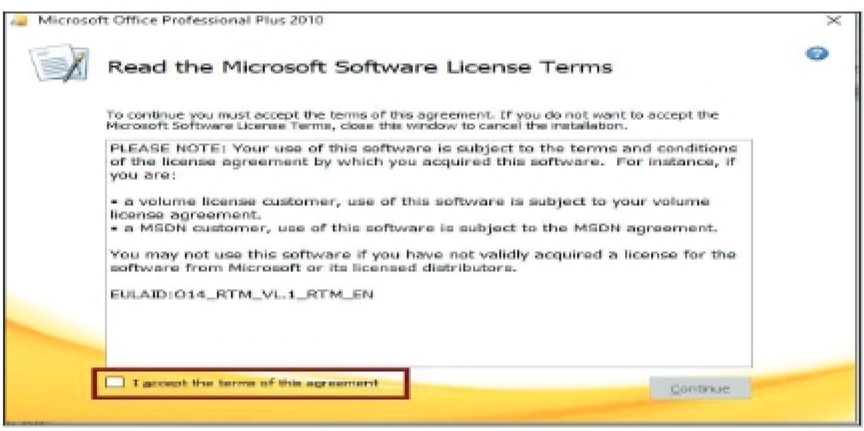

২০২৪

৮. Install এ ক্লিক করো।

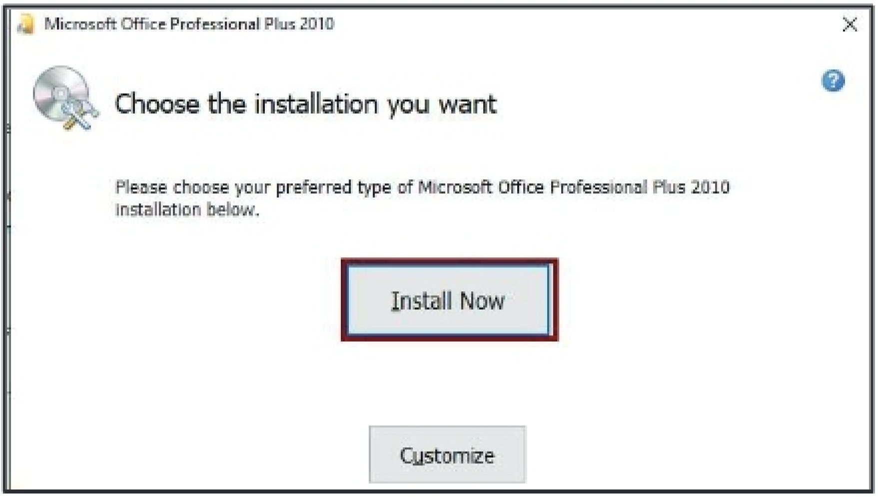

ইনস্টল ডায়ালগ বক্স

৯. Close এ ক্লিক করো।

ক্লজ ডায়ালগ বক্স

১০. Dont's make changes এ ক্লিক করে OK তে ক্লিক করো।

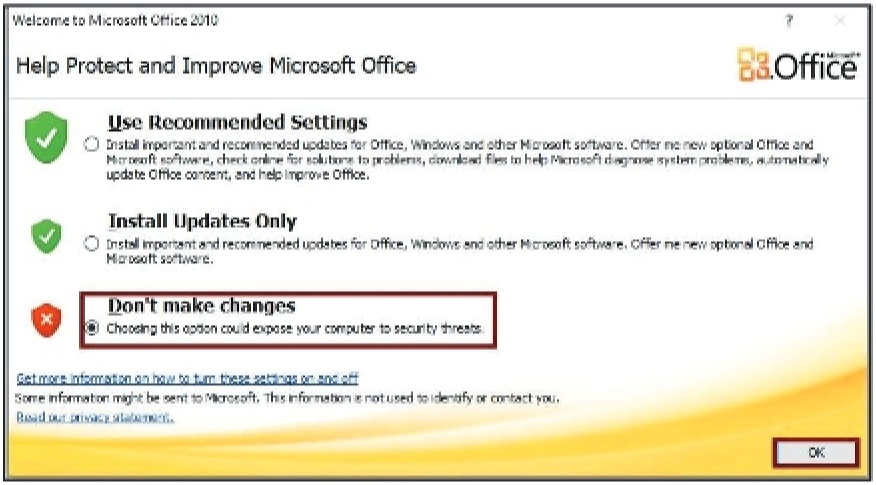

Dont's make changes ডায়ালগ বক্স

কাজ-৪: বাংলা বিজয় সফটওয়্যার ইনস্টলেশন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের ব্যবহৃত কম্পিউটার তাদের নিজের ভাষায় পরিচালনা করা হয়। তাদের অপারেটিং সিস্টেম তাদের ভাষায় লেখা হয়। ঐ সকল দেশে যাবতীয় ডায়ালগ বক্স তাদের নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করা হয়। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত আমরা ইংরেজী ভাষার অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করছি। আমাদের সরকারি ভাষা বাংলা তাই কম্পিউটারে বাংলায় চিঠিপত্র তৈরি করার জন্য বাংলা লেখা অত্যবশ্যকীয়। সে জন্য আমরা আমাদের ব্যবহৃত কম্পিউটারে বাংলা সফটওয়্যার ইনস্টল করি। আজকে আমরা বাংলাদেশে ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় সফটওয়্যা বিজয় ২০১১ ইনস্টল করার কৌশল দেখাব। তোমরা ইচ্ছা করলে অন্য যে কোন বাংলা ইন্টারফেস তোমাদের সুবিধা মতো ইনস্টল করে নিতে পারো।

১. আমারা যে সফটওয়্যারটি ইনস্টল করব তা একটি পেন ড্রাইভে আছে। আমারা পেন ড্রাইভটিকে ইউএসবি পোর্টে ইনস্টল করা পর নিম্নে চিত্রের ন্যায় একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। আমারা ডাবল ক্লিক করে পেন ড্রাইভটি অপেন করব।

বিজয় সফটওয়্যার পেন ড্রাইভে ব্যাকআপ

২. পেন ড্রাইভ অপেন করে New Bijoy Bayanno Softwar 2011 এ ডাবল ক্লিক করে ওপেন করব।

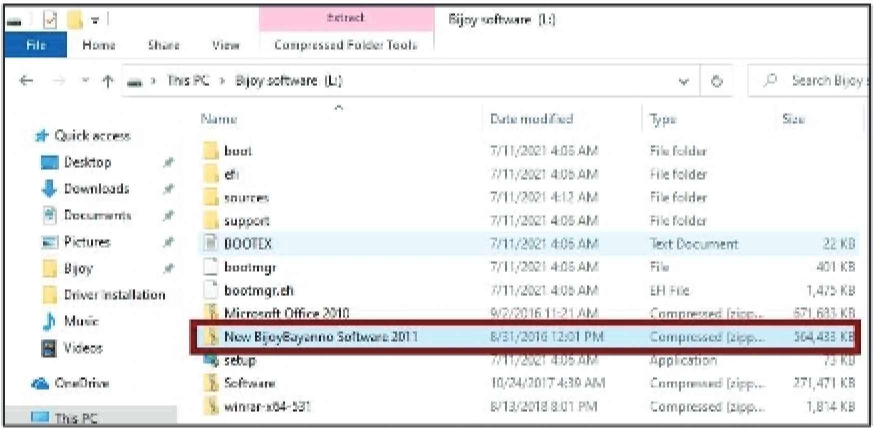

বিজয় সফটওয়্যার ফোল্ডার

৩. fscommand Folder টি ওপেন করব

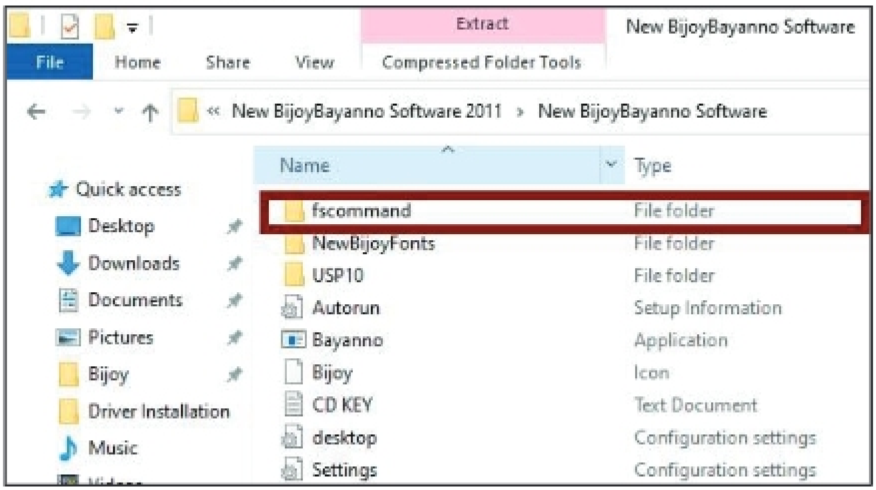

fscommand Folder ফোল্ডার

৪. BijoyBayanno ফাইলটি ওপেন করব

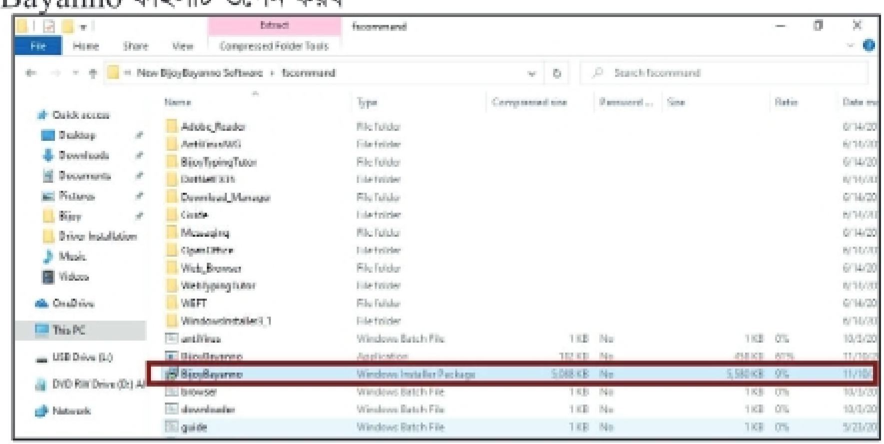

BijoyBayanno ফাইল

৫. Next এ ক্লিক করব

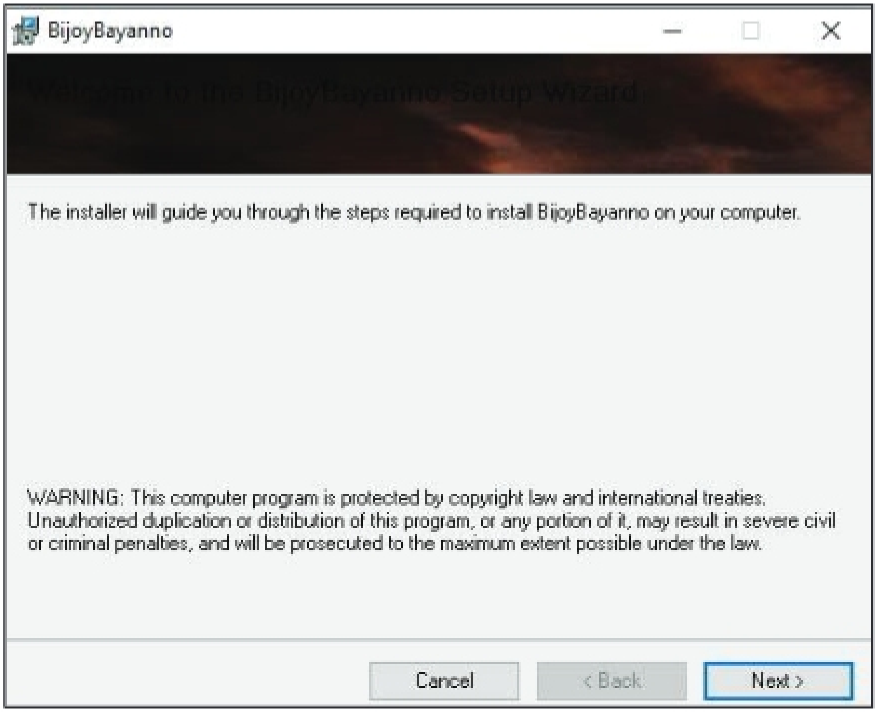

Next ডায়ালগ বক্স

৬. Everyone ও Next এ ক্লিক করব

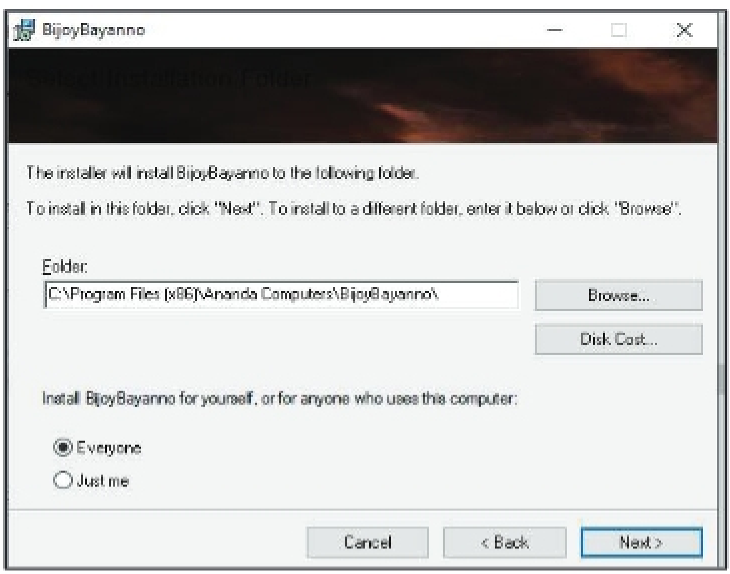

Everyone ডায়ালগ বক্স

৭. I Agree ও Next এ ক্লিক করব

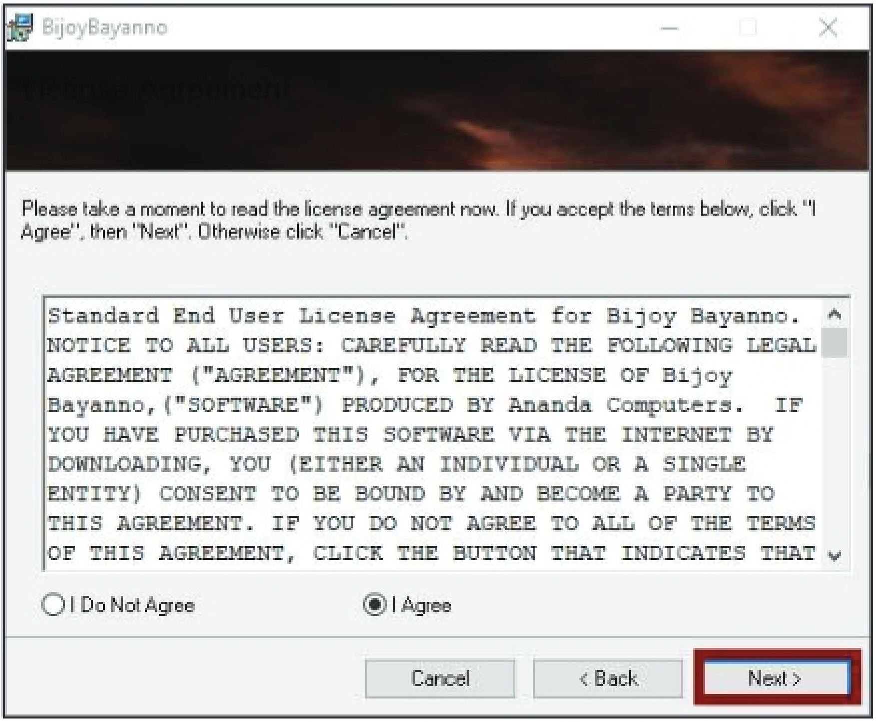

I Agree ও Next ডায়ালগ বক্স

৮. Next এ ক্লিক করব

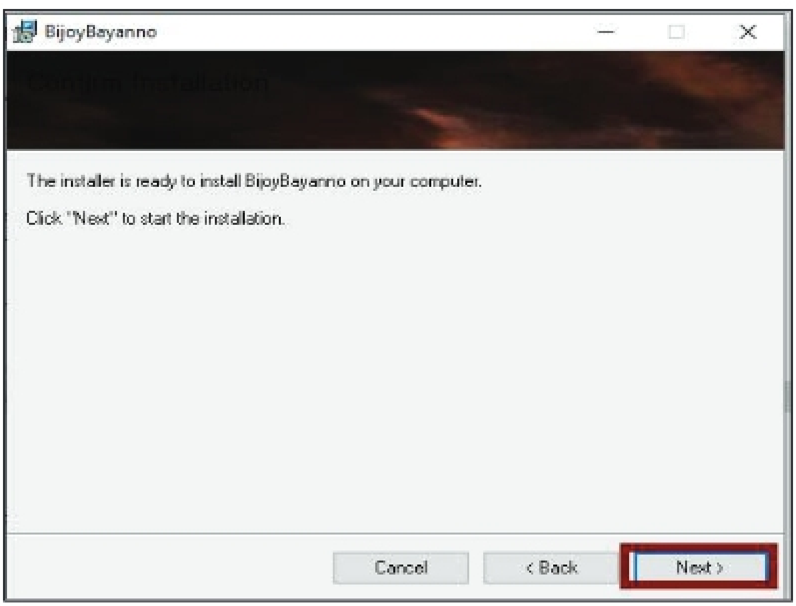

I Agree ও Next ডায়ালগ বক্স

৯. Close এক্লিক করব

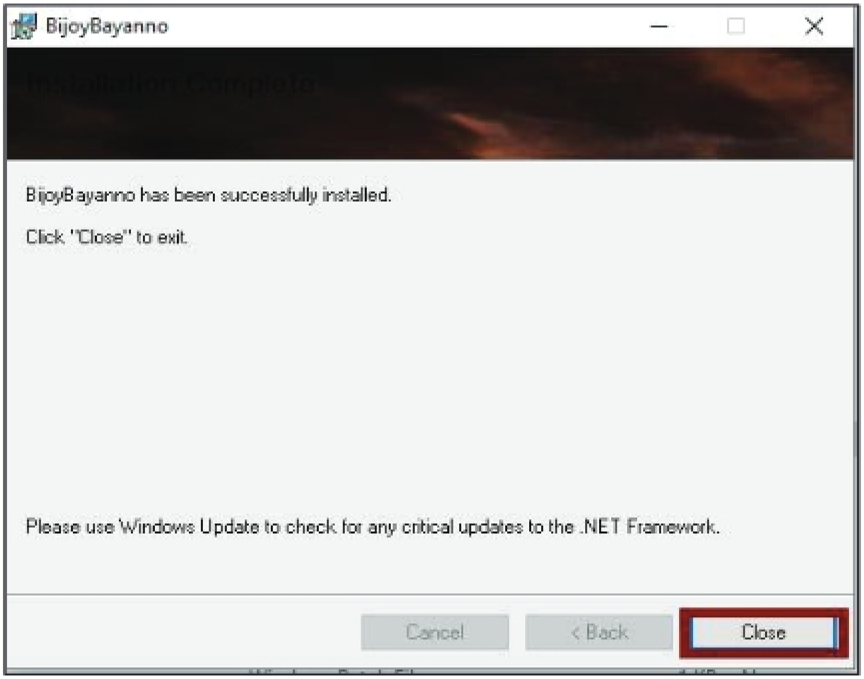

Close ডায়ালগ বক্স

১০. অ্যাকটিভেশন কোড (যেখান থেকে সফটওয়্যার সংগ্রহ করবে সেখান থেকেই অ্যাকটিভেশন কোড সংগ্রহ করবে) টাইপ করে Activate এক্লিক করবে।

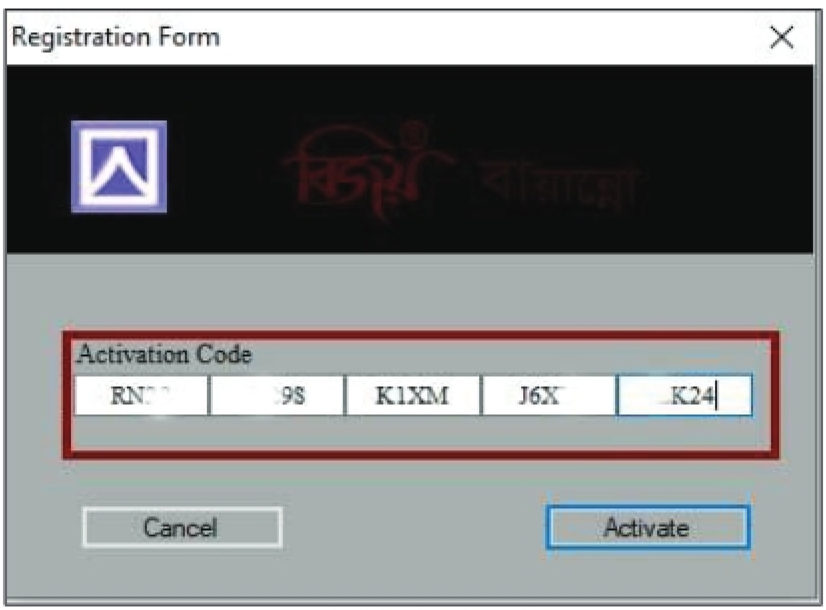

Activate ডায়ালগ বক্স

অনুশীলনী-৪

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। IBM এর পূর্ণরূপ লেখ।
২। OS এর পূর্ণরূপ লেখ।
৩। সফটওয়্যার প্রধানত কয় প্রকার?
৪। সিস্টেম সফটওয়্যার কয় প্রকার?
৫। বায়োস প্রোগ্রাম কোথায় থাকে?
৬। ইন্টারফেস ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম কয় প্রকার?
৭। বুটিং কয় প্রকার?
৮। পার্টিশন কয় প্রকার ও কী কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। অপারেটিং সিস্টেম কাকে কী?
২। কম্পিউটার পরিচালনার সময় কি কি স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে।
৩। ব্যাকআপ রাখার প্রয়োজনীয়তা কী?
৪। ফার্মওয়্যার কী?
৫। অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্ব আলোচনা করো।
৬। ফাইল ম্যানেজমেন্ট কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। টাস্কম্যানেজমেন্ট কী?
২। মাল্টিপ্রসেসিং ও মাল্টিপ্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেমের পার্থক্য কী?
৩। চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম কী?
৪। বুটিং কী? বুটিং কত প্রকার ও কী কী?
৫। ইউন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার প্রধান ধাপগুলো/স্টেপগুলো লেখ।
৬। অ্যাকটিভেশন কী কেন প্রয়োজন?
৭। ড্রাইভার সফটওয়্যার কী?
৮। সেটআপ ফাইল কেন প্রয়োজন?
৯। অফিস ২০১০ এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রধান ধাপগুলো লেখ।
১০। বিজয় বাংলা সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রধান ধাপগুলো লেখ।

আইটি সাপোর্ট ও আইওটি বেসিকস-১

IT Support & IoT Basics-1

দ্বিতীয় পত্র

দশম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৮৮২৩

২০২৪

প্রথম অধ্যায়

কম্পিউটার পেরিফেরালস বেসিকস

Computer Peripherals Basics

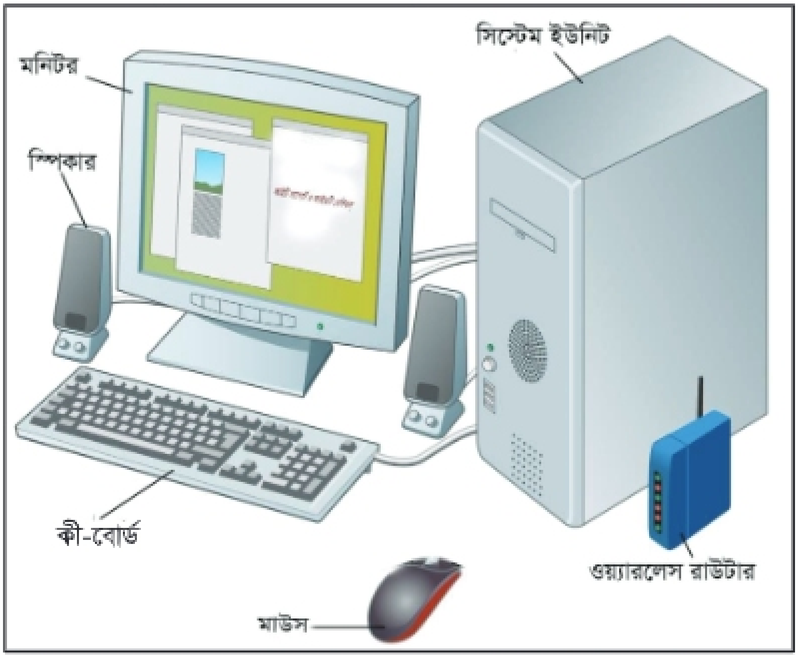

কম্পিউটারে আমারা নানাবিধ কাজ করে থাকি। যেমন–চিঠি পত্র লিখি, কেউ ছবি আঁকি, কেউ বাড়ির নকশা তৈরি করি। এ সকল কাজ করার পর এগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। সে জন্য আমরা প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্ট করে থাকি। আবার তুমি হয়তো খেয়াল করেছ স্ক্যানার দিয়ে আমরা আমাদের ছবি স্ক্যান করে কম্পিউটারে জমা রাখি। কখনও কখনও তোমরা তোমাদের মোবাইল ফোন দিয়ে ছবি তুলে অথবা ভিডিও করে তা কম্পিউটারে জমা রাখ। এভাবে প্রতিদিন আমরা কম্পিউটারে অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস সংযোগ করে কম্পিউটারের কাজের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করছি। ফলে কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেরিফেরালস কম্পিউটার সিস্টেমের অংশ নয়, কিন্তু এটি কম্পিউটারের সহায়ক ডিভাইস হিসেবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যাবশকীয় আবার ক্ষেত্র বিশেষে অতি প্রয়োজনীয়।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- কম্পিউটারের পেরিফেরালসমূহ সিস্টেমের সাথে সংযোগ করতে পারব।
- বিভিন্ন ধরনের আইও পোর্ট এবং বিল্ট ইন কার্ডসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- পোর্ট ও কার্ডসমুহের কার্যকারিতা সচল ও বন্ধ করতে পারব।
- পেরিফেরাল ডিভাইসসমূহের ড্রাইভার সফটওইয়্যার ইনস্টল করতে পারব।

উপরোক্ত শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা একটি জব সম্পন্ন করব। জবের মাধ্যমে প্রিন্টার ইনস্টল, স্ক্যানার ইনস্টলে দক্ষতা অর্জন করব এবং জবটি সম্পন্ন করার পূর্বে প্রথমেই প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

৫.১ কম্পিউটার পেরিফেরাল সংযোগের জন্য ব্যবহৃত পোর্টসমূহ-

পেরিফেরালস : মানুষের মস্তিস্কের নির্দেশে আমাদের একটি অংগ একটি নির্দিষ্ট কাজ করে থাকে। যেমন– চোখ দিয়ে দেখা, কান দিয়ে শুনা, হাত দিয়ে কাজ করা, পা দিয়ে হাঁটা। আমরা যদি মানুষের মস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করি তাহলে আমাদের চোখ, কান, হাত, পা হলো এক একটি পেরিফেরালস। সুতারাং, "পেরিফেরালস হলো–কম্পিউটারের এমন যন্ত্রপাতি বা ডিভাইস যা কম্পিউটারের বিভিন্ন স্লটে বা পোর্টে সংযোগ করে চাহিদা মতো কাজ করা যায়"।

মনিটর, কীবোর্ড, মাউস, স্পিকার, রাউটার এক একটি পেরিফেরালস। পেরিফেরালস ছাড়া কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ একক ক্ষমতায় কার্য সম্পাদন করতে পারে না। এটি শুধু নির্দেশ দিতে পারে। পেরিফেরালস এর সাহায্য নিয়ে সিপিইউ কার্য সম্পাদন করতে পারে। কোন একটি কম্পিউটার সিস্টেমের প্রায় আশি শতাংশই পেরিফেরাল ডিভাইস আর বিশ শতাংশ হলো সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট ও তৎসম্পর্কিত হার্ডওয়্যার। কম্পিউটারের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এগুলোর ব্যবহার বেড়ে চলেছে।

পেরিফেরালস এর শ্রেণি বিভাগ

কার্যাবলীর প্রেক্ষাপটে কম্পিউটার পেরিফেরালসকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

০১. ইনপুট ডিভাইস
০২. আউটপুট ডিভাইস
০৩. স্টোরেজ ডিভাইস

ইনপুট ডিভাইস: ইনপুট ডিভইসের সাহায্যে ইউজার কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং প্রয়োজনীয় ডাটা ও নির্দেশ কম্পিউটারের অভ্যান্তরে প্রদান করে। পেরিফেরাল ব্যবস্থার অর্ন্তভূক্ত যে সকল ডিভাইসের সাহায্যে কম্পিউটার নির্দেশ ও উপাত্ত গ্রহণ করে সে সকল ডিভাইসকে ইনপুট ডিভাইস বলে।

ইনপুট ডিভাইস এর তালিকা:

১। কী-বোর্ড	২। মাউস	৩। স্ক্যানার
৪। জয়স্টিক	৫। ডিজিটাল ক্যামেরা	৬। অপটিক্যাল ক্যারেকটার রিডার
৭। পাঞ্চ কার্ড রিডার	৮। ট্র্যাক বল	৯। অপটিক্যাল মার্ক রিডার
১০। লাইট পেন		

এ সকল পেরিফেরালস ডিভাইসগুলো ডাটা ও নির্দেশ প্রদানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কম্পিউটার সিস্টেমে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পেরিফেরাল ডিভাইস। এগুলোর সাহায্যে কম্পিউটার বর্হিজগত হতে উপাত্ত আহরণ করে।

ইনপুট পেরিফেরালস এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে ইনপুট ডিভাইসটি আবিষ্কার হয় এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় সেটি হলো কী-বোর্ড।

আউটপুট পেরিফেরালস ডিভাইস

আউটপুট ডিভাইস প্রক্রিয়াকরণের পর প্রাপ্ত ফলাফল কে ইউজারের বোধগম্য গঠনে রূপান্তরিত করে। এ সমস্ত ডিভাইসের সাহায্যেই কম্পিউটার কর্তৃক কোন একটি কার্যের সম্পাদন সম্পূর্ণ ও সফল ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পর প্রাপ্ত ফলাফলকে কম্পিউটার তার পেরিফেরাল ব্যবস্থার অর্ন্তভূক্ত যে সকল ডিভাইসের সাহায্যে কম্পিউটার থেকে বাহিরে বর্হিজগতে প্রেরণ করে সে সকল ডিভাইসকে আউটপুট ডিভাইস বলে।

আউপুট ডিভাইসের তালিকা

১। প্রিন্টার
২। প্রজেক্টর
৩। মনিটর
৪। প্লটার

আউটপুট ডিভাইসের সাহায্যে কম্পিউটারের আউটপুটে প্রাপ্ত ফলাফলকে স্থায়ী লিপি (হার্ড কপি) ও অস্থায়ী লিপি (সফট কপি) হিসেবে প্রকাশ করতে পারে। এগুলোর সাহায্যেই কম্পিউটার ফলাফলকে বহির্জগতে প্রেরণ করে।

প্রিন্টার এবং প্লটার আউটপুট ডিভাইসের সাহায্যে আউটপুটে প্রাপ্ত ফলাফলকে স্থায়ী লিপি আকারে প্রকাশ করা হয়। প্রিন্টারের সাহায্যে কাগজে ছাপানো ফলাফল হলো স্থায়ী লিপি তথা হার্ড কপির একটি উদাহরণ। কারণ এখানে ফলাফল কাগজে স্থায়ী ভাবে সংরক্ষিত থাকে। টিভি পর্দা বা মনিটরের ন্যায় আউটপুট ডিভাইসের সাহয্যে আউটপুটে প্রাপ্ত ফলাফলকে অস্থায়ী লিপি আকারে প্রকাশ করা হয়। চালু অবস্থায় মনিটরে পর্দায় প্রদর্শিত ফলাফল হলো অস্থায়ী লিপি তথা সফট কপির একটি উদাহরণ।

আমাদেরকে প্রতিনিয়ত পেরিফেরালসমূহ সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন হয়। কখনও আমরা প্রিন্টার সংযোগ করি আবার প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন করি। আবার স্ক্যানার সংযোগ/বিচ্ছিন্ন করারপ্রয়োজন হয়।

৫.২ আই/ও (I/O) পোর্ট

সিরিয়াল পোর্টঃ কম্পিউটারের পোর্ট হল এক ধরনের সংযোগ স্থল। কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের সাথে কীবোর্ড, মাউস, স্পিকার, স্ক্যানার ইত্যাদি যন্ত্রের সংযোগস্থল থাকে। এ সকল সংযোগস্থলকে পোর্ট বলে। এ সমস্ত সংযোগ সাধারণত প্লাগযুক্ত অথবা সকেটযুক্ত ক্যাবলের সাহায্যে সিস্টেম ইউনিট এর পিছনে অথবা সামনে সংযোগ দিতে হয়।

চিত্র ৫.১ : সকেট ও প্লাগ

স্থল

খেয়াল করলে দেখা যাবে বাসা বাড়িতে আমরা ইলেকট্রিক্যাল সকেটের মধ্যে প্লাগ প্রবেশ করিয়ে কাজ করি। যেমন তুমি যখন কাপড় আয়রন করবে,তখন তুমি আয়রনএর প্লাগটি সকেটে প্রবেশ করিয়ে কাজ আয়রন করে থাকো। চিত্রে খেয়াল কর,সকেট ও প্লাগ একটি জায়গায় সংযোগ হচ্ছে এ সংযোগ স্থানটিকে পোর্ট এর সাথে তুলনা করা যায়। কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের পোর্ট ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারের মধ্যে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডাটা আদান প্রদান হয় দুটি পদ্ধতিতে। একটি সিরিয়াল পদ্ধতি অন্যটি প্যারালাল পদ্ধতি। যেসকল পোর্টের মাধ্যমে ডাটা সিরিয়ালি বাহিরের ডিভাইস থেকে সিপিইউ ও সিপিইউ থেকে ডাটা সিরিয়ালি বাহিরের ডিভাইসে আদান প্রদান হয় তাকে সিরিয়াল পোর্ট বলে। কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরণের সিরিয়াল পোর্ট ব্যবহার করা হয় যেমন- RS-232, একটি সিরিয়াল পোর্ট। এটি কম্পিউটার এ সিরিয়াল ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ পোর্ট টি কম্পিউটারের এমন একটি পোর্ট যেখানে এক্সটারনাল মডেম, মাউস, এক্সটারনাল মেমোরি, পিএলসি এবং শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ইকুইপমেন্ট সংযোগ করা হয়। ষাট এর দশকে এ পোর্টটি আবিষ্কৃত হয়। বিট বাই বিট পদ্ধতিতে ইহা টার্মিনালে ডাটা ট্রান্সফার করে থাকে।

DE9 অনুরূপ একটি সিরিয়ালপোর্ট ইহাকে COM port বা কমিউনিকেশন পোর্ট বলা হয়। এ পোর্টে নয়টি পিন থাকে।

চিত্র ৫.২: সিরিয়াল পোর্ট

DB-25/প্যারালাল পোর্ট

যে পোর্ট কম্পিউটারের টার্মিনালে প্যারালালি ডাটা ট্রান্সফার করে তাকে প্যারালাল পোর্ট বলে। DB-25 বহুল ব্যবহৃত একটি প্যারালাল পোর্ট। এ পোর্টটিতে দুই সারিতে পঁচিশটি হোল থাকে।প্রথম সারিতে তেরটি ও দ্বিতীয় সারিতে বারটি হোল থাকে। প্রিন্টার ও স্ক্যানার এ পোর্টে সংযোগ করা হয়। বর্তমানে এ পোর্টটির পরিবর্তে ইউএসবি পোর্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে পুরাতন কিছু মেশিন এখনও এ পোর্টে সংযোগ করা হয়। এ পোর্টটির অবস্থান মাদার বোর্ডের ব্যাক সাইডে হয়।

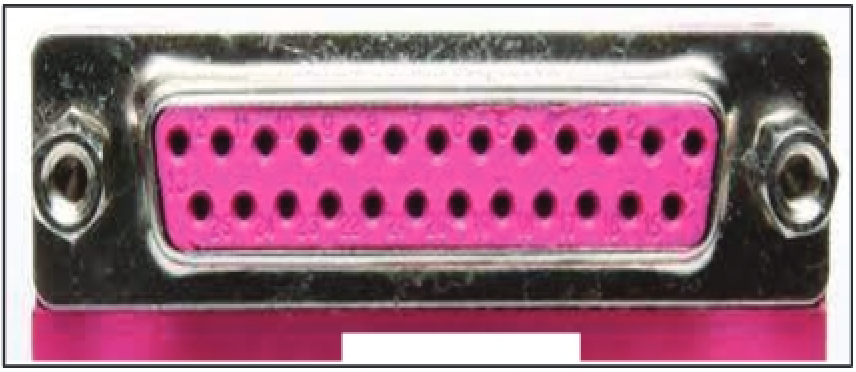

চিত্র ৫.৩: প্যারালাল পোর্ট

পিএস-২ (Personal System-2) পোর্ট: পিএস-২ পোর্ট হলো ৬ হোল বিশিষ্ট একটি মিনি DIN কানেক্টর যার সাথে একটিতে কম্পিউটারের কীবোর্ড ও অন্যটিতে মাউস লাগানো হয়। এটি আইবিএম কম্পিউটারে ১৯৮৭ সনে ব্যবহার করা হয়। তবে কিছু পিএস/২ পোর্ট আছে যেখানে একই পোর্টে মাউস ও কীবোর্ড লাগানো যায়। এ পোর্টটি মুলত DE-9 RS-232 সিরিয়াল পোর্টকে কনভার্ট করে তৈরি করা হয়েছে। চিত্রে প্রদর্শিত বেগুনি রং বিশিষ্ট পোর্টে কীবোর্ড ও সবুজ রং বিশিষ্ট পোর্টে মাউস সংযোগ দেয়া হয়।

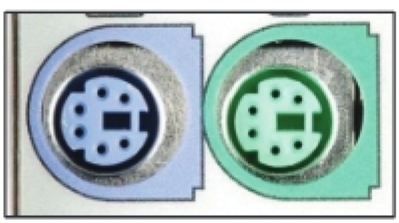

চিত্র ৫.৪: পিএস/২ পোর্ট

ডিসপ্লে পোর্ট: যে পোর্টে কম্পিউটারের আউটপুট দেখার জন্য মনিটর অথবা প্রজেক্টর লাগানো হয়। তাকে ডিসপ্লে পোর্ট বলে। কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের ডিসপ্লে পোর্ট আছে। নিম্নে কয়েকটি ডিসপ্লে পোর্ট এর আলোচনা করা হলো।

ভিজিএ (VGA-Video Graphics Array/Adapter) /এসভিজিএ (SVGA- Super Video Graphics Array/Adapter) /মিনি ভিজিএ : এ পোর্ট তিনটি মুলত ডিসপ্লে ইউনিট যেমন মনিটর অথবা প্রজেক্টর সংযোগ দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানে ভিজিএ/এসভিজিএ/ মিনি ভিজিএ হলো গ্রাফিক্স কার্ডের নাম। এ গ্রাফিক্স কার্ডগুলোর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু মূল কাজ হলো সিপিইউ এর প্রসেসকৃত ফলাফল মনিটর অথবা প্রজেক্টরে ডিসপ্লে করা।

চিত্র ৫.৫: ভিজিএ পোর্ট

ডিভিআই (DVI-Digital Visual Interface): ডিভিআই পোর্টে মনিটর ও প্রোজেক্টর সংযোগ দেয়া হয়। এটি গ্রাফিক্স কার্ডের আউটপুট পোর্ট। বর্তমানে এ পোর্টটি ওব্যবহৃত হয়ে থাকে।

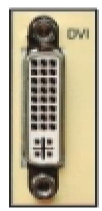

চিত্র: ডিভিআই পোর্ট

চিত্র: ৫.৬ বিভিন্ন আকারের ডিভিআই পোর্ট

চিত্র ৫.৭: মিনিডিসপ্লে পোর্ট

চিত্র ৫.৮: এইচডিএমআই পোর্ট

চিত্র ৫.৯: এসভিডিও পোর্ট

ইউএসবি পোর্ট

ইউএসবি (USB-Universal Serial Bus) বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি পোর্ট। বর্তমানের আমরা প্রিন্টার, পেন ড্রাইভ, এক্সটারনাল ডিভিডি, এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ, স্ক্যানার, স্পিকার, কী বোর্ড, মাউস,মডেম ইত্যাদি সংযোগ করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের ইউএসবি পোর্ট রয়েছে। নিম্নে সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ইউএসবি-এ

এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ইউএসবি পোর্ট যা প্রায় প্রতিটি ইউএসবি পোর্টের এক মাথায় পাওয়া যায়। একটি আয়াতাকার সংযোগকারী পোর্ট যা কেবল এক উপায়ে পোর্টের মধ্যে সংযোগ করা হয়।। কার্যত প্রতিটি ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটারে কয়েকটি ইউএসবি-এ পোর্ট দেখা যায়।

ইউএসবি-বি

এ ইউএসবি পোর্টটি বর্গাকৃতির থাকে তবে সম্পূর্ণ বর্গাকৃতির নয়। এ পোর্টটি আমরা প্রিন্টার ও স্ক্যানার সংযোগের জন্য ব্যবহার করি।

ইউএসবি মিনি-বি

এ পোর্টটি বর্গাকৃতির। তবে কোনটি ৪পিন ও কোনটি ৫ পিন বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এ পোর্টের সাথে ডিজিটাল ক্যামেরা এমপি ৩ প্লেয়ার মোবাইল ফোন ইত্যাদি সংযোগ করা হয়।

চিত্র৫.১০: ইউএসবি এ পোর্ট

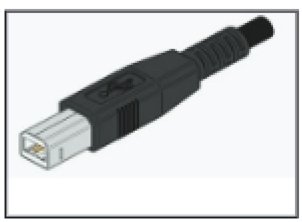
চিত্র৫.১১: ইউএসবি বি পোর্ট

চিত্র: ৫.১২ ইউএসবি মিনি পোর্ট

ইউএসবি মাইক্রো

পোর্ট এটি একটি ক্ষুদ্র সংযোগকারঅ পোর্ট যা পোর্টেবল ডিভাইসের জন্য জনপ্রিয়। অ্যানরয়েড ফোন, বাহ্যিক ব্যাটারি, ব্লুটুথ হেড ফোন এ এটি ব্যবহার করা হয়।

ইউএসবি-সিপোর্ট:এটি ছোট, পাতলা এবং হালকা ডিভাইসগুলোকে সংযোগ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।এটি স্মার্ট ফোন এ ব্যবহার করা হয়। অনেক নতুন ল্যাপটপে RJ-45 ইথারনেট পোর্ট সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এটি বর্তমানে ভিডিও, নেটওয়ার্ক, ডেটা স্থানান্তর এবং চার্জিং এর জন্য একমাত্র পোর্ট হিসেবে কাজ করে। এ পোর্টের মাধ্যমে ল্যাপটপ বা কম্পিউটারকে মনিটর বা প্রজেক্টরের সাথে সংযোগ করা যায়। বর্তমানে এটি বহুল ব্যবহৃত ইউএসবি পোর্ট।

ইথারনেট পোর্ট (RJ-45): RJ-45 (Registerd Jack-45) একটি নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন পোর্ট যা নেটওয়ার্ক সুইচ, রাউচার হাব, নেটওয়ার্ক কার্ডে থাক। এটি ৮ পিন বিশিষ্ট একটি পোর্ট যা সিরিয়াল কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ৫.১৩ : ইউএসবি মাইক্রো

চিত্র৫.১৪: ইউএসবি সি পোর্ট

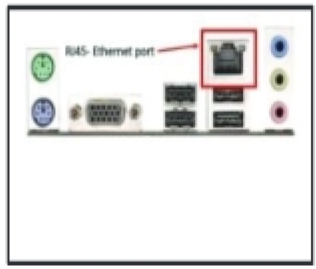

চিত্র৫.১৫: RJ-45 পোর্ট

ইথারনেট পোর্ট (RJ-11): RJ-11 (Registerd Jack-11) একটি নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন পোর্ট ইন্টারনাল অথবা এক্সটারনাল মডেমে থাকে। এটি 4 পিন বিশিষ্ট একটি পোর্ট যা সিরিয়াল কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। টেলিফোন জ্যাক হিসেবে এটি বেশি পরিচিত। টেলিফোন সেটে যে জ্যাকটি থাকে সেটি হলো আরজে ১১।

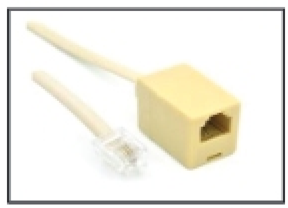

চিত্র ৫.১৬: RJ-11 পোর্ট

ইএসএটিএ (eSATA-External Serial Advanced Technology Attachment): এ পোর্টটির অবস্থান মাদার বোর্ড ও হার্ড ড্রাইভ অথবা অপটিক্যাল ড্রাইভে। হার্ড ডিস্ক ও অপটিক্যাল ড্রাইভকে মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ করার জন্য এ পোর্ট ব্যবহার করা হয়। এটি ফায়ারওয়্যার থেকে দ্রুত গতিতে ডাটা ট্রান্সমিট করতে পারে।

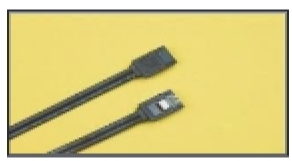

চিত্র৫.১৭: ইএসএটিএ পোর্ট

ফায়ারওয়ার: ফায়ারওয়্যার ডিজটাল ডিভাইসগুলির মধ্যে বিশেষত অডিও এবং ভিডিও ডিভাইসের মধ্যে তথ্য স্থানান্তরিত করার একটি পদ্ধতি। IEEE 1934 হিসেবে এটি পরিচিত। তুমি ইচ্ছা করতে ৬৩টি ডিভাইস এ ফায়ারওয়্যারের সাথে সংযোগ করতে পার। যা অন্য কোথাও সম্ভব নয়। ফায়ারওয়্যারটি প্লাগ এন্ড প্লে হিসেবে কাজ করে।

অপটিক্যাল অডিও পোর্ট: অ্যাপল ডেক্সপট বাস হলো একটি সিরিয়াল বাস। এটির সাথে কীবোর্ড ও মাউস সংযুক্ত করা হয়।

চিত্র ৫.১৮: ilink পোর্ট

চিত্র ৫.১৯: 1394a পোর্ট

চিত্র ৫.২০: 1394b পোর্ট

AT কী বোর্ড: AT (Advanced Technology) কী বোর্ড IBM কম্পিউটারে ব্যবহৃত একটি কী-বোর্ড যা ১৯৮৪ সনে প্রথম আবিষ্কার হয়। এটি ৮০২৮৬০ প্রসেসর মেশিনে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

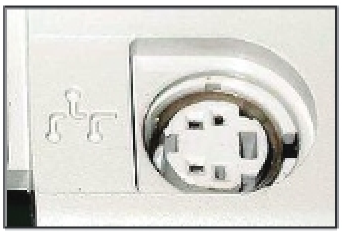

চিত্র ৫.২১: অপটিক্যাল অডিও হোল

চিত্র৫.২২: অপটিক্যাল অডিও পিন

চিত্র ৫.২৩: AT কীবোর্ড পোর্ট

50 pin SCSI-2 : 50 pin SCSI(Small Computer System Interface) একটি প্যারালাল ইন্টারফের যা সরাসরি কম্পিউটার ও পেরিফেরালসের (হার্ড ডিস্ক) মধ্যে ডাটা আদান প্রদান করে।

Centronics পোর্ট : Centronics ৩৬ পিন বিশিষ্ট একটি প্যারালাল পোর্ট যেটি প্রিন্টার সংযোগ দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ৫.২৪: SCSI পোর্ট

F-connector RF/COAX : F-connector RF হলো কোএক্সিয়াল কানেকটর যেটি terrestrial টেলিভিশন, ক্যাবল টেলিভিশন, স্যাটেলাইল টেলিভিশন এ RG-6/U ক্যাবলের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়।

৫.৩ এক্সপানশন স্লট এর কাঠামো, পিন সংখ্যা ও কাজ:

যে সকল স্লটসমুহে বিভিন্ন ধরনের এক্সপানশন কার্ড যেমন– গ্রাফিক্স কার্ড, সাউন্ড কার্ড, টিভি কার্ড, পিসিআই কার্ড ইত্যাদি লাগানো হয় তাকে এক্সপানশন স্লট বলে। কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরণের এক্সপানশ স্লট থাকে। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

PCI (Peripheral Componet Interconnect)স্লট: পিসিআই মাদারবোর্ডে থাকে। এ স্লটে ইন্টারফেস কার্ড বসানোর জন্য দেয়া হয়। পিসিআই ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এ সকল স্লটে সাউন্ড কার্ড, নেটওয়ার্ক কার্ড, মডেম ইত্যাদি বসানো হতো। তবে বর্তমানে কম্পিউটারগুলোতে অন্যান্য আপডেট ইন্টারফেস ব্যবহার করা হয়। এ স্লটটি ৩২ বিট অথবা ৬৪ বিটের হয়ে থাকে।

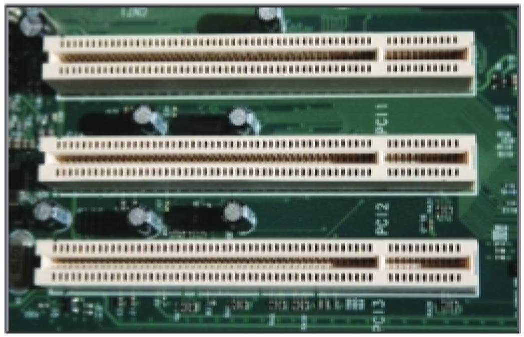

চিত্র ৫.২৫: পিসিআই স্লট

PCI Express (Peripheral Componet Interconnect Express)স্লট: পিসিআই এক্সপ্রেস স্লটগুলো মাদারবোর্ডে থাকে। এ স্লটেও বিভিন্ন ধরনের ইন্টারফেস কার্ড বসানো হয়। এটি বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে যেমন– PCI Express x1, PCI Express x4, PCI Express x8, PCI Express x16 নিচের চিত্রে ভিন্ন সাইজের ও ভিন্ন পিন সংখ্যার পিসিআই স্লটের ছবি দেয়া হলো।

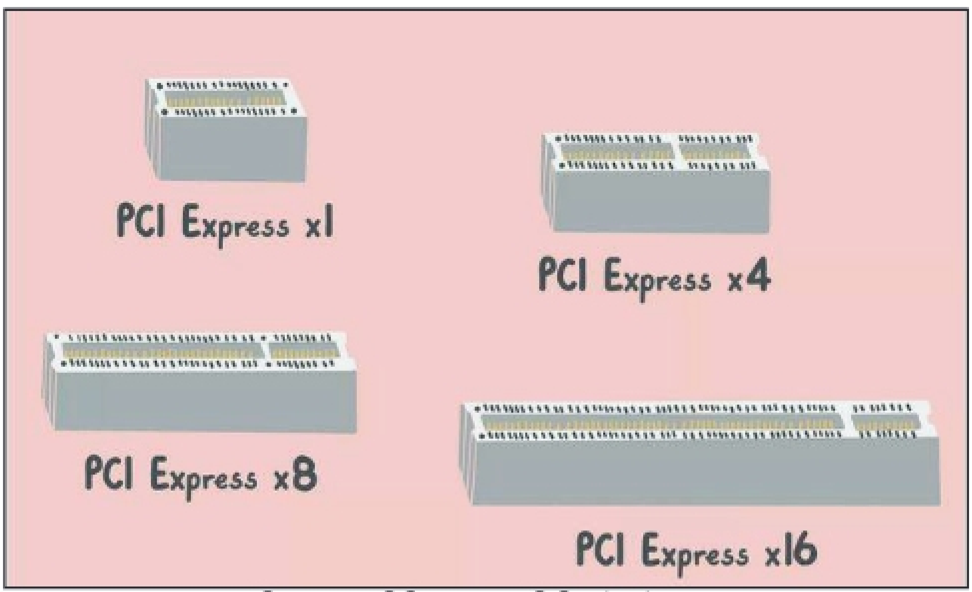

চিত্র ৫.২৬: বিভিন্ন ধরনের পিসিআই স্লট

AGP (Acclerated Graphics Port): এজিপি স্লটে এ্যাকসিলারেটেড গ্রাফিক্স কার্ড বসানো হয়।

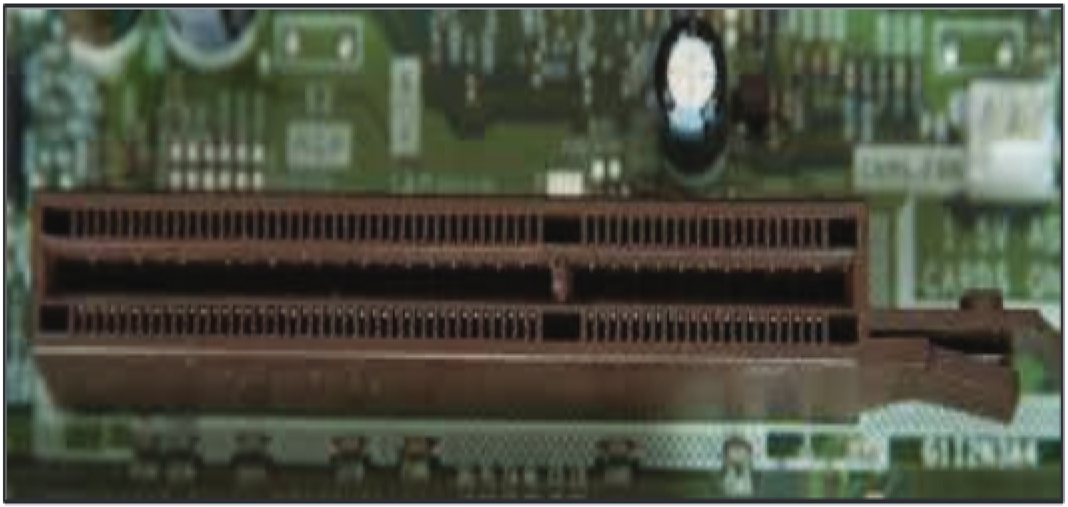

চিত্র ৫.২৭: এজিপি স্লট

ISA (Industry Standard Architecture) : আইএসএ স্লটেও বিভিন্ন ধরনের ইন্টারফেস কার্ড বসানো হয়।

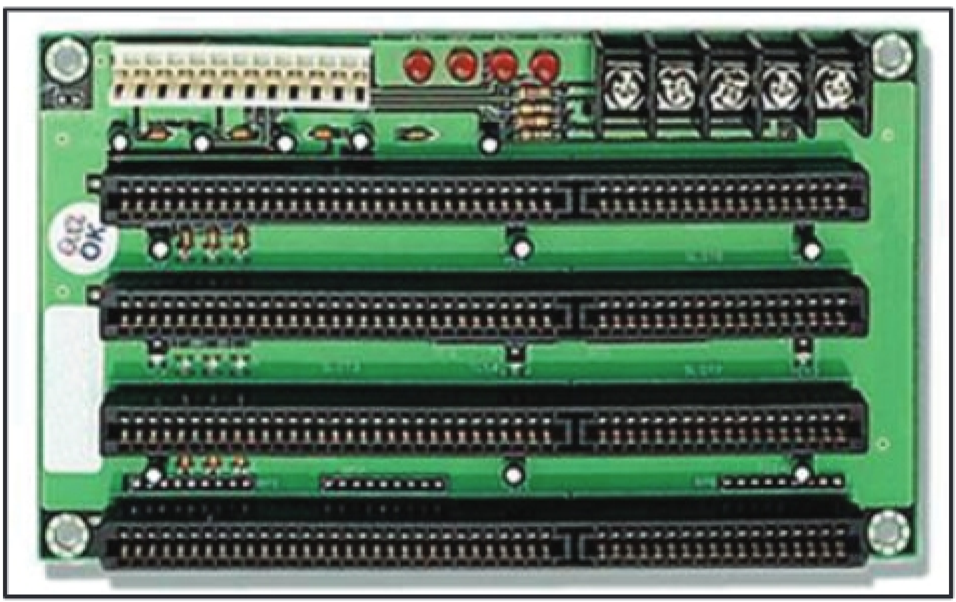

চিত্র ৫.২৮: ISA স্লট

৫.৪ পেরিফেরালসের প্রকারভেদ

একটি কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরণের পেরিফেরাল ও অ্যাকসেসরিজ নিয়ে গঠিত হয়ে। পেরিফেরালস ও অ্যাকসেসরিজগুলো সঠিক পদ্ধতিতে সংযোগ দিয়ে একটি সম্পূর্ণ কম্পিউটার তৈরি করা হয়।

- **কী-বোর্ড:** বহুল ব্যবহৃত একটি ইনপুট ডিভাইস। পোর্টের উপর ভিত্তি করে কী-বোর্ড বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- সিরিয়াল পোর্টের কী-বোর্ড, পিএস/২ পোর্টের কী-বোর্ড, ইউএসবি পোর্টের কী-বোর্ড ও ওয়্যারলেস কী-বোড।

চিত্র ৫.২৯: কী-বোর্ড

- **মাউস:** বহুল ব্যবহৃত একটি ইনপুট ডিভাইস। পোর্টের উপর ভিত্তি করে মাউস বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- সিরিয়াল পোর্টের মাউস, পিএস/২ পোর্টের মাউস, ইউএসবি পোর্টের মাউস ও ওয়্যারলেস মাউস।
- **টাসস্ক্রিন:** টাসস্ক্রিন ইনপুট ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন টাস স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়।
- **পেন ট্যাবলেট:** এটি একটি সম্পূর্ণ ডিভাইস। ডিডিটাল পেন ব্যবহার করে এটিতে কাজ করা হয়।

চিত্র ৫.৩০ : মাউস

চিত্র ৫.৩১ : টাস স্ক্রিণ

চিত্র ৫.৩২: পেন ট্যাবলেট

- **জয়স্টিক:** এটি একটি ইনপুট ডিভাইস। ভিডিও গেমস খেলার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।
- **MIDI (Musical Instrument Digital Interface) কী-বোর্ড:** MIDI কী-বোর্ড সাধারণত পিয়ানো স্টাইলে তৈরি একটি ইলেকট্রনিক মিউজিক্যাল কী-বোর্ড। এটিতে কিছু অতিরিক্ত বাটন, চাকা ও স্লাইডার থাকে যেগুলো MIDI সিগনালকে ইউএসবি অথবা MIDI ক্যাবলের মাধ্যমে অন্য মিউজিক্যাল ডিভাইসে পাঠায়।
- **স্ক্যানার:** এটি একটি ইনপুট ডিভাইস। এটি হার্ড কপিকে স্কেন করে সফট কপিতে পরিণত করে।

চিত্র ৫.৩৩ : MIDI কীবোর্ড

চিত্র ৫.৩৪ : জয়স্টিক

চিত্র ৫.৩৫ : স্ক্যানার

- **ডিজিটাল ক্যামেরা:** এ ডিভাইসটি স্থির চিত্র তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়। কোন দৃশ্য বা ব্যক্তির ছবি তুলে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- **ভিডিও ক্যামেরা:** ভিডিও ডিভাইসটি চলমান চিত্র/ ভিডিও তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। কোন দৃশ্য বা ব্যক্তির ভিডিও করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- **মাইক্রোফোন:** মাইক্রোফোন একটি ইনপুট ডিভাইস। এ ডিভাইসের মাধ্যমে সাউন্ড কম্পিউটারে প্রবেশ করে এবং প্রয়োজনে স্টোর করা যায়।

চিত্র ৫.৩৬: ডিজিটাল ক্যামেরা

চিত্র ৫.৩৭: ভিডিও ক্যামেরা

চিত্র ৫.৩৮: মাইক্রোফোন

- **ওয়েভক্যাম:** ওয়েভ ক্যামেরাকে সংক্ষেপে ওয়েভক্যাম বলে। এটি দিয়ে ভিডিও ক্যামেরার মতো ভিডিও করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায়। তবে ভিডিও চেটিং এর জন্য ওয়েভ ক্যাম বেশি ব্যবহৃত হয়।ল্যাপটপে বিল্ট-ইন এবং ডেক্সটপ বা ল্যাপটপের সাথে এক্সটারনাল ওয়েভ ক্যাম ব্যবহৃত হয়।

- **ডিসপ্লে ডিভাইস:** ডিসপ্লে ডিভাইস হলো আউটপুট ডিভাইস।এ ডিভাইস টি কম্পিউটারের ফলাফল কে সরাসরি প্রদর্শন করে। বিভিন্ন ধরনের ডিপ্লে ডিভাইস আছে। যেমন– মনিটর, প্রজেক্টর, স্মার্ট বোর্ড, স্মার্ট টিভি ইত্যাদি।

• **প্রিন্টার :** প্রিন্টার একটি আউটপুট ডিভাইস। এ ডিভাইসটি কম্পিউটারের টেক্স বা ইমেজ আউটপুটকে কাগজে প্রিন্ট করে স্থায়ী ভাবে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরণের প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। যেমন– ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার, ইঙ্কজেট প্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার।

চিত্র ৫.৩৯ : ওয়েভ ক্যাম

চিত্র ৫.৪০: ডিসপ্লে ডিভাইস

চিত্র ৫.৪১ : প্রিন্টার

- **প্লটার:** প্লটার একটি আউটপুট ডিভাইস। আমরা অটোক্যাড সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিল্ডিং এর ডিজাইন করলে ডিজাইনটিকে বড় কাগজে প্রিন্ট দিতে হয়। যা প্রিন্টারে সম্ভব হয় না। আবার প্রয়োজনে বড় ব্যানার প্রিন্ট করতে হয়। এ জন্য আমরা প্লটার ব্যবহার করে থাকি।
- **স্পিকার:** স্পিকার একটি আউটপুট ডিভাইস। এটি কম্পিউটারের প্রসেসকৃত ইলেকট্রিক্যাল সিগনালকে শব্দ শক্তিতে পরিনত করে।
- **এক্সটারনাল ড্রাইভ:** এক্সটারনাল ড্রাইভ কমিপউটারের সিস্টেম ইউনিটের বাইরে থাকে। কাজ শেষে ড্রাইভকে নিরাপদে রাখা যায়। এটি সাধারণত ইউএসবি পোর্টে সংযোগ করা হয়। ইউএসবি হার্ড ড্রাইভ ও ইউএসবি অপটিক্যাল ড্রাইভ এক্সটারনাল ড্রাইভের দুটি উদাহরণ।

চিত্র ৫.৪২: প্লটার

চিত্র ৫.৪৩: স্পিকার

চিত্র ৫.৪৪: এক্সটারনাল ড্রাইভ

- **ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ:** ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভকে আমরা পেন ড্রাইভ বলে থাকি। সাইজে ছোট, বহনযোগ্য, কলমের মতো বলে এক নাম পেন ড্রাইভ বলে।

- **সিডি রম ড্রাইভ:** সিডি রম ড্রাইভ (CD ROM-Compact Disk Read Only Memory) একটি অপটিক্যাল ড্রাইভ। কম্পিউটারে সিডি ব্যবহার করার জন্য এ ডিভাইসটি ব্যবহার করা হয়।
- **মিডিয়া কার্ড রিডার:** মিডিয়া কার্ড রিডারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মেমোরি কার্ড ইনসার্ট করে কম্পিউটারে তথ্য আদান প্রদানে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ৫.৪৫: ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ

চিত্র ৫.৪৬ : সিডি রম ড্রাইভ

চিত্র ৫.৪৭: মিডিয়া কার্ড রিডার

- **ডিজিটাল ক্যামকোডার:** ডিজিটাল ক্যামকোডার একটি ইনপুট ডিভাইস। এ ডিভাইস দিয়ে স্থির চিত্র ও ভিডিও ক্যাপচার করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায়।

চিত্র ৫.৪৮ : ক্যাম কোডার

৫.৫ এক্সপানশন কার্ড

আমরা আমাদের কম্পিউটারে বর্তমান সুবিধার চেয়ে আরও সুবিধা নেয়ার জন্য এক্সপানশন কার্ড সংযোগ করি। ধর, তোমার একটি কম্পিউটার আছে। তুমি কম্পিউটারে গেম খেলতে পছন্দ কর। এখন এমন একটি গেম বাজারে আছে যেটি খেলার জন্য তোমার একটি গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর প্রয়োজন। প্রথমে সমস্যা হল মা/বাবাকে

ম্যানেজ করা। কারণ গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য অর্থ প্রয়োজন। ধরি, তুমি বাবাকে ম্যানেজ করে গ্রাফিক্স কার্ডটি কিনেছ। এখন কম্পিউটারে এটি পিসিআই এক্সপ্রেস স্লটে লাগিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে। এভাবে বিশেষ বিশেষ সুবিধা নেয়ার জন্য আমাদের এক্সপানশন কার্ড সংযোগ করার প্রয়োজন হয়। এজন্য আমাদের এ কার্ডগুলো সম্পর্কে জানতে হয়।

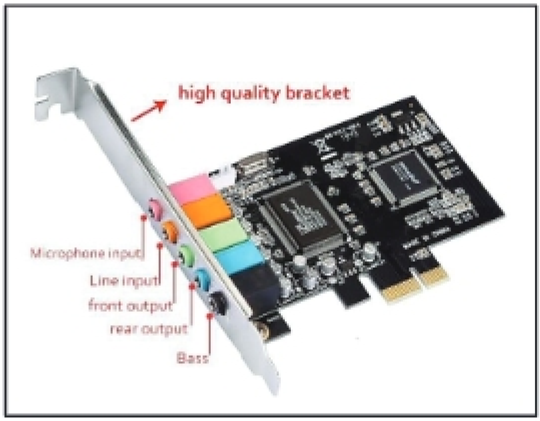

চিত্র ৫.৪৯: সাউন্ড কার্ড

সাউন্ড কার্ড: সাউন্ড কার্ড কম্পিউটারের সাউন্ড এর জন্য ব্যবহার করা হয়। সাউন্ড কার্ডের সাথে স্পিকারের ইনপুট জ্যাক সংযোগ থাকে। এখনকার কম্পিউটারগুলোতে আলাদা করে সাউন্ড কার্ড লাগানোর প্রয়োজন হয় না। সাধারণত এটি বিল্টইন অবস্থায় পাওয়া যায়। এ কার্ডে নুন্যতম দুটি পোর্ট থাকে একটি অডিও ইন যেখানে মাইক্রোফোন সংযোগ করা হয় এবং অডিও আউট যে পোর্টের সাথে স্পিকারের জ্যাক লাগানো হয়।

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড: নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড কম্পিউটারকে নেওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ কার্ডের আউটপুটে কম্পিউটারের ইউটি ক্যাবল সংযোগ করা হয়।

সিরিয়াল ও প্যারালাল কার্ড: সিরিয়াল ও প্যারালাল কার্ডটি কম্পিউটার এর সিরিয়াল ও প্যারালাল পোর্ট বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। এ কার্ড টি ISA স্লট অথবা PCI স্লটে সংযোগ করাতে হয়।

ইউএসবি কার্ড: ইউএসবি কার্ডটি ইউএসবি পোর্টের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। মনে কর তোমার কম্পিউটারে চারটি ইউএসবি পোর্ট আছে এবং তুমি চারটি পোর্টই ব্যবহার করছ। এখন তুমি একটি পেন ড্রাইভ লাগাতে চাও। তখন তুমি কি করবে। পেন ড্রাইভটি সংযোগ করতে পারবে না।

চিত্র ৫.৫০: নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড

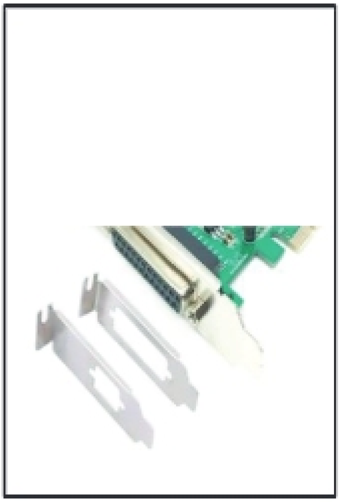

চিত্র ৫.৫১: সিরিয়াল ও প্যারালাল কার্ড

চিত্র ৫.৫২ : ইউএসবি কার্ড

এ জন্য আমরা ইউএসবি কার্ড ব্যবহার করি ইউএসবি পোর্টের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। এ কার্ড টি পিসিআই স্লটে সংযোগ করতে হয়।

২০২৪

ফায়ারওয়্যার কার্ডঃ ফ্যারওয়্যার কার্ডটি ক্যামকোডার ও এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ সংযোগ দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর ডাটা ট্রান্সফার রেট ৪৮০ এমবিপিএস।

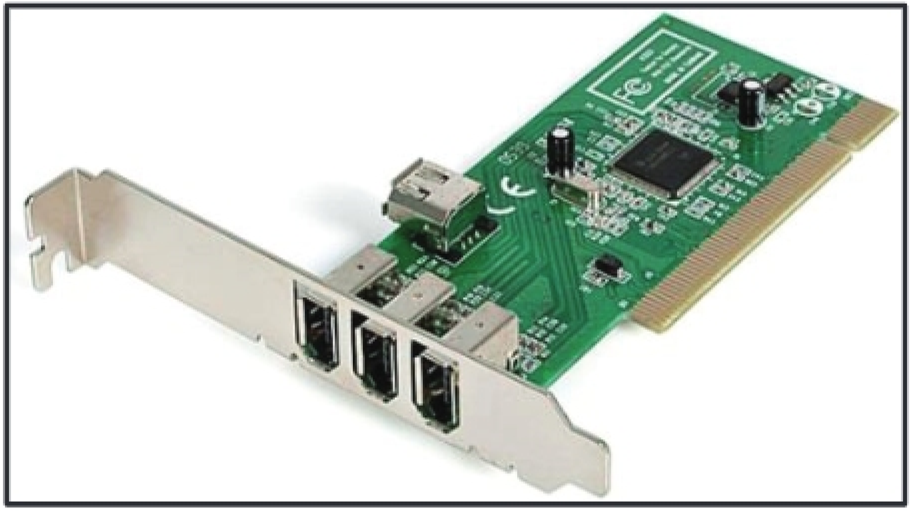

চিত্র ৫.৫৩: ফায়ারওয়্যার কার্ড

স্ক্যাজি (SCSI-Smalll Computer System Interface) কার্ডঃ স্ক্যাজি কার্ডের সাথে ক্যাবলের মাধ্যমে এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ সংযোগ দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

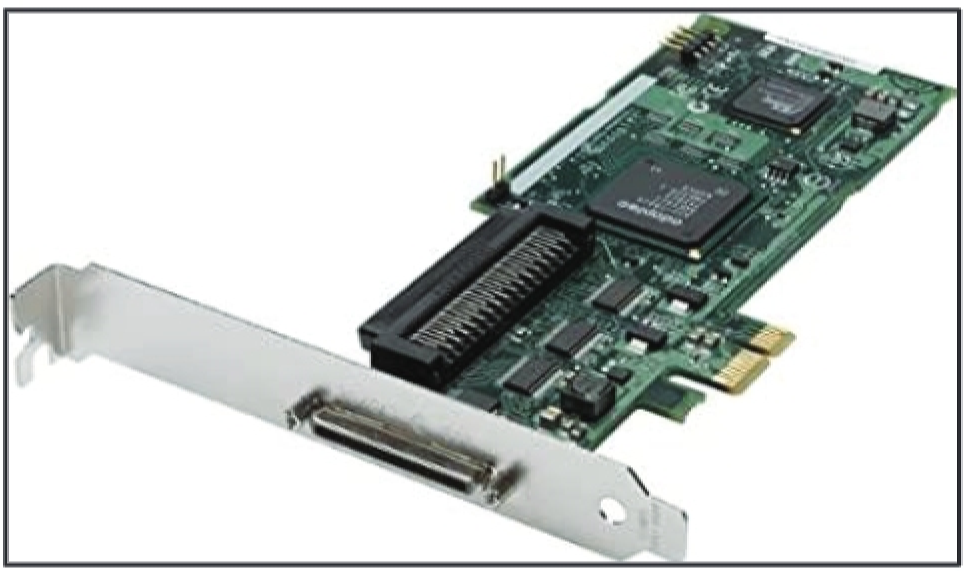

চিত্র ৫.৫৪: স্ক্যাজি কার্ড

মডেম কার্ড: টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে ইন্টারনেট চালনার জন্য মডেম কার্ড ব্যবহার করা হয়। টেলিফোন লাইন সংযোগের জন্য এ কার্ডে পোর্ট থাকে যেখানে টেলিফোন লাইন সংযোগ হয়।

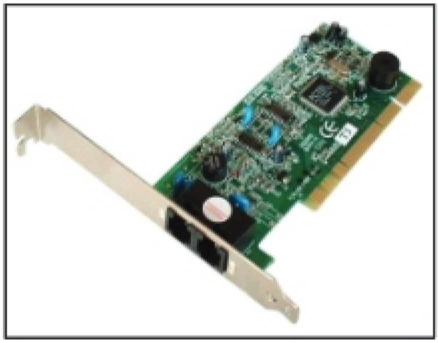

চিত্র ৫.৫৫: মডেম কার্ড

টিভি টিউনার: কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ কম্পিউটারে ডিশ ক্যাবল সংযোগ দিয়ে টিভি দেখার জন্য টিভি টিউনার কার্ডটি ব্যবহার করা হয়। অর্থ্যাৎ তোমার কম্পিউটারটিকেএকটি টিভি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য টিভি টিউনার কার্ডটি ব্যবহার করতে হবে।

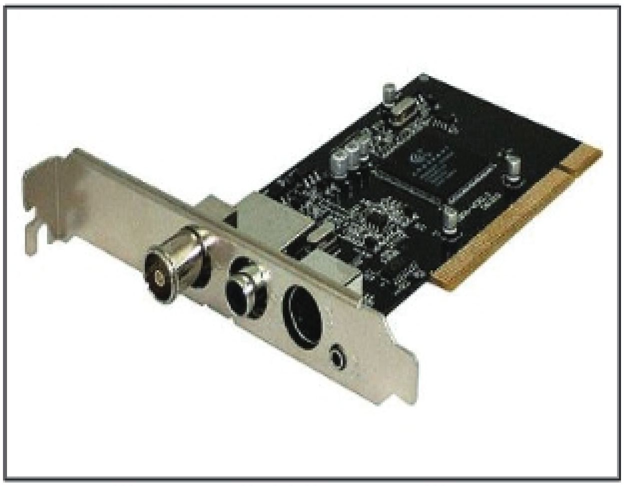

চিত্র ৫.৫৬: টিভি টিউনার কার্ড

ওয়্যারলেস কার্ড: ওয়্যারলেস কার্ডটি লোকার এরিয়া নেটওয়ার্কের জন্য ব্যবহার করা হয়। সাধরণত ডেস্কটপ কম্পিউটারে ওয়্যারলেস বিল্ট ইন থাকে না। তাই ডেস্কটপ কম্পিউটারে ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য ওয়্যারলেস কার্ড ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ৫.৫৭:ওয়্যারলেস কার্ড

ভিডিও ক্যাপচার কার্ড: ভিডিও ক্যাপচার কার্ডটি কম্পিউটার স্ক্রিনের প্রর্দশিত ভিডিওকে সংরক্ষণ করে। তুমি যখন কম্পিউটার গেম খেলবে তখন তুমি এ কার্ডটি ব্যবহার করলে তোমার কম্পিউটারের উপর লোড কম পড়বে এবং গেমটির ভিডিও সেভ করে রাখতে পারবে।

রাইজার কার্ড: রাইজার কার্ডের মাধ্যমে গ্রাফিক্স স্লট বাড়ানো, মেমোরি স্লট বাড়ানো, পিসিআই স্লট বাড়ানো যায়।

চিত্র ৫.৫৮: ভিডিও ক্যাপচার কার্ড

৫.৬ এক্সপানশন কার্ড স্থাপনে প্রস্তুতি ও সাবধানতা

এ অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন স্লট, কার্ড, ডিভাইস, পোর্ট ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। একজন আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান হিসেবে আমাদের কম্পিউটারের স্লট, কার্ড, পোর্ট ইত্যাদি বিষয়ে ভালো ধারণা থাকা দরকার। তা না হলে ডিভাইস পুড়ে যেতে পারে অথবা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

প্রতিটি ডিভইস কোন না কোন স্লটে বা পোর্টে সংযোগ হয়। প্রত্যেক ডিভাইস /কার্ডের জন্য আলাদা পোট /স্লট রয়েছে। তাই সঠিক পোর্ট/স্লট জেনে ডিভাইস বা কার্ড সংযোগ করতে হবে।

চিত্র ৫.৫৯: এজিপি স্লটে এজিপি কার্ড বসানো হচ্ছে

৫.৭ পেরিফেরালসসমূহকে সঠিক I/O পোর্টের সাথে সংযোগ পদ্ধতি

যে কোন ডিভাইসের পোর্ট এর সাথে মিল রেখে কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের পোর্টে ডিভাইস লাগাতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে পোর্ট ডিভাইসে থাকে সে রকম পোর্ট কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটে সামনে অথবা পিছনে থাকে। প্রতিটি পোর্ট মেল (পিন) বা ফিমেল (হোল) হতে পারে। অর্থ্যাৎ যদি ডিভাইসের পোর্টে পিন থাকে তাহলে কম্পিউটার সিস্টেমে হোল থাকবে। আবার যদি কম্পিউটার সিস্টেমে পিন থাকে তবে ডিভাইসের পোর্টে হোল থাকবে। প্রতিটি পোর্টের সাইজ এবং পিন সংখ্যা আলাদা হয়। এ কারণে ভালো ভাবে যাচাই বাছাই করে ইনপুট/আউটপুট পোর্টে সাবধাণতার সাথে পিন সংখ্যা দেখে, হোল দেখে, পিনের সাইজ দেখে, হোলের সাইজ দেখে ডিভাইস সংযোগ দিতে হয়।

৫.৮ উপযুক্ত ড্রাইভার সফটওয়্যার সংগ্রহ ও ইনস্টল করার পদ্ধতি

প্রত্যেকটি হার্ডওয়্যারকে কার্যপোযোগী করার জন্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার এর সাথে দেয়া হয়। উক্ত সফটওয়্যারকে ড্রাইভার সফটওয়্যার বলে। এ সফটওয়্যার ইনস্টল করলে হার্ডওয়্যার কার্যক্ষম হয়। অনেক সময় কিছু কিছু হার্ডওয়্যারের সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেমের সাথে বিল্ট ইন থাকে ফলে ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রয়োজন পরে না। সে সকল হার্ডওয়্যার ডিভাইসের ড্রাইভার ইনস্টল করা থাকে না সেটি আমাদের ইনস্টল করতে হয়। এজন্য আমরা ড্রাইভার সফটওয়্যার ব্যাকআপ ড্রাইভ থেকে অথবা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিস্ক থেকে অথবা ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করি।

চিত্র ৫.৬০: ড্রাইভার সফটওয়্যার

৫.৯ সংযুক্ত পেরিফেরাল ও অন্যান্য এ্যাকসেসরিজ এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করার পদ্ধতি

প্রিন্টার: প্রিন্টার ড্রাইভার ইনস্টল করার পর প্রিন্ট কমান্ড দিয়ে দেখে নিতে হবে প্রিন্ট করতে পারছে কিনা। যদি প্রিন্ট হয় তাহলে পিন্টার ঠিক আছে।

স্ক্যানার: কোন ডিভাইসের কার্যকারীতা পরীক্ষা করার জন্য ঐ ডিভাইসকে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ করে ড্রাইভার ইনস্টল করে ব্যবহার করে কার্যকারীতা পরীক্ষা করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আমি একটি স্ক্যানার সংযোগ করলাম এর পর ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল করলাম এর পর স্ক্যানারটি ব্যবহার করে দেখতে হবে ঠিক মতো স্ক্যান হচ্ছে কিনা।

নিক কার্ড: যে কম্পিউটারের নিক কার্ড পরীক্ষা করব সেটির আইপি এ্যাড্রেস জানতে হবে। অন্য কম্পিউটার থেকে ping কমান্ডের (ping ip address) মাধ্যমে কানেকশন পায় কিনা তা চেক করতে হবে। যদি কানেকশন পায় তবে নিক কার্ড ঠিক আছে।

৫.১০ পোর্ট ও বিল্ট ইন কার্ডসমূহ এর কার্যকারীতা সচল ও বন্ধ করার পদ্ধতি

আমাদের প্রয়োজনে আমারা অনেক সময় BIOS (Basic Input Outpur System) এ অথবা ডিভাইস ম্যানেজারে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের পোর্ট সচল অথবা অচল করি।

বায়োসে প্রবেশ করা

কম্পিউপার পাওয়ার সুইচ অন করার সাথে সাথে F2, Del, F12 কী প্রেস করে বায়োসে প্রবেশ করতে হয়।

৫.১১ ডিভাইস ম্যানেজার (Device Manager) এ প্রবেশ করা

ডিভাইস ম্যানেজারে প্রবেশ করার জন্য মাউসের ডান বাটন দিয়ে মাই কম্পিউটার (My Computer) আইকনে ক্লিক করে প্রোপারটিজ (Properties) ও ডিভাইস ম্যানেজারে ক্লিক করে ডিভাইস ম্যানেজারে প্রবেশ করতে হয়।

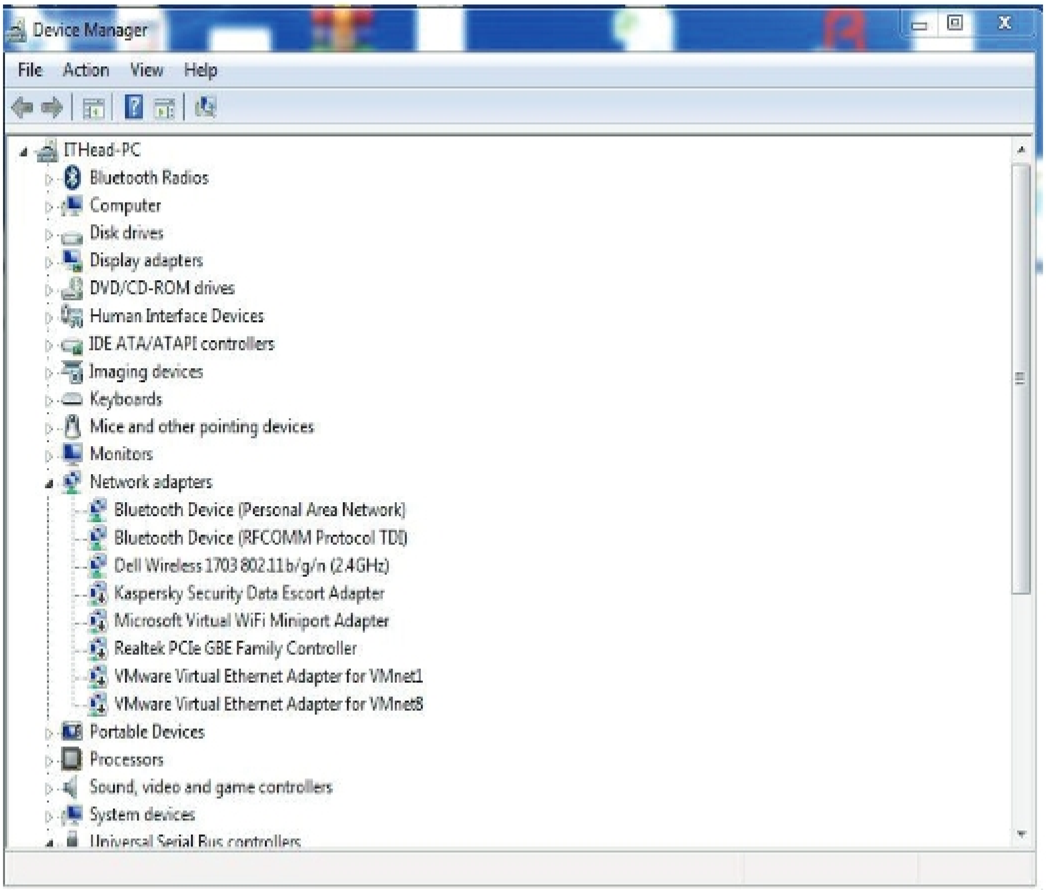

৫.১২ ডিভাইস ম্যানেজার এর সাহয্যে বিল্ট ইন কার্ড/পোর্ট এর সেটিং পরিবর্তন করার পদ্ধতি

ডিভাইস ম্যানেজার অপশনে প্রবেশ করে যে ডিভাইসটি/পোর্টটি সচল অথবা অচল করতে হবে এটির উপর মাউস পয়েন্টার নিয়ে রাইট বাটনে ক্লিক করে এনাবল (Enable) অথবা ডিজ্যাবল (Disable) করে যথাক্রমে সচল ও অচল করব।

২০২৪

জব শিট

জব ১: প্রিন্টার ও স্ক্যানারের ড্রাইভার সফটওয়্যার ইন্সটল করে প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্ট ও স্ক্যানারের মাধ্যমে স্ক্যান করা ।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- কম্পিউটার পেরিফেরাল সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তুতি গ্রহণ;
- কম্পিউটারের বিভিন্ন পেরিফেরাল ও অন্যান্য এ্যাকসেসরিজ সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন করা;
- বিভিন্ন ধরণের পোর্ট এবং বিল্ট ইন কার্ডসমূহ এর কার্যকারীতা সচল ও বন্ধ করা;

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অ্যাপ্রন	সাধারণ	০১ টি
০২	মাস্ক	সাধারণ	০১ টি
০৩	হ্যান্ড ওয়াশ/সাবান	সাধারণ	০১ টি
০৪	রাবারের স্যান্ডেল/জুতা	সাধারণ	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমান
০১	কম্পিউটার	ডেস্কটপ, Core i7	০১ টি
০২	পাওয়ার ক্যাবল	প্রিন্টারের জন্য	০১ টি
০৩	ফায়ারওয়্যার ক্যাবল	প্রিন্টারের জন্য	০১ টি
০৪	পাওয়ার এ্যাডাপ্টার	স্ক্যানারের জন্য	০১ টি
০৫	ফায়ারওয়্যার ক্যাবল	স্ক্যানারের জন্য	০১ টি
০৬	প্রিন্টার	ডট/লেজার/ইঙ্কজেট প্রিন্টার	০১ টি
০৭	স্ক্যানার	যে কোন সাইজ ও রেজুলেশনের	০১ টি

(গ) সফটওয়্যার (Software)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংগ্রহ উৎস ও পদ্ধতি	পরিমান

০১	ড্রাইভার সফটওয়্যার	সংশ্লিষ্ট প্রিন্টারের জন্য নির্ধারিত সফটওয়্যার	ডিভিডি/ পেনড্রাইভ/হার্ড ডিস্ক/ইন্টারনেট	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা: একটি প্রিন্টারকে I/O পোর্ট ও পাওয়ার ক্যাবল সংযোগ ও করে ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টল করে প্রিন্ট দিতে হবে। এ জন্য নিচের নির্দেশনা অনুসরণ করো।

নোটঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিভিন্ন প্রিন্টার ব্যবহার করে থাকেন। প্রিন্টার ভিন্ন হলেও এদের ইনস্টলেশন পদ্ধতি প্রায় একই।

(ক) প্রিন্টারে ড্রাইভার সফটওয়্যার ইনস্টলেশন

১. প্রিন্টারের পাওয়ার সকেট ও পাওয়ার প্লাগ চিহ্নিত কর এবং সংযোগ করো।

নোটঃ প্রিন্টারের পাওয়ার এবং সকেট প্রিন্টারভেদে ভিন্নতা থাকবে। তোমরা প্রিন্টারের পাওয়ার ক্যাবল লাগানোর সময় প্রিন্টারের সাথে দেয়া নির্দেশিকা বইটি পড়ে কাজ করবে।

প্রিন্টার পাওয়ার সকেট

প্রিন্টার পাওয়ার প্লাগ

প্রিন্টারের পাওয়ার সংযোগ

২. প্রিন্টারের ফায়ারওয়্যার ক্যাবলের ইউএসবি পোর্ট ও ফায়ারওয়্যার পোর্ট চিহ্নিত কর এবং সংযোগ দাও।

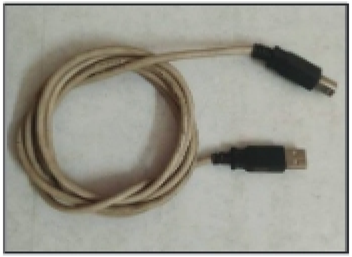

ডাটা/ফায়ারওয়্যার ক্যাবল

প্রিন্টারের ডাটা/ফায়ারওয়্যার পোর্ট

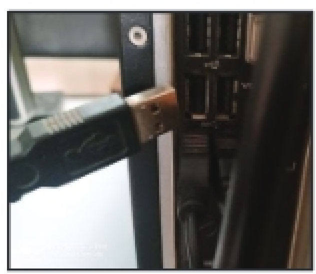

প্রিন্টার সংযোগ

২০২৪

৩. প্রিন্টার ড্রাইভার ডিভিডি ড্রাইভে ইনসার্ট করবে এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। বেশিরভাগ ড্রাইভার সিডি/ডিভিডি অটো প্লে বা অটো রান হয়। অনেক সময় অটোরান না হলে মাইকম্পিউটারে প্রবেশ করে ডিভিডি ড্রাইভে প্রবেশ করে ডাবল ক্লিক করে ওপেন কর।

প্রিন্টার ড্রাইভার সফটওয়্যার ডিভিডি

৪. চিত্রের ন্যায় ডায়ালগ বক্স আসবে এবং Next এ ক্লিক করো

৫. Installation agreement এ ক্লিক করে Next এ ক্লিক করো

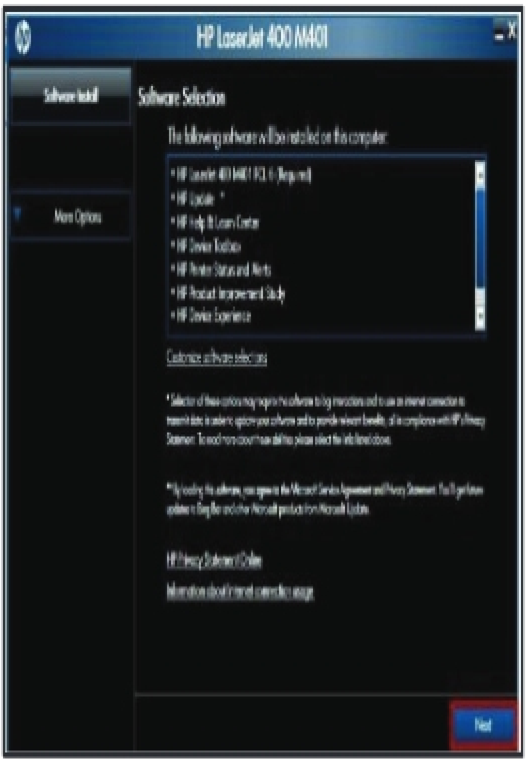

প্রিন্টার ড্রাইভার

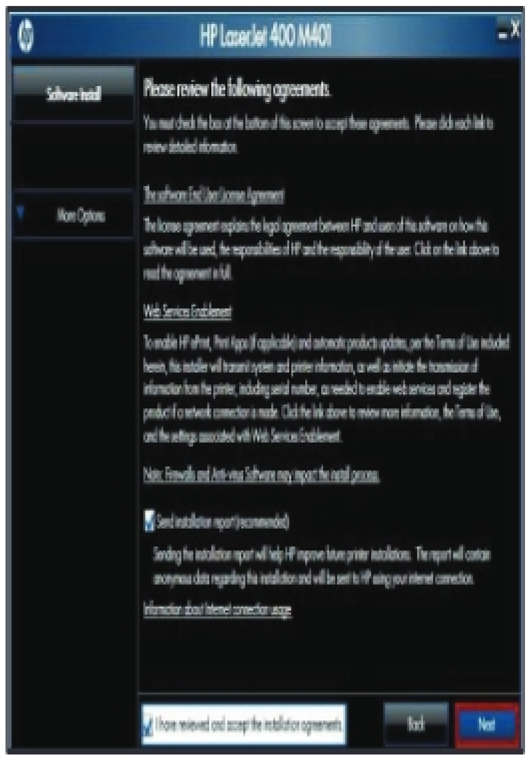

Install agreement ডায়ালগ বক্স

৬. ইনস্টেলেশন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করো

৭. অগ্রগতি শতভাগ হলে Next এ ক্লিক করো

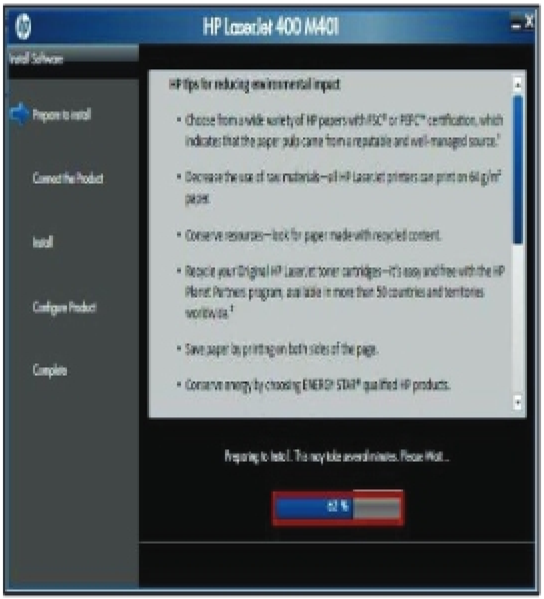

ইনস্টল অগ্রগতি ডায়ালগ বক্স

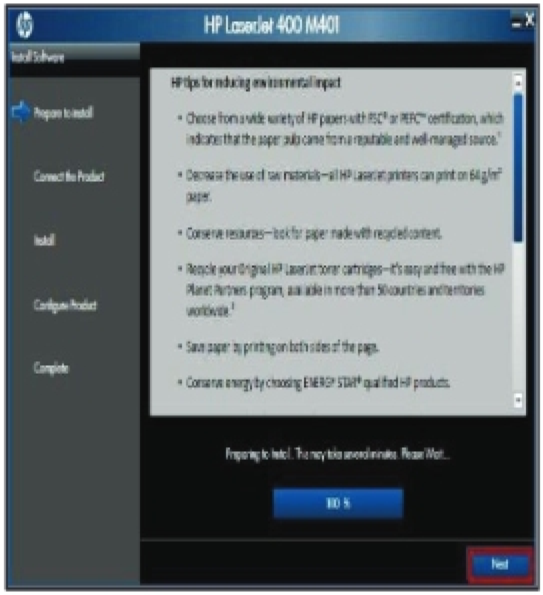

অগ্রগতি শতভাগ ডায়ালগ বক্স

৮. প্রিন্টারটিকে অন কর এবং Next এ ক্লিক করো

৯. প্রিন্টার ইউএসবি পোর্টের সাথে সংযোগ হয়েছে কিনা নিশ্চিত হও

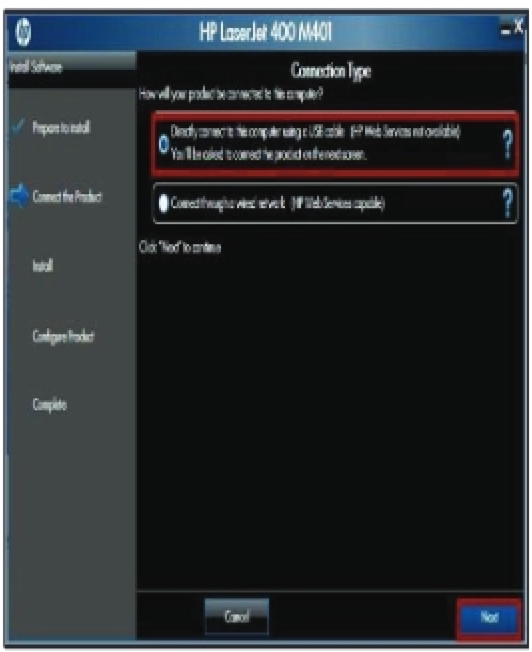

প্রিন্টার অন করার নির্দেশনা ডায়ালগ বক্স

প্রিন্টার কম্পিউটারের সাথে সংযোগ হয়েছে

২০২৪

১০. Set as default printer এবং Print a test page ক্লিক করে Next এ ক্লিক করো

১১. Finish এ ক্লিক করে ইনস্টলেশন সম্পন্ন করো।

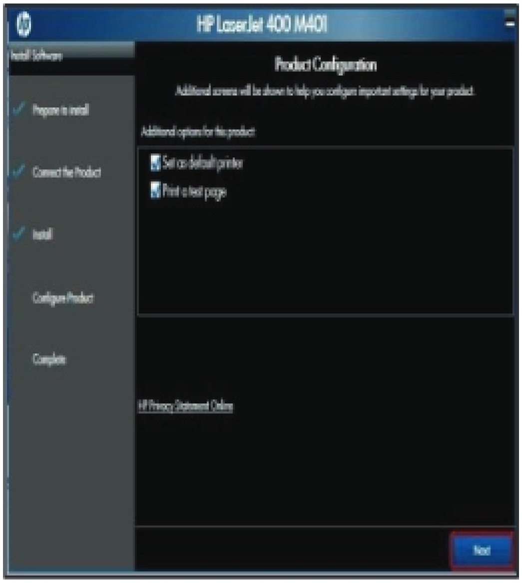

সিলেকশন ডায়ালগ বক্স

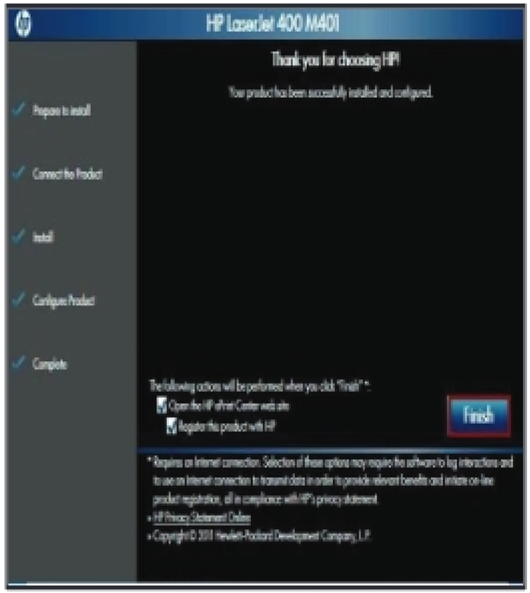

Finish ডায়ালগ বক্স

(খ) স্ক্যানারে সফটওয়্যার ইনস্টল ড্রাইভার করা

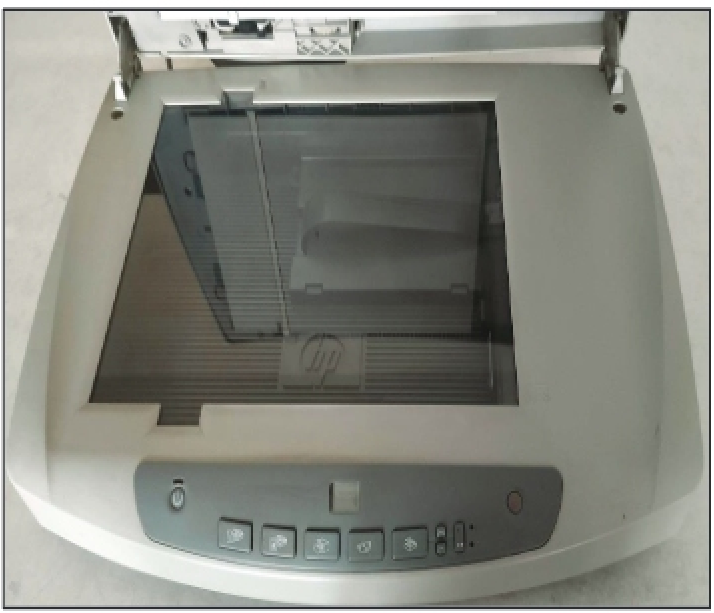

স্ক্যানার

২০২৪

১. স্ক্যানারের পাওয়ার এ্যাডাপ্টার পিন ও সকেট চিহ্নিত কর ও সংযোগ করা।

নোট: প্রিন্টারের পাওয়ার এবং সকেট প্রিন্টারভেদে ভিন্নতা থাকবে। তোমরা প্রিন্টারের পাওয়ার ক্যাবল লাগানোর সময় প্রিন্টারের সাথে দেয়া নির্দেশিকা বইটি পড়ে কাজ করবে।

স্ক্যানারের পাওয়ার এ্যাডাপ্টার পিন

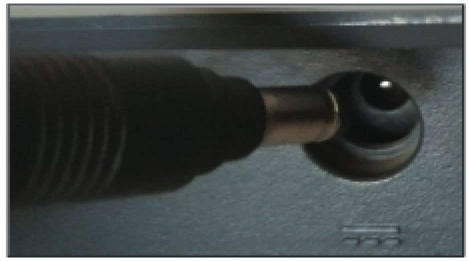
স্ক্যানারের পাওয়ার সংযোগ

২. স্ক্যানারের ফায়ারওয়্যার ক্যাবলের ইউএসবি পোর্ট ও ফায়ারওয়্যার পোর্ট চিহ্নিত করে সংযোগ দাও।

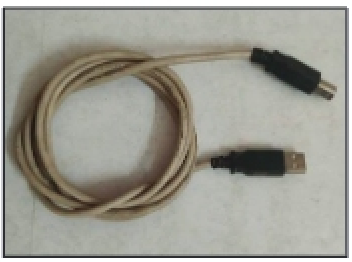
ডাটা/ফায়ারওয়্যার ক্যাবল

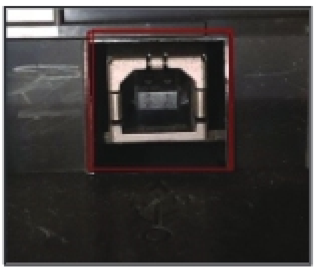
স্ক্যানারের ডাটা/ফায়ারওয়্যার পোর্ট

স্ক্যানার সংযোগ

৩. স্ক্যানার ড্রাইভার ডিভিডি রমে ইনসার্ট কর এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। বেশিরভাগ ড্রাইভার সিডি/ডিভিডি অটো প্লে বা অটো রান হয়। অনেক সময় অটোরান না হলে মাইকম্পিউটারে প্রবেশ করে ডিভিডি ড্রাইভে প্রবেশ করে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করো।

স্ক্যানারের ড্রাইভার সফটওয়্যার ডিভিডি

নোট: ড্রাইভার সফটওয়্যারটি ডিভিডি, পেনড্রাইভ, হার্ড ডিস্ক অথবা কম্পিউটারের ব্যাকআপে থাকতে পারে। আবার অনেক সময় ইন্টারনেট থেকেও ডাউনলোড করে ইন্সটল করা প্রয়োজন হয়।

৪. ডায়ালগ বক্সের Run Setup.exe এ ক্লিক করো

৫. Install এ ক্লিক করো

Run Setup.exe ডায়ালগ বক্স

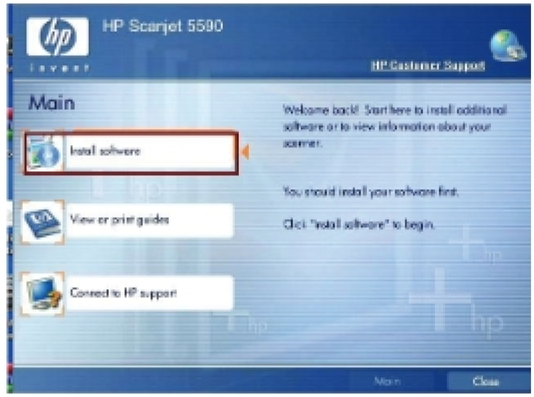

Install ডায়ালগ বক্স

৬. Picture and general Scanning, HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN Select করো Install এ ক্লিক করো।

৭. **নোট:** প্রিন্টারভেদে ডায়ালগবক্সের ভিন্নতা থাকে। তোমরা অন্য মডেলের প্রিন্টার ইনস্টল করার সময় নির্দেশিকা বই দেখে ইন্সটল করবে।

৮. Next এ ক্লিক করো

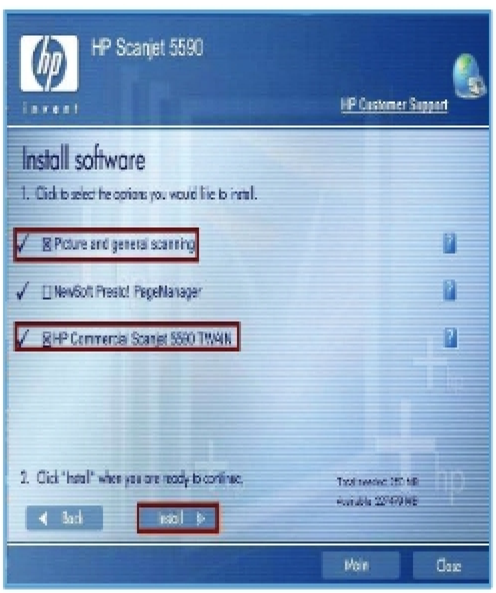

সিলেকশন ডায়ালগ বক্স

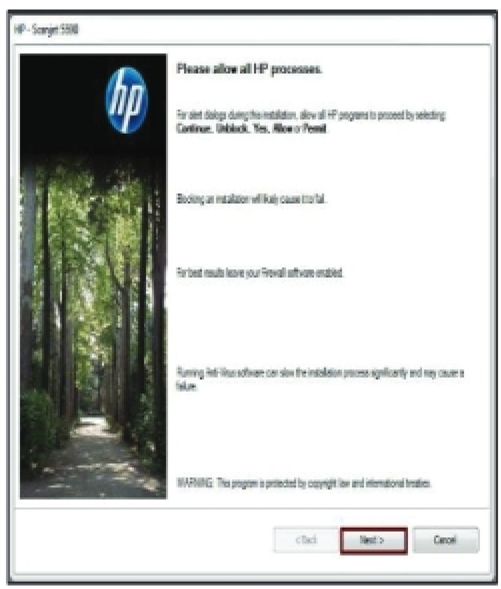

পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার ডায়ালগ বক্স

9. I have recieved and accept the installation agreements and settings এ ক্লিক করো

১০. Next এ ক্লিক করো

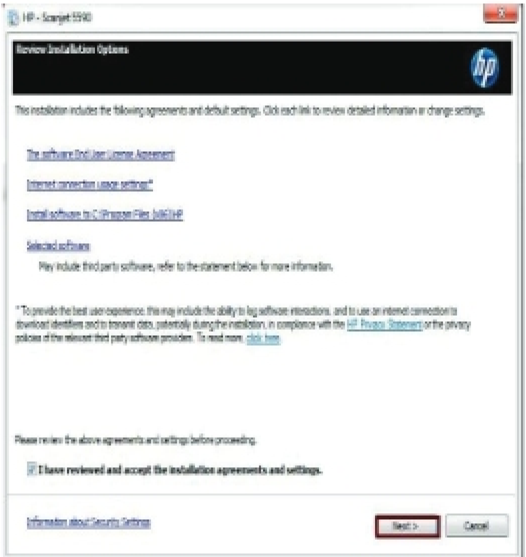

Installation agreements ডায়ালগ বক্স

Installation Ready ডায়ালগ বক্স

১১. ইনস্টল অগ্রগতি লক্ষ্য করো

১২. স্ক্যানারটির পাওয়ার অন কর এবং Ok তে ক্লিক করো।

ইনস্টল অগ্রগতি ডায়ালগ বক্স

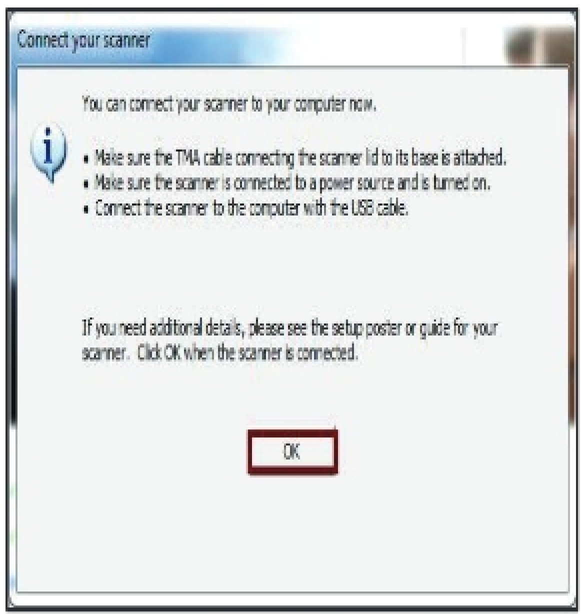

OK ডায়ালগ বক্স

১৩. Scanner Driver Setup ডায়ালগ বক্সে Next এ ক্লিক করো

১৪. Next এ ক্লিক করো

Scanner Driver Setup ডায়ালগ বক্স

Next ডায়ালগ বক্স

১৫. I accept the terms in the license agreement সিলেক্ট করে Next এ ক্লিক করো

১৬. Next এ ক্লিক করো

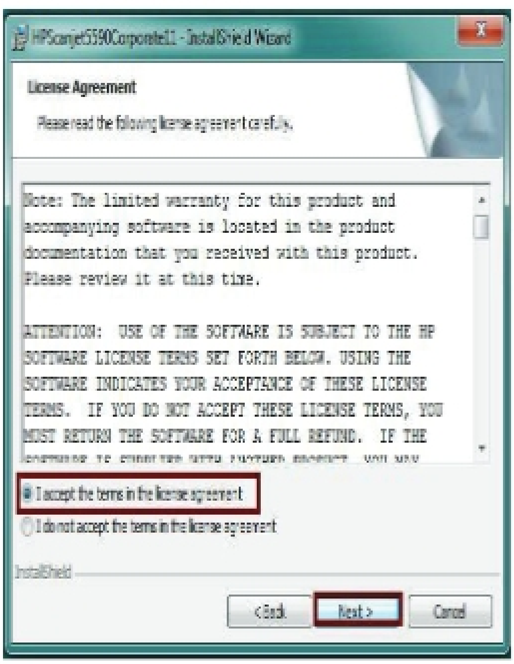

license agreement ডায়ালগ বক্স

Next ডায়ালগ বক্স

১৭. Install এ ক্লিক করো

১৮. Finish এ ক্লিক করো

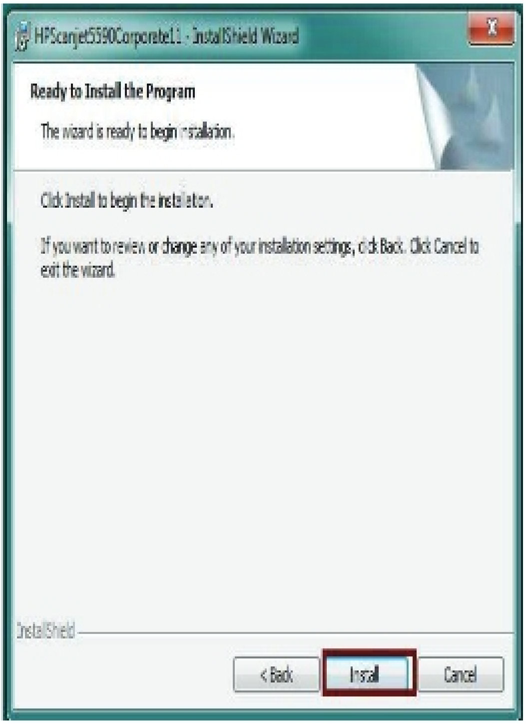

Next ডায়ালগ বক্স

Finish ডায়ালগ বক্স

অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পিএস/২ পোর্টের পিন সংখ্যা কত?

২। ইউএবি পোর্টের পিন সংখা কত?

৩। ইউএসবি পোর্টে কত ভোল্ট ব্যবহার করা হয়?

৪। গ্রাফিক্স কার্ডে কয় ধরণের পোর্ট থাকে?

৫। আরজে-৪৫ পোর্টে কয় পিন থাকে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। মানুষের কোন কোন অংগগুলোকে কম্পিউটারের ফেরিফেরালসের সাথে তুলনা করা যায়।

২। কম্পিউটারে পোর্ট কী?

৩। পিএস/২ পোর্ট চিত্রসহ বর্ণনা করো।

৪। ডিভিআই পোর্ট এর চিত্র আঁক।

৫। ইউএসবি-বি পোর্টের বিবরণ দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কম্পিউটারের কী কী পেরিফেরালসের ব্যবহার করা হয়।

২। প্রিন্টার ও স্ক্যানারের কোনটি কোন ধরেণর পেরিফেরালস। এদের পার্থক্য কী?

৩। সিরিয়াল পোর্ট ও প্যারালাল পোর্টের পার্থক্য।

৪। ডিসপ্লে ইউনিট (মনিটর, প্রজেক্টর) এ ব্যবহৃত পোর্টগুলোর নাম লেখ।

৫। ইউএসবি পোর্টের শ্রেণি বিভাগ করো।

৬। প্রিন্টার ও স্ক্যানারের পাওয়ার পোর্টের শ্রেণি বিভাগ করো।

৭। পিসিআই পোর্টের শ্রেণি বিভাগ করো।

৮। তোমার ব্যবহৃত কম্পিউটারে অন্য পেরিফেরাল যেমন- ওয়েভ ক্যাম, কার্ড রিডার, জয় স্টিক সংযোগ কর ও ব্যবহার করে দেখাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিস্টেম অ্যান্ড ডেটা সিকিউরিটি
System and Data Security

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো ডেটা (Data)। ডেটার সাথে বিশ্ব অর্থনীতিসহ আরো অনেক বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তিগত ডেটা থেকে শুরু করে কর্মস্থল ও রাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূর্ণ ডেটাসমুহের নিরাপত্তা বিধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ অধ্যায়ে এই মহামূল্যবান ডেটার সিকিউরিটি ও ডেটাসমূহ নানা প্রকার নিরাপত্তাহীনতা বা থ্রেট (Threat) থেকে রক্ষা করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ডেটার প্রাথমিক নিরাপত্তা বিধান করার কৌশলসহ ডেটার নিরাপত্তা বিধানে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি ই হচ্ছে এই অধ্যায়ের অন্যতম লক্ষ্য।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- কম্পিউটারের নিরাপত্তা ইস্যুগুলোকে চিহ্নিত করব;
- সফ্টওয়্যারের লাইসেন্স চেক করতে পারব;
- সিকিউরিটি থ্রেট শনাক্ত করতে পারব;
- সিকিউরিটি থ্রেট হতে সিস্টেমকে রক্ষা করতে পারব;
- সিকিউরিটি থ্রেট থেকে ডাটাকে সুরক্ষা প্রদানের কৌশল শিখব;
- এন্টি ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার আপডেট করতে পারব।

৬.১ কম্পিউটারের নিরাপত্তা

কম্পিউটার হলো হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যারের সমন্বয়ে তৈরি একটি ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র। ঠিকমত কাজ সম্পাদনের জন্য এসবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। বিভিন্ন অসতর্কতার জন্য ডিভাইসের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সুরক্ষা হুমকির মুখে পড়ে, যা কম্পিউটারের কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসমূহ

খেয়াল করেছ কি, নতুন কোনো ডিভাইস কেনার পর সেটা যত ভালো চলে, সময় যাওয়ার সাথে সাথে এর গতি ও কার্যক্ষমতা কমে আসতে থাকে। পানি ও অন্যান্য তরল পানীয়, ময়েশ্চার, ধুলাবালি, কম্পোনেন্টের ভেতরে উৎপন্ন হওয়া তাপ ইত্যাদি খুব সহজেই ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির কাজের গতিকে হ্রাসসহ হার্ডওয়্যারকে বিকল পর্যন্ত করে দিতে পারে। সফ্টওয়্যারসমূহ পরিবেশের এসব নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত না হলেও বিভিন্ন ম্যালিশিয়াস (Malicious) সফটওয়্যার, সিস্টেম বাগ (Bug), পিশিং (Phishing) প্রভৃতি কম্পিউটার তথা সফটওয়্যারকে সঠিকভাবে কার্য সম্পাদনে বাধা প্রদান করে।

এসব সমস্যা থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের উত্তম রক্ষণাবেক্ষণের কোন বিকল্প নেই।এ ক্ষেত্রে কম্পিউটার ডিভাইসের যত্ন নেওয়া থেকে শুরু করে অনলাইনেও নিরাপদভাবে কাজ করার বিষয়গুলো ব্যবহারকারীকে খেয়াল রাখতে হয়।

হার্ডওয়্যারের নিরাপত্তাসমুহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- হার্ডওয়্যার চুরি থেকে রক্ষা করা
- তরল পানীয় থেকে দূরে রাখা
- লুজ কন্টাক্ট থেকে সুরক্ষা প্রদান করা।
- ধুলাবালি মুক্ত রাখা।
- নির্ধারিত তাপমাত্রায় রেখে কাজ করা।

সফ্টওয়্যার নিরাপত্তাসমুহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- ইন্টারনেট থেকে আগত ভাইরাস ও নানা প্রকার থ্রেট থেকে সফটওয়্যারকে সুরক্ষা প্রদান করা।

- অপারেটিং সিস্টেম আপ-টু-ডেট রাখা
- বিশ্বস্ত নয় এমন পেনড্রাইভ কম্পিউটারে সংযোগ না করা
- সিস্টেমে সব সময় এন্টিভাইরাস আপডেট রাখা

হার্ডওয়্যারের ড্রাইভার সফটওয়্যার সমূহ

কখনো ভেবে দেখেছ, কিভাবে হার্ডওয়্যার বোঝে তাকে সফটওয়্যার কী কাজ করতে বলেছে? এই বোঝানোর দ্বায়িত্ব নেয় এক ধরণের সফ্ওয়্যার যাদের আমরা ড্রাইভার সফটওয়্যার বলি। যেমন- গেম খেলা, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ইত্যাদি কাজে গ্রাফিক্স ড্রাইভার; ইন্টারনেটের সাথে ডিভাইস সংযুক্তির জন্য ল্যান কার্ড ড্রাইভার, ইনফরমেশন শেয়ারিংয়ের জন্য Blue-tooth, সাউন্ড কার্ড ড্রাইভার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ড্রাইভার সফটওয়্যার।

সফটওয়্যারের ম্যানুফ্যাকচারার কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা বিধিসমূহ

প্রযুক্তির মুল লক্ষ্যই হলো সবসময় পুর্বের অবস্থা থেকে উন্নত হওয়া। এজন্য নতুন নতুন ক্ষতি বা বিপদ থেকে সফটওয়্যারকে রক্ষা করতে সফটওয়্যার আপ-টু- ডেট রাখা, সফটওয়্যারের লাইসেন্সের মেয়াদ চেক করা, এন্টি ম্যালওয়্যার (Anti Maleware) সফটওয়্যারের সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু (protection On) আছে কি না বা সেগুলো হাল নাগাদ (up to date) আছে কি না তা খেয়াল রাখা, হাল নাগাদ না থাকলে তা হাল নাগাদ করা সফটওয়্যারসমুহকে নিরাপদ রাখার অন্যতম কয়েকটি কৌশল।

পাসওয়ার্ড রুল

বর্তমান বিশ্বে তথ্য একটি সম্পদ এবং এই সম্পদকে সুরক্ষিত রাখতে আমরা তালা-চাবি হিসেবে ব্যবহার করি এক টুকরো শব্দগুচ্ছ যাকে পাসওয়ার্ড (PASSWORD-Personal Access Security Service Without Regular Decloser) বলা হয়ে থাকে। অন্য কেউ যেন আমাদের তথ্য চুরি করে নিতে না পারে এজন্য পাসওয়ার্ডকে অবশ্যই শক্তিশালি হতে হবে। পাসওয়ার্ড শক্তিশালী করার কিছু নিয়ম আছে যাদের পাসওয়ার্ড রুল বলা হয়ে থাকে-

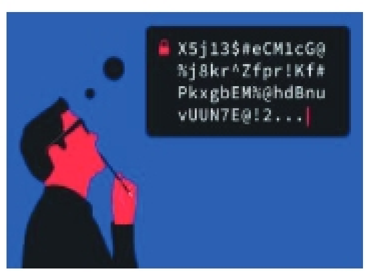

- পাসওয়ার্ড কমপক্ষে ৮ অক্ষর (character) বা তার বেশি দীর্ঘ করা, যত বেশি অক্ষর তত বেশি নিরাপত্তা।

- বড় অক্ষর, ছোট অক্ষর, অক্ষর-সংখ্যা একত্র করে পাসওয়ার্ড বানানো।
- কমপক্ষে একটি বিশেষ (Special) অক্ষর (!,@,#) ব্যবহার করা।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (Administrator) একাউন্টে পাসওয়ার্ড ব্যবহার

অবাঞ্চিত অনুপ্রবেশকারীর থেকে আমাদের বাড়ি বাচাতে আমরা তালা ব্যবহার করি। ভেবে দেখো তো, আমাদের ডিভাইসসমুহকে এই অবাঞ্চিত অনুপ্রবেশকারীদের থেকে বাঁচাতে আমরা কি করতে পারি? এক্ষেত্রে আমরা ডিভাইসসমূহে তালা (Lock) হিসেবে পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখতে পারি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টে পাসওয়ার্ড দিলে একাউন্টদারি ব্যতীত অন্য কেউ কম্পিউটারে প্রবেশ করতে পারবে না। কোনো অনাকাংখিত সফটওয়্যার ইন্সটল করা বা তথ্য মুছে ফেলতে পারবে না এবং কম্পিউটার সুরক্ষিত থাকবে।

অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফ্টওয়্যারের লাইসেন্স

সফ্টওয়্যার লাইসেন্সসমুহ ব্যবহারকারিদের সে সফ্টওয়্যারটিকে বৈধ ভাবে ব্যবহার ও বিতরণ করার একটা বৈধ নির্দেশনা ও অনুমতি দেয় যা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন করে না। এর ফলে ডেভেলপার যেমন নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না, তেমনি ব্যবহারকাররি সহজে সফ্টওয়্যার ব্যবহার করতে পারে। সফ্টওয়্যার লাইসেন্সসমুহের হালনাগাদের মাধ্যমে সফ্টওয়্যারসমূহ নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য ও আরো বেশি নিরাপদ হয়।

অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফ্ওয়্যারের লাইসেন্স নবায়নের ফ্লোচার্ট

সফ্টওয়্যার লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সফ্টওয়্যার কোম্পানি ব্যবহারকরিকে সফ্টওয়্যার নবায়ন করার একটি মেসেজ দেবে। ব্যবহারকারি ইউজার যদি সফ্টওয়্যার নবায়ন করতে চায় তবে সে পেমেন্ট সম্পন্ন করে সফ্টওয়্যার নবায়ন করে নেবে, আর যদি পেমেন্ট না করে তবে নবায়ন সম্পন্ন হবে না। নিচে তার একটি ফ্লোচার্ট দেখানো হল।

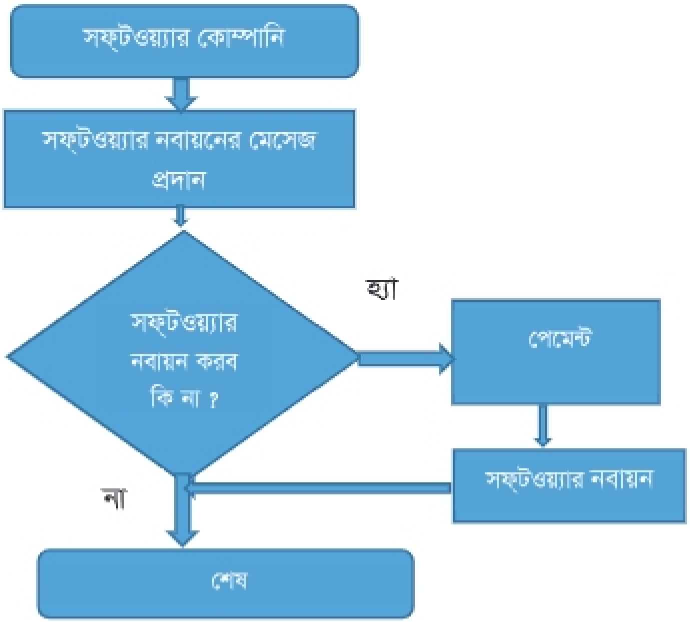

চিত্র ৬.১: সফ্‌টওয়্যারের লাইসেন্স নবায়নের ফ্লোচার্ট

৬.২ সিকিউরিটি (Security Threat) থ্রেট

কোন সিস্টেমের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে এবং সিস্টেমে যখন বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে দেখা দেয় তখন এগুলোকে সিকিউরিটি থ্রেট বলা হয়। সিকিউরিটি থ্রেট এর মাধ্যমে কম্পিউটার থেকে ডাটা চুরি, ডিভাইসের কম্প্রোমাইজেশন, সিস্টেম অকেজো হয়ে যাওয়া সহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। সিকিউরিটি থ্রেটগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

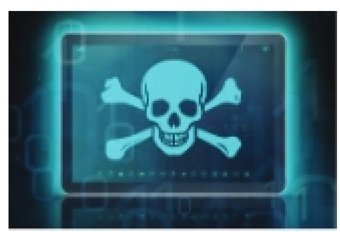

- হার্ডওয়্যার থ্রেট: পাওয়ার ফেইলোর, সার্কিট ঠিকমত সংযোগ না দেওয়া, মেমোরির কাছে চুম্বক থাকা ইত্যাদি।
- সফটওয়্যার থ্রেট: ম্যালওয়্যার (Maleware) (ভাইরাস (VIRUS-Vital Information Resources Under Seize), ওয়ার্ম (Worm), ট্রোজান হর্স (Trojan horse), স্পাইওয়্যার (Spyware), র‍্যানসমওয়্যার (Ransomware) ইত্যাদি সিস্টেমে প্রবেশ করা।

২০২৪

অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফ্টওয়্যারের জন্য সম্ভাব্য সিকিউরিটি থ্রেট সমূহ

ইচ্ছাকৃতভাবে সিস্টেমের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে কিংবা নিজেদেরকে সফ্টওয়্যার পাইরেসি (Piracy) থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিনিয়তই সফ্টওয়্যার উন্নয়কারি বা কিছু অসাধু ডেভেলপার নতুন নতুন সিকিউরিটি থ্রেট উদ্ভাবন করছে। বিভিন্ন ধরনের কিছু সাধারণ সিকিউরিটি থ্রেট হলো-

- **ভাইরাস:** কম্পিউটার ভাইরাস এক ধরনের ক্ষতিকর কম্পিউটার প্রোগ্রাম যাকে হোস্ট একটিভ করে দিলে নিজে নিজেই প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস আছে যেমন ফাইল ভাইরাস, সেক্টর ভাইরাস, ম্যাক্রো ভাইরাস ইত্যাদি । ফাইল ভাইরাস কোড এক্সেকিউটেবল ফাইলের সাথে সংযুক্ত থাকে, সেক্টর ভাইরাস ডিস্কের পার্টিশন টেবিলে সমস্যা তৈরি করে এবং ম্যাক্রো ভাইরাস ম্যাক্রো ভাষা ব্যবহার করে লেখা হয়।
- **ওয়ার্ম:** এই প্রোগ্রামগুলো হোস্টের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজের প্রতিরূপ তৈরি করে ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
- **ট্রোজান হর্স:** এই ম্যালওয়্যারগুলো স্বাভাবিক সফটওয়্যারের ছদ্মবেশে সিস্টেমে ঢুকে সিস্টেমে সমস্যার সৃষ্টি করে।
- **ট্রোজান বম্ব:** এ ধরণের ম্যালওয়্যার সিস্টেমে ঢুকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর একটিভ হয়ে সিস্টেমকে কম্প্রোমাইজড করে ফেলে।
- **স্পাইওয়্যার:** এগুলো সিস্টেমে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ব্যবহারকারির অনুমতি ছাড়াই থার্ড-পার্টির কাছে পাঠিয়ে দেয়।

সিকিউরিটি থ্রেট দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণসমূহ

কম্পিউটারের আচরনই বলে দেয় কোনো কম্পিউটার সিকিউরিটি থ্রেটের কবলে পড়েছে কিনা। যদি দেখা যায়-

- কম্পিউটার বারবার চালু হচ্ছে ,
- ইন্টারনেটে যুক্ত কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রন অন্যের হাতে চলে গেছে,
- বারবার কম্পিউটার স্থবির (Hang) হচ্ছে ,
- কম্পিউটার ফাইল নষ্ট হইয়ে যাচ্ছে,
- কম্পিউটারের তথ্য চুরি হচ্ছে

তখন বুঝতে হবে কম্পিউটারটি সিকিউরিটি থ্রেটের শিকার হয়েছে।

সিকিউরিটি থ্রেট এর সম্ভাব্য কারণসমূহ

অন্যের তৈরি করা বা সংরক্ষিত তথ্য অর্থেক উপায়ে নিজের ব্যবহারের জন্য বা ইনফরমেশন চুরির জন্য, সিস্টেমকে অকেজো করতে বা অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্যে সিস্টেম কে সিকিউরিটি থ্রেটের কবলে পড়তে হয় । এছাড়াও -

- বিশ্বাসযোগ্য নয় (Untrusted) এমন উৎস থেকে আসা লিংক এ ক্লিক করলে,
- যেখানে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রাখলে ,
- ম্যালওয়্যার এফেক্টেড ডিভাইস যেমন ফ্লাশ মেমোরি বা পেন ড্রাইভ কম্পিউটারে প্রবেশ যেনতেন ভাবে করলে
- অ্যান্টিভাইরাস বা অ্যান্টিম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার না করলে
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কোড অন্যকে দিয়ে দিলে

কম্পিউটার বা এরূপ ডিভাইসসমূহ সিকিউরিটি থ্রেটের শিকার হতে পারে।

সিকিউরিটি থ্রেট হতে পরিত্রানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ

কম্পিউটার ব্যবহারে সর্বোচ্চ সচেতনতা ও সতর্কতা সিস্টেমকে সিকিউরিটি থ্রেটের হাত থেকে বাঁচাতে বড় ভূমিকা পালন করে। এজন্য-

- কোনো অবিশ্বস্ত উৎস থেকে আসা ফাইল লিংক, সিস্টেম প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পেনড্রাইভ/সিডি ব্যবহারের পূর্বে স্ক্যান করে নিতে হবে ।
- অ্যান্টিম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার হাল নাগাদ রাখতে হবে।
- সর্বোপরি ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় যেখানে সেখানে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬.৩ এন্টিভাইরাস বা এন্টি ম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার

এন্টিভাইরাস হলো কম্পিউটারের ভাইরাস প্রতিষেধক। কম্পিউটারের প্রোগ্রামসমূহকে ভাইরাস মুক্ত করার জন্য এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাই এর কাজ। এন্টিভাইরাস অর্থাৎ কম্পিউটারকে ভাইরাসমুক্ত করা বা ভাইরাস থেকে কম্পিউটারকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম। কম্পিউটারের প্রোগ্রামসমূহকে ভাইরাস মুক্ত রাখার জন্য বর্তমানে যে সকল এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে-AVG, Panda Antivirus, Toolkit, Kaspersky, PC-Cillin, TrojanHunter, Avast AntiVirus, Norton Antivirus, McAfee ইত্যাদি। কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম ও অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজসমূহ ইনস্টল করার পর উহাতে সর্বশেষ হালনাগাদ করা এন্টিভাইরাস ইনস্টলেশন খুবই জরুরি। উপযুক্ত এন্টিভাইরাস এর অভাবে নিত্য নতুন ভাইরাস কম্পিউটারে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। কম্পিউটার সিস্টেমে এন্টিভাইরাস বা এন্টিম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার থাকলে তা সিকিউরিটি থ্রেটের হাত থেকে অনেকাংশেই সুরক্ষিত থাকে। উইন্ডোজ ১০ এর সাথে বিল্ট-ইন এন্টিভাইরাস উইন্ডোজ ডিফেন্ডার থাকে । এছাড়াও ক্যাসপারেসকি, নরটন, আভাস্ট প্রভৃতি জনপ্রিয় এন্টিভাইরাস সফ্‌টওয়্যার খুব সহজে ডিভাইসে ডাউনলোড ও ইনস্টল করে সিস্টেমকে নিরাপদে রাখা যায়।

চিত্র ৬.২ঃ বিভিন্ন এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার আইকন

ম্যালওয়্যার গার্ড চালু

শুধু এন্টিম্যালওয়্যার সফ্টওয়্যার ডাউনলোড বা ইন্সটল করে রেখেই সিস্টেমকে নিরাপদ রাখার কাজ শেষ হয়ে যায় না। ম্যানওয়্যার গার্ড অ্যানাবল করে না রাখলে খুব সহজেই ম্যালওয়্যার সিস্টেমে ঢুকে পড়তে পারে।এজন্য সুষ্ঠু নিয়ম মোতাবেক এন্টিম্যালওয়্যার সফ্টওয়্যারকে কম্পিউটারে সক্রিয় (Active) করে রাখতে হয় ।

৬.৪ সিস্টেম রিকভারি সফ্টওয়্যার

অনেক সময় অসতর্কতাবশত আমরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে বা ফাইল ডিলেট করে ফেলি। আবার কখনো সিস্টেমে সিকিউরিটি থ্রেটের ফলে অনেক তথ্য হারিয়ে যেতে পারে। এ হারিয়ে যাওয়া তথ্য পুনরুদ্ধার বা ইনফরমেশন ব্যাকআপের জন্য ব্যবহার করা হয় সিস্টেম রিকভারি সফ্টওয়্যার। বর্তমানে সিস্টেম রিকভারি সফটওয়্যারের মধ্যে Stellar data recovery, EaseUS data recovery wizard, Disk drill, Crashplan, Recuva অন্যতম।

Steller EaseUs DiskDrill Crashplan Recuva

চিত্র ৬.৩ বিভিন্ন ডাটা রিকভারি সফ্টওয়্যার এর আইকন

৬.২.৮ এন্টি ম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত ফাইলগুলোকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো

এন্টিম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার ডিভাইসে থাকা সকল ফাইলগুলোকে স্ক্যান করে তার ডাটাবেজে রেখে দেয়। এরপর এটি আক্রান্ত ফাইলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা ম্যানুয়ালি মুছে ও অপসারণ করে বা পৃথক করে রাখে দেয়। পৃথক করে পাঠানো বলতে এসব ফাইলকে লুকানো ফোল্ডারে পাঠিয়ে দেয়া কে বুঝায়। এ লুকানো ফাইলকে অনেকটা উচ্চ নিরাপত্তা কারাগারের সাথে সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যেখান থেকে এ ফাইলগুলো সিস্টেমে কোনো ধরণের কার্যকলাপ করতে না পারে।

বি:দ্র:

যেকোনো এন্টিম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার হালনাগাদ, পূনরায় অনুমতি নেয়া, ড্রাইভার সফ্‌টওয়্যার নামানো, রিকভারি সফ্‌টওয়্যার ডাউনলোডকরণ, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার প্রভৃতিতে কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ অপরিহার্য। এই সংযোগ আমরা বিভিন্নভাবে দিতে পারি-

- মোবাইল ডেটা সংযোগ
- ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ
- ওয়্যারলেস সংযোগ
- ক্যাবল সংযোগ

তবে ব্যবহারের আগে ডিভাইসে ইন্টারনেট সংযোগ হয়েছে কিনা চেক করে নিতে হবে।

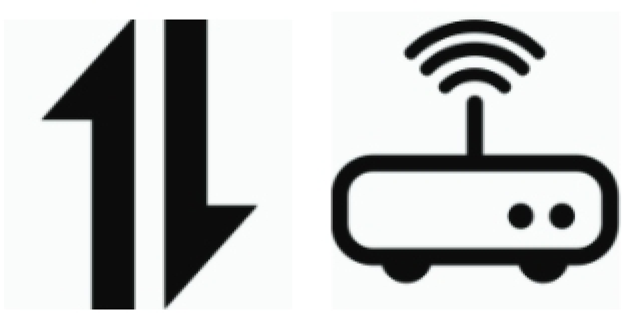

বিভিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের আইকন

জব শীট (Job Sheet)

জব-১: কম্পিউটারের নিরাপত্তা ইস্যুগুলোকে চিহ্নিত করে পদ্ধতিগতভাবে সমাধান করণ।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- হার্ডওয়্যার ও সফ্‌টওয়্যারের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসমুহ চিহ্নিত করা;
- হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার কর্তৃক প্রদত্ত ড্রাইভার সফটওয়্যারের আপডেট চেক করা;
- সফ্‌টওয়্যারের ম্যানুফ্যাকচারার কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা বিধি সমূহ চিহ্নিত করা
- পাসওয়ার্ড নীতিমালা মেনে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট এর পাসওয়ার্ড দেওয়া;
- পাসওয়ার্ডে মেনে গোপনীয়তা রক্ষা করে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা;
- অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যারের লাইসেন্স সমূহ আছে কি না শনাক্ত করা ;
- মেয়াদ উত্তীর্ণ সফওয়্যারের লাইসেন্সগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী আপডেট/নবায়ন করা;
- অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফওয়্যারের লাইসেন্স নবায়নের টাইমচার্ট প্রস্তুত করে ডকুমেন্টেশন করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী কাপড়ের তৈরি	১ টি
২	মাস্ক	সার্জিক্যাল/কাপড়ের তৈরি	১ টি
৩	জুতা বা সেন্ডেল	অপরিবাহী রাবার বা চামড়ার তৈরি	১ জোড়া

যন্ত্রপাতি:

ক্রমিক নং	মেশিন ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	ডেস্কটপ কম্পিউটার/ল্যাপটপ/ নেটওয়ার্ক যুক্ত পিসি	ইন্টারনেট যুক্ত যে কোন কম্পিউটার	১ সেট

সফ্টওয়্যার:

ক্রমিক নং	সফটওয়্যারের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	উইন্ডোজ ১০ বা তদোর্ধ ভার্সণের অপারেটিং সিস্টেম	অপারেটিং সিস্টেম সাপোর্টেড বিট সংখ্যা - ৬৪ বিট	১ টি
২	এন্টি ভাইরাস	লাইসেন্স ভার্সন	১ টি

অন্যান্য

✓ ইন্টারনেট কানেকশন।

কাজের ধারা:

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান করো।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিরীক্ষা করো।

১. হার্ডওয়্যারের আশেপাশে তরল যেমনঃ পানি, জুস, চা, কফি ইত্যাদি আছে কি না দেখো।

২. ডিভাইস ও কম্পোনেন্টসমূহে ধুলাবালি যাতে না পড়ে বা স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় যেন না থাকে তা খেয়াল করো।

৩. কম্পিউটারের কুলিং ফ্যান ঠিকমত কাজ করছে কিনা চেক করো।

৪. হার্ডওয়্যার চুরি হওয়া থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না দেখো।

৫. ফায়ারওয়াল (Firewall) Status যাচাই করা

৫.১ টাস্কবারে Type here to search এ Control Panel লিখে এন্টার কী-তে চাপ দাও, একটি মেনু ওপেন হবে।

৫.২ মেনু থেকে কন্ট্রোল প্যানেল (Control Panel) নির্বাচন করো।

৫.৩ কন্ট্রোল প্যানেল থেকে সিস্টেম এন্ড সিকিউরিটি (System and Security) নির্বাচন করো।

৫.৪ সিস্টেম এন্ড সিকিউরিটি থেকে উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল (Windowsn Fifewall) অপশনে ক্লিক করো।

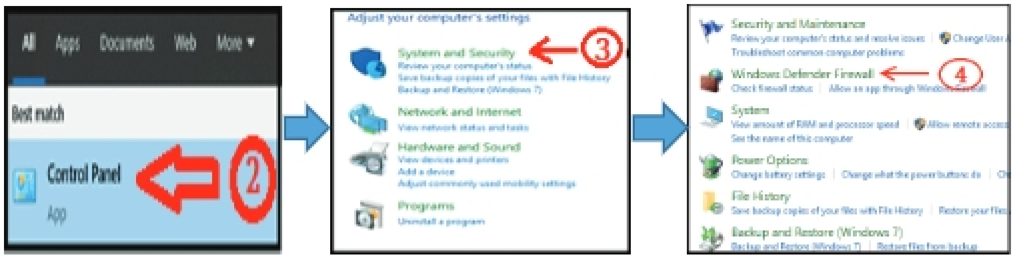

ফায়ারওয়াল যাচাই

৬. এন্টি-ম্যালওয়ার সফটওয়ার চালু আছে কি না যাচাই করো।

টাস্কবারে Type here to search এ Windows Security লিখে এন্টার দাও, একটি মেনু ওপেন হবে।

Security at a glance ওপেন হবে, এখানে এন্টি-ম্যালওয়ার সফটওয়ার চালু আছে কি না যাচাই করো।

৭. ওয়্যারলেস ল্যান কার্ড ড্রাইভার হালনাগাদ করা-

৭.১ উইন্ডোজ আইকনে ডান বাটনে ক্লিক কর, এতে একটি মেনু ওপেন হবে।

৭.২ মেনু থেকে Device manager নির্বাচন করো।

৭.৩ Device manager এ Network Adapter এর সামনে থাকা পয়েন্টারে ক্লিক করে সেকশনটিকে বর্ধিত করো।

৭.৪ নেটওয়্যার্ক এডাপ্টারের প্রোপার্টিস (Propertise) চেক কর তার উপরে - ডান বাটনে ক্লিক করে Properties এ যাও।

৭.৫ ওপেন হওয়া মেনু থেকে Driver ট্যাবে ক্লিক করে ড্রাইভার ভার্সন চেক করো।

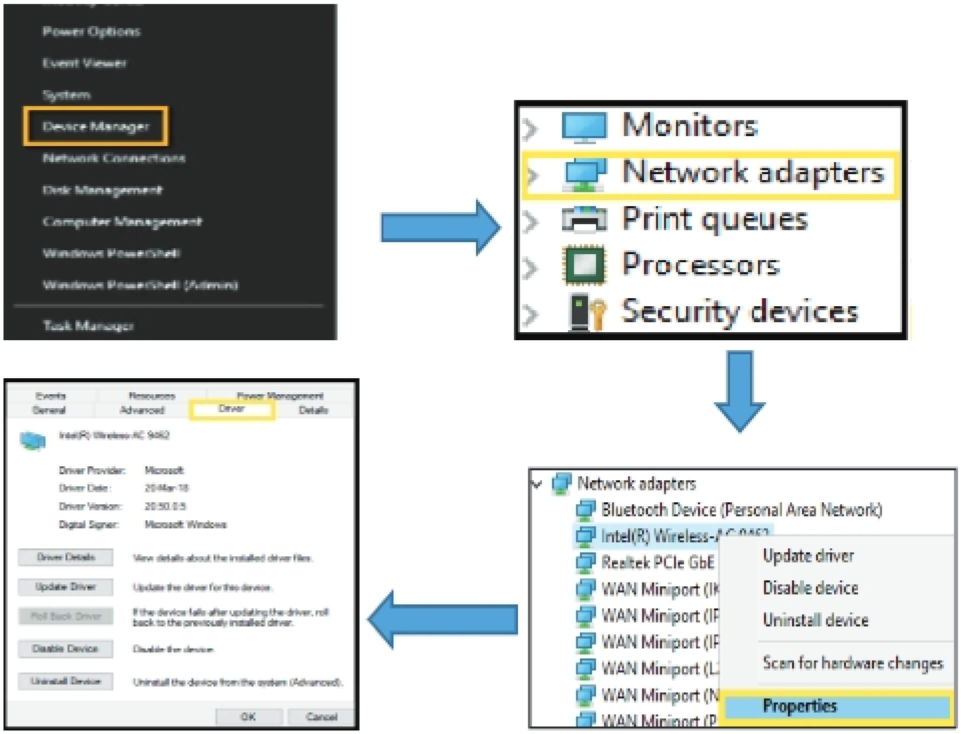

ড্রাইভার সফটওয়্যার হাল নাগাদ যাচাই করা

৮. সফ্‌টওয়্যারের ম্যানুফ্যাকচারার কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা বিধানসমূহ নিরীক্ষা করা।

৮.১ কন্ট্রোল প্যানেল (Control Panel) থেকে সিস্টেম এন্ড সিকিউরিটিতে (System and Security) যাও।

৮.২ এরপর প্রাপ্ত মেনু থেকে সিকিউরিটি এন্ড মেইন্টেন্যান্স (Security and Maintenance) এ ক্লিক করো।

৮.৩ সিকিউরিটি লেখার বামে থাকা পয়েন্টার চিহ্নে ক্লিক করে বর্ধিত করো এবং নেটওয়ার্ক ফায়ারওয়াল ও ভাইরাস প্রোটেকশনের নিচে লেখা ভিউ ইন উইন্ডোজ সিকিউরিটিতে (View in Windows Security) ক্লিক করে ফায়ারওয়াল এবং এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার অন (On) আছে কি না যাচাই করো।

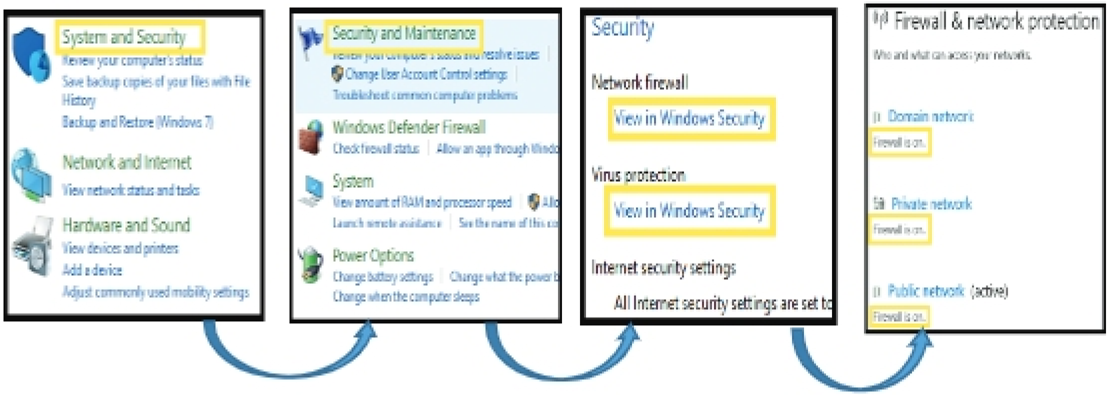

ফায়ারওয়াল ও এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারের একটিভেশন যাচাই

৮.৪ ফায়ারওয়াল এবং এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার যদি বন্ধ (Off) থাকে, তাহলে বন্ধ হওয়া নেটওয়ার্কের ক্লিক করে চালু (On) অপশন সচল করে দাও।

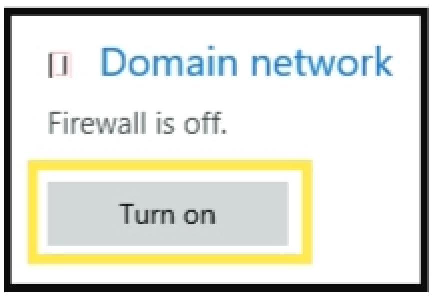

৯. অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট এর পাসওয়ার্ড দেয়া-

৯.১ কমপক্ষে ৮ অক্ষর (Character) দীর্ঘ পাসওয়ার্ড দাও, যত বেশি অক্ষর তত বেশি নিরাপদ

৯.২ বড় অক্ষর (uppercase) ছোট অক্ষর (Lowercase), বর্ণ-সংখ্যা একত্র করে বানাও।

৯.৩ কমপক্ষে একটি বিশেষ অক্ষর (!,@,#) ব্যবহার করো।

১০. সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা-

১০.১ উইন্ডোজ আইকনে ডান বাটনে-ক্লিক করে পপ-আপ মেনু থেকে কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট (Computer Management) অপশন সিলেক্ট করো।

১০.২ কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট থেকে লোকাল ইউজার এন্ড গ্রুপস (Local User and Groups) গিয়ে ইউজারে ক্লিক করো।

১০.৩ এরপর লোকাল ইউজার এ ডান বাটনে ক্লিক করে সেট পাসওয়ার্ড (Set Password) নির্বাচন করো।

১০.৪ পপ-আপ উইন্ডোতে প্রসিড (Proceed) লেখায় ক্লিক করো।

১০.৫ নিউ পাসওয়ার্ডের ঘরে নতুন বানানো পাসওয়াডটি লিখে OK বাটলে ক্লিক করো।

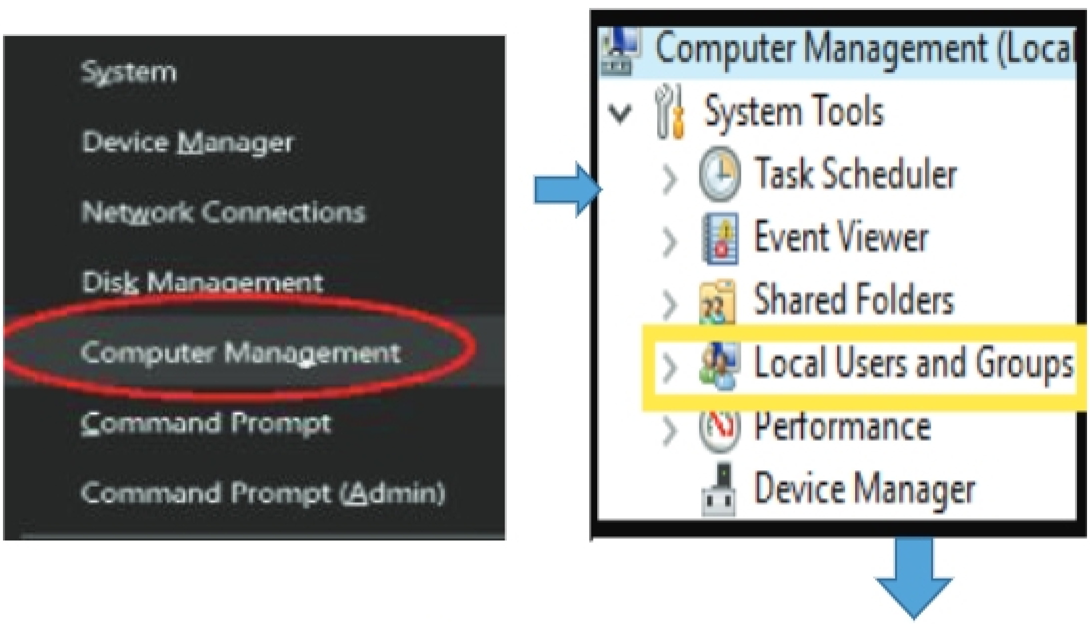

দ্রঃ চিত্রের বাকি অংশ পরের পাতায়

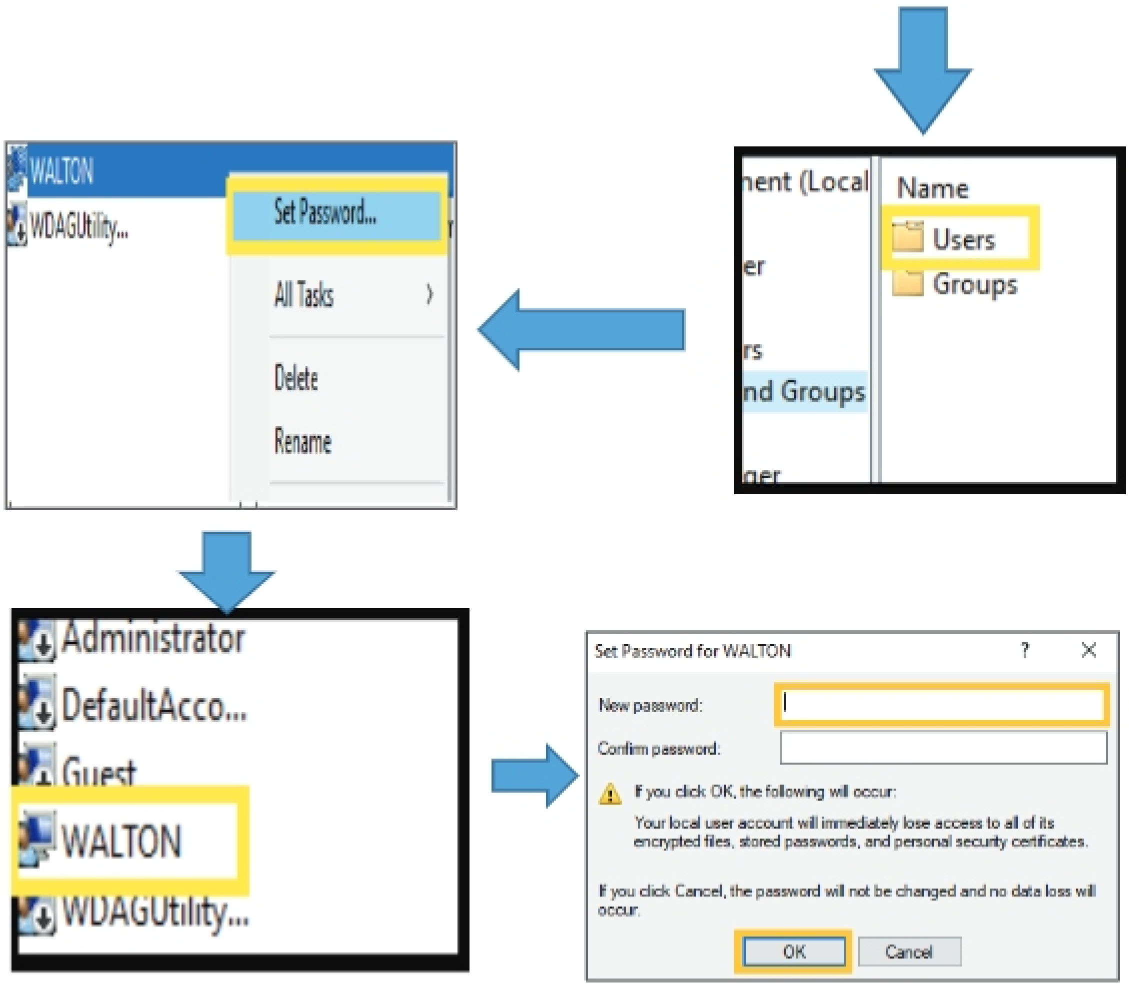

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টের পাসওয়ার্ড সেট করণ

১১. পাসওয়ার্ড নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা-

১১.১ পাসওয়ার্ডসমুহ অন্য কারো সাথে শেয়ার করো না।

১১.২ নির্দিষ্ট সময় পরপর অথবা একাউন্ট কম্প্রোমাইজড (Compromised) হয়েছে বা হতে পারে মনে হলে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে দাও।

১১.৩ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে দীর্ঘ পাসওয়ার্ড বানানোর চেষ্টা করো।

১১.৪ অনিরাপদ কোনো জায়গায় পাসওয়ার্ড লিখে রাখা বা সংগ্রহ করো না।

১২ অপারেটিং সিস্টেম সফ্টওয়্যারের লাইসেন্স শনাক্ত করা।

১২.১ স্টার্ট মেনুতে (উইন্ডোজ আইকনে) গিয়ে সেটিংসে ক্লিক করো।

১২.২ এরপর পপ-আপ মেনু থেকে আপডেট এন্ড সিকিউরিটি (Update and Security) ক্লিক করো।

১২.৩ বাম পাশের অপশন থেকে এক্টিভেশনে (Activation) ক্লিক করে অপারেটিং সিস্টেম লাইসেন্স সহ সক্রিয় আছে কি না যাচাই কর। যদি “Windows is active with a digital license” লেখা থাকে, তাহলে বুঝতে হবে অপারেটিং সিস্টেম লাইসেন্স সহ এক্টিভ (Active) আছে।

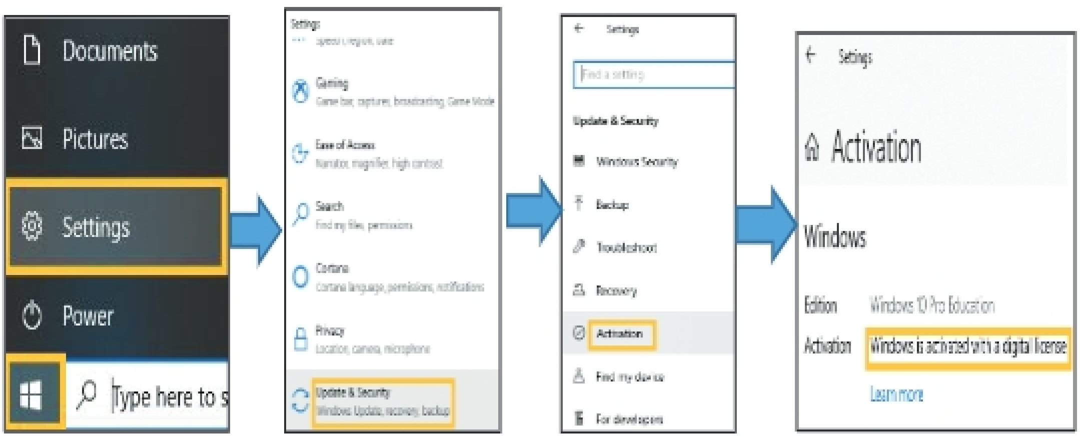

লাইসেন্স যাচাই

১৩. সফওয়্যারের হালনাগাদ/নবায়ন করা

ক্যাসপারস্কি অ্যান্টি-ভাইরাস মেয়াদ শেষে নবায়ন-

১৩.১ মূল অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডোটি ওপেন করো

১৩.২ মূল উইন্ডোর নীচের অংশে License: N days remaining এ ক্লিক করো।

১৩.৩ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে অ্যাক্টিভেশন কোডটি দাও।

১৩.৪ Enter activation code বাটনে ক্লিক করো।

১৩.৫ Save activation code বাটনে ক্লিক করো।

১৩.৬ Done বাটনে ক্লিক করো।

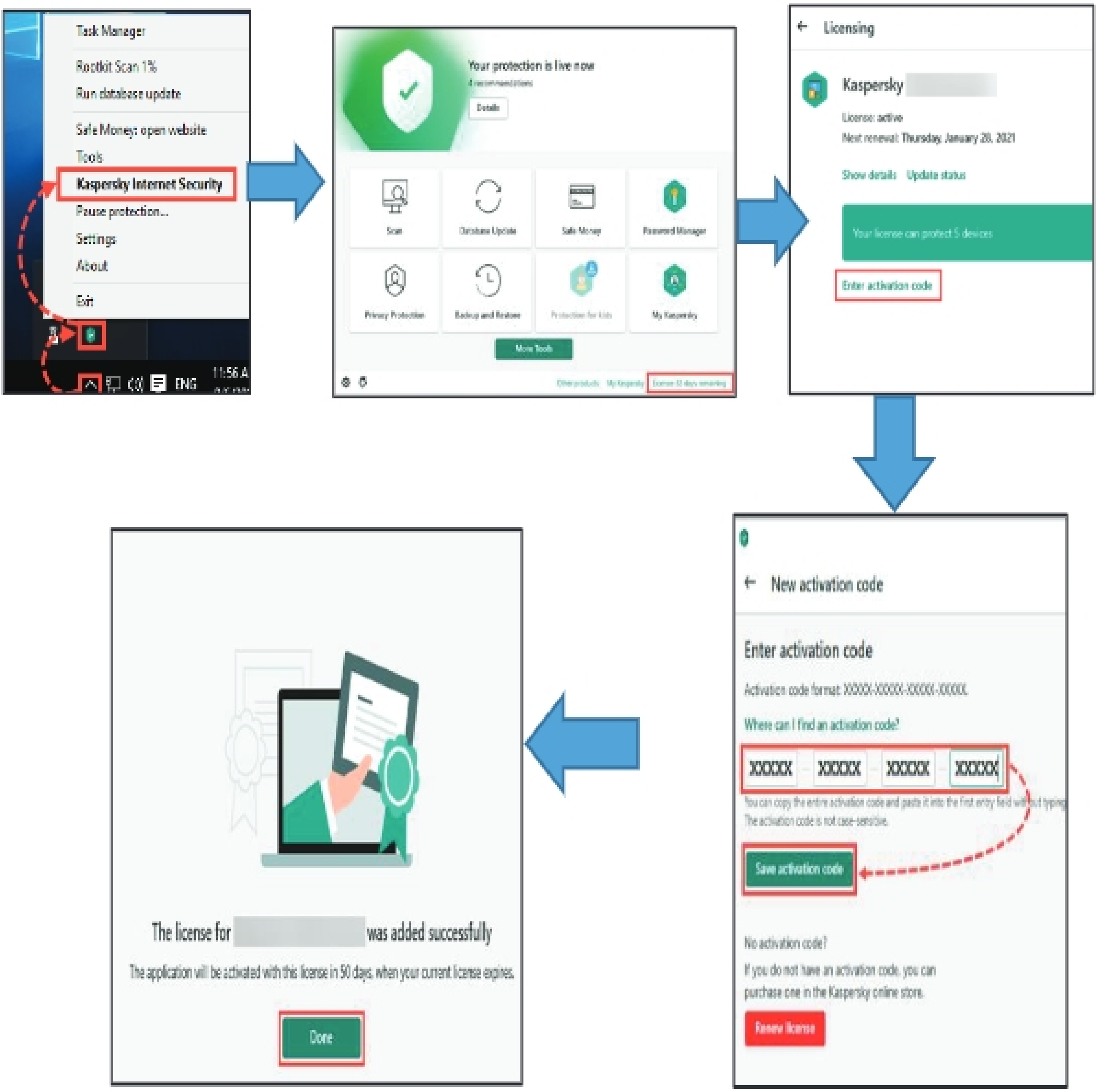

এন্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার লাইসেন্স নবায়ন

কাজের সতর্কতা:	অপ্রয়োজনে কোন অপশন চালু বা বন্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

জব-২: সিকিউরিটি থ্রেট শনাক্ত করণ, থ্রেট থেকে ডেটাকে সুরক্ষা এবং ম্যালওয়্যার ডাটাবেজ হালনাগাদ করা।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফ্‌টওয়্যারের সম্ভাব্য সিকিউরিটি থ্রেট সমূহ চিহ্নিত করা;
- সনাক্তকৃত সিকিউরিটিথ্রেট এর ধরন সমূহ চিহ্নিত করা;
- সনাক্তকৃত সিকিউরিটি থ্রেট এর সম্ভাব্য কারণ সমূহ চিহ্নিত করা;
- একটি এন্টি ম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার ইন্সটল করার পূর্বে সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার স্ক্যান নিশ্চিত করা;
- এন্টি ম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার ইন্সটল করার জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ অনুসরন করা;
- প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ অনুসরণ করে ম্যালওয়্যার গার্ড চালু করা;
- সিস্টেম রিকভারি সফ্‌টওয়্যার ইন্সটল করার জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ অনুসরণ করা;
- গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও ফোল্ডার ব্যাকআপ জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ অনুসরণ করে নিধারিত স্টোরেজে ডাটা সংরক্ষন করা;
- এন্টি ম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্থ ফাইলগুলোকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো;
- এন্টি ম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করে সিস্টেম থেকে সিকিউরিটি থ্রেট অপসারণ করা;
- এন্টি ম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার হালনাগাদ আছে কি না তা নিশ্চিত করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন/ড্রেস কোড অনুযায়ী পোশাক	সংস্থার বিধি অনুযায়ী কাপড়ের তৈরি	১ টি

২	মাস্ক	সার্জিক্যাল/কাপড়ের তৈরি	১টি
৩	জুতা বা সেন্ডেল	অপরিবাহী রাবার বা চামড়ার তৈরি	

যন্ত্রপাতি

ক্রমিক নং	মেশিন ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	কম্পিউটার/ল্যাপটপ/নেটওয়ার্ক/ পিসি/সার্ভার	যুগপোযোগি কম্পিউটার	১ সেট

সফ্টওয়্যার

ক্রমিক নং	মেশিন ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	স্বীকৃত ও কার্যকর এন্টিভাইবাস	আপডেট লাইসেন্স ভার্সন	১ টি
২	উইন্ডোজ	১০ বা তদ্ধোর্ধ ভার্সন	১ টি
৩	ডিস্ক ড্রিল (ডেটা রিকভারি সফ্টওয়্যার)	আপডেট ভার্সন	১ টি
৪	গুগল ড্রাইভ (ভার্চুয়াল স্টোরেজ ড্রাইভ	ফ্রি বা পেইড	প্রয়োজনমত

অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা

- ✓ ইন্টারনেট সংযোগ।

২০২৪

কাজের ধারা-

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান করো।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিরীক্ষা করে তা নিশ্চিত করো।

অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যারের সম্ভাব্য সিকিউরিটি থ্রেটসমূহ হলো-

(ক) Phishing.

(খ) User Account Control (UAC).

(গ) Data Execution Prevention (DEP).

(ঘ) Virus.

১. সিকিউরিটি থ্রেট শনাক্তকরণ -

১.১ কম্পিউটার বারবার রিস্টার্ট (Restart) নেয় কি না দেখো।

১.২ কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রন অন্যর হাতে চলে গিয়েছে দেখো।

১.৩ বারবার কম্পিউটার হেং হয়ে যাচ্ছে কি না দেখো।

১.৪ কম্পিউটার ফাইল নষ্ট হয়েছে কি না দেখো।

১.৫ কম্পিউটারের তথ্য হারিয়ে গিয়েছে কি না দেখো।

২. সিকিউরিটি থ্রেট এর সম্ভাব্য কারণসমূহ শনাক্তকরণ -

২.১ অবিশ্বস্ত উৎস থেকে আসা লিংকে ক্লিক করা হয়েছে কি না দেখো।

২.২ যেখানে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রাখা আছে কিনা দেখো।

২.৩ ম্যালওয়্যার আক্রান্ত ডিভাইস কম্পিউটারে সংযোগ করা আছে কিনা দেখো।

২.৪ অ্যান্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে কিনা দেখো।

৩. এন্টি ম্যালওয়্যার সফ্টওয়্যার ইন্সটল করার পূর্বে সিস্টেম সফ্টওয়্যার স্ক্যান করা-

৩.১ টাস্কবারের নোটিফিকেশন এরিয়া (Notification Area) থেকে উইন্ডোজ সিকিউরিটি (Windows Security) অন করে Virus & threat protection নির্বাচন করো।

৩.২ এরপর Protection History তে ক্লিক করলে স্ক্যানকৃত অ্যাপলিকেশন গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা যাবে ।

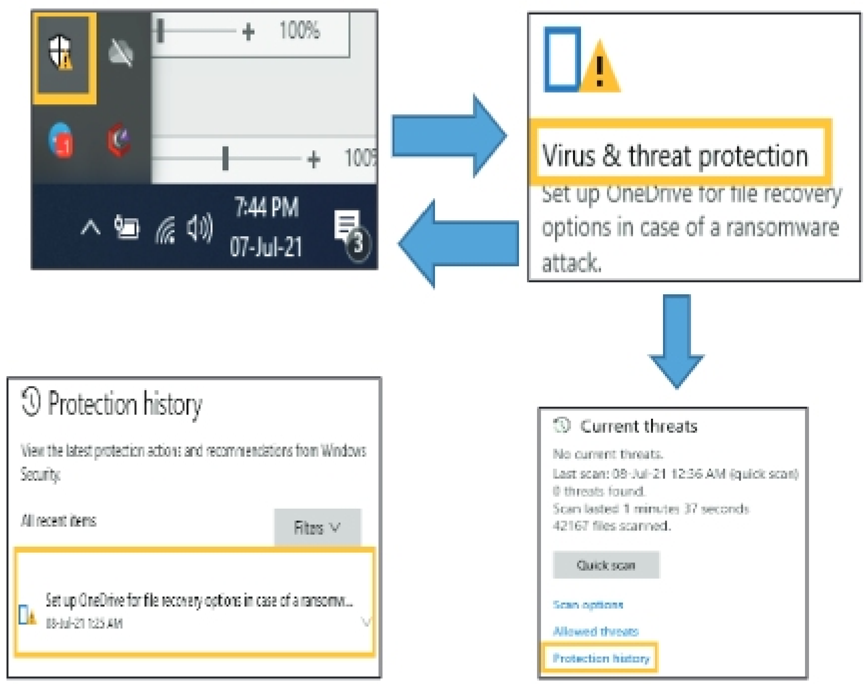

স্ক্যানড অ্যাপ্লিকেশন হিস্ট্রি দেখা

৪. এন্টি ম্যালওয়্যার সফ্টওয়্যার ইন্সটল করার জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ-

৪.১ ব্রাউজার থেকে এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যারের সেটআপ ফাইল ডাউনলোড করো।

৪.২ ডাউনলোড ফোল্ডারে গিয়ে আইকনে ডান বাটনে ক্লিক করে পপ-আপ মেনু ওপেন হলে সেখানে “Run as Administrator” এ ক্লিক করো।

৪.৩ User Account Control ডায়ালগ বক্সে Yes ক্লিক করো।

২০২৪

৪.৪ এরপর ইন্সটল বাটনে ক্লিক করে ইন্সটলেশন সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

৪.৫ ইন্সটলেশন শেষ হলে কন্টিনিউ (Continue) বাটন চাপ।

এন্টি ম্যালওয়্যার ইন্সটলেশন প্রক্রিয়া

৫. ম্যালওয়্যার গার্ড (উইন্ডোজ ডিফেন্ডার) চালু করা-

৫.১ টাস্কবারের নোটিফিকেশন এরিয়া থেকে উইন্ডোজ সিকিউরিটি অন করে ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন (Virus and threat Protection) সিলেক্ট করো।

৫.২ ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন সেটিংসে গিয়ে রিয়েল টাইম প্রটেকশন অন করো।

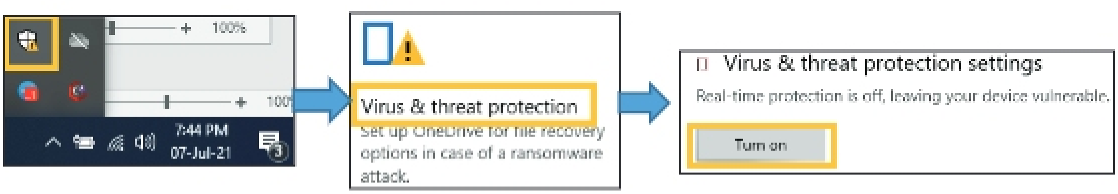

ম্যালওয়্যার গার্ড এক্টিভেশন

৬. সিস্টেম রিকভারি সফটওয়্যার ইন্সটল করার জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ-

৬.১ ব্রাউজারে গিয়ে ডিস্ক ড্রিল ইন্সটলেশন সফটওয়্যার ডাউনলোড করো।

৬.২ ডাউনলোড ফোল্ডারে গিয়ে ডিস্কড্রিল আইকনে ক্লিক করে পপ-আপ মেনু ওপেন হলে সেখানে ইনস্টল এ ক্লিক করে ইন্সটলেশন প্রক্রিয়া শুরু করো।

৬.৩ ইন্সটলেশন শেষ হলে রিস্টার্ট বাটনে ক্লিক করে কম্পিউটার পূণরায় চালু করো।

ডিস্ক ড্রিল ইন্সটলেশন

৭. গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও ফোল্ডার ব্যাকআপ জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ -

৭.১ গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন মুল ফোল্ডার থেকে কপি করে আলাদা পেনড্রাইভে সংরক্ষণ করো-

৭.১.১ পেনড্রাইভটি কম্পিউটার বা ডিভাইসে সংযোগ করো।

৭.১.২ মূল ফোল্ডারটি কপি করে পেনড্রাইভের ফোল্ডারে পেস্ট করো।

৭.২ গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন মূল ফোল্ডার থেকে কপি করে ক্লাউড স্টোরেজে (গুগল ড্রাইভ) সংরক্ষন করা-

৭.২.১ জিমেইল একাউন্ট দিয়ে গুগল ড্রাইভে লগ-ইন করে New তে ক্লিক করো।

৮.২.২ পপ-আপ মেনু থেকে File/Folder upload এ ক্লিক করে প্রয়োজনীয় ফাইল সিলেক্ট কর Open এ ক্লিক করো।

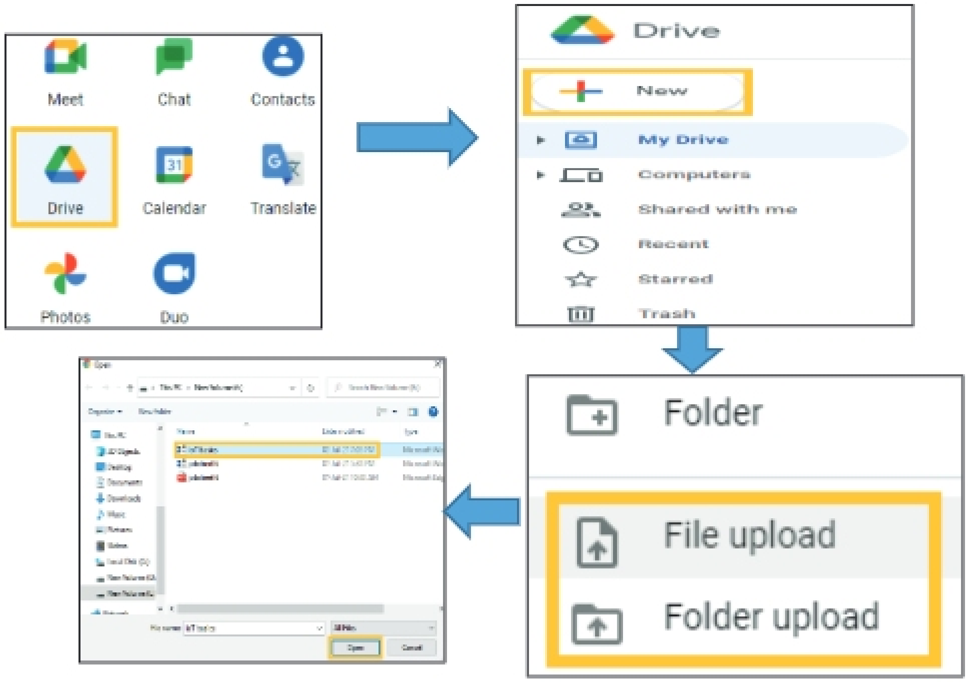

চিত্র: গুগল ড্রাইভে ফাইল/ফোল্ডার আপলোড করণ

৮. ক্ষতিগ্রস্থ ফাইলগুলোকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো-

৮.১ টাস্কবারের নোটিফিকেশন এরিয়া থেকে উইন্ডোজ সিকিউরিটি অন করে ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন নির্বাচন করো।

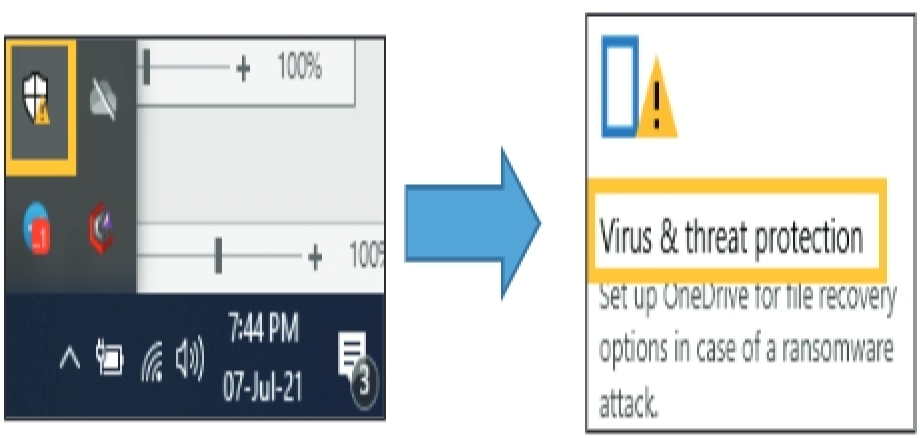

৮.২ Scan option ক্লিক করে Windows Defender Offline scan নির্বাচন করে Scan now এ ক্লিক করো। এই স্ক্যান স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্যালওয়্যার এফেক্টেড ফাইলগুলোকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠাবে।

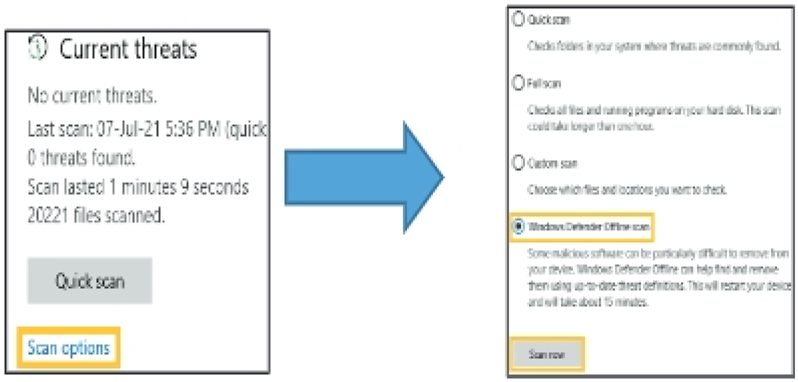

ফাইল স্ক্যানের প্রসিডিওর

৯. সিস্টেম থেকে সিকিউরিটি থ্রেট রিমুভ করা-

উইন্ডোজ ডিফেন্ডার দিয়ে ফাইল স্ক্যান করা হলে অটোমেটিকলি সিকিউরিটি থ্রেটসমুহ ডিলেট বা রিমুভ করে।

১০. এন্টি ম্যালওয়্যার সফ্টওয়্যার হালনাগাদ করা-

১০.১ ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা।

১০.১.২ টাস্কবারের নোটিফিকেশন এরিয়া থেকে উইন্ডোজ সিকিউরিটি আইকনে ডান বাটনে ক্লিক করো।

১০.২ পপ-আপ মেনু থেকে “Check for protection updates” নির্বাচন করো।

এন্টি ম্যালওয়্যার আপডেট চেক

১০.৩ যদি এন্টি ম্যালওয়্যার সফ্টওয়্যার হালনাগাদ না থাকে তবে চেক ফর আপডেটে ক্লিক করো।

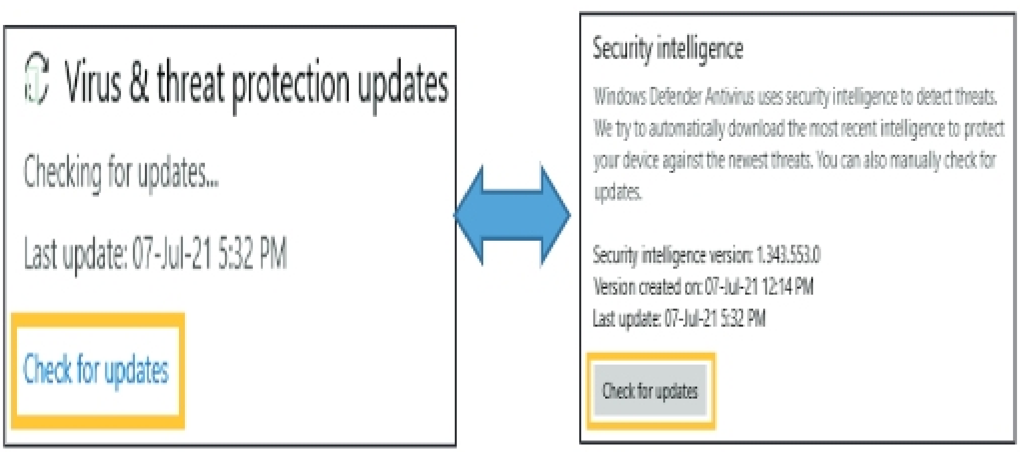

ম্যালওয়্যার আপডেট অন করা

কাজের সতর্কতা: অপ্রয়োজনে কোন অপশন চালু বা বন্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

এসাইনমেন্ট : তোমাদের ল্যাবের কম্পিউটারগুলো এবং সেগুলোতে সংরক্ষিত ডাটাসমূহের সিকিউরিটি লেভেল চেক কর এবং তা সমাধানের ব্যবস্থা করো।

অনুশীলনী-২

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন-

১. ডেটা রিকভারি সফটওয়্যার কী?
২. সেক্টর ভাইরাস কী?
৩. ট্রোজান বম্ব কী?
৪. নরটন সফটয়্যার কেন ব্যবহার করা হয়?
৫. পাসওয়ার্ড কী?
৬. পাসওয়ার্ড কমপক্ষে কত ক্যারেক্টার দীর্ঘ হতে হয়?
৭. ড্রাইভার সফটওয়্যার কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন-

১. ড্রাইভার সফটওয়্যার কেন দরকার?
২. পাসওয়ার্ড রুলগুলো লেখ।
৩. কম্পিউটারের নিরাপত্তা রক্ষায় করণীয় কী?
৪. কীভাবে হার্ডওয়্যারের নিরাপত্তা প্রদান সম্ভব?
৫. পাসওয়ার্ডের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
৬. কী কী উপায়ে কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন দেওয়া সম্ভব?

রচনামূলক প্রশ্ন-

১. কম্পিউটারের নিরাপত্তা কেন প্রয়োজন তার বর্ণনা দাও।

২. এন্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার কীভাবে সিস্টেমকে থ্রেটের হাত থেকে বাচায়?

৩. সফটওয়্যার নবায়নের ফ্লোচার্টটি আঁক ও বর্ণনা দাও।

৪. কম্পিউটার কী কী ধরণের সিকিউরিটি থ্রেটের কবলে পরতে পারে বিস্তারিত লেখ।

৫. তোমার কম্পিউটারে কীভাবে সিস্টেম রিকভারি সফটওয়্যার ডাউনলোড ও ইন্সটল করবে সেটি ধারাবাহিক ভাবে দেখাও ।

তৃতীয় অধ্যায়

আইটি সিস্টেম মেইনটেন্যান্স

IT System Maintenance

একুশ শতক তথা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই সময়ে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সেবা কিংবা উৎপাদন খাতের উৎপাদনশীলতা ও সেবাকর্ম এখন পুরোপুরি আইসিটি নির্ভর হয়ে পড়েছে। বিশেষত করোনা মহামারিকালীন এবং তৎপরবর্তিকালে আইসিটির পারদর্শিতা ছাড়া কোন কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে বা পড়বে।ফলে আইটি যন্ত্রপাতি ও সফ্‌টওয়্যার এখন সাধারন মানুষের নাগালের মধ্যে আসায় এসব যন্ত্রপাতি কেনা হচ্ছে ব্যাপক হারে। এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সাথে সাথে সেগুলো সচল ও কার্যকর রাখা এখন খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই এই যন্ত্রের সঠিক রক্ষনাবেক্ষন এখন একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। আইটি সিস্টেম মেইন্টেন্যান্স সেবা খাতে সৃষ্টি হচ্ছে কাজ করার প্রচুর সুযোগ । এই অধ্যায়ে আমরা আইটি সিস্টেম রিপেয়ারিং ও মেইন্টেন্যান্স এর ধারনা লাভ করব এবং সাধারণ ত্রুটি নির্ণয় ও তা সমাধানের উপায় সম্পর্কে জানবো ও কাজ করার দক্ষতা অর্জন করব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- আইটি সিস্টেমের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে করতে পারব;
- আইটি সিস্টেমের হার্ডওয়্যার মেরামত বা প্রতিস্থাপনের করতে পারব;
- সিস্টেমে সফ্‌টওয়্যার জনিত সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধান করতে পারব;

- আইটি সিস্টেম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ডকুমেন্টেশন করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকার থ্রেট চিহ্নিত করে তা থেকে সিস্টেমকে রক্ষা করতে পারব।

১.১ কম্পিউটারের ত্রুটি নির্ণয় ও মেরামত

আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহার্য সকল বস্তুই দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে তাতে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয় । সঠিক সময়ে মেরামত না করলে অনেক সময়ই তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। তেমনই আমাদের অতি প্রয়োজনীয় আইটি যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে না করলে তা আমাদের ক্ষতি ও সময় অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আইটি সরঞ্জাম এবং সফ্টওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ।

কম্পিউটার ও আইটি যন্ত্রপাতি রুটিনমাফিক রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। ফলে কম্পিউটারের পারদর্শিতা ঠিক থাকে, কম্পিউটারকে নিরাপদ রাখা যায় এবং অপেক্ষাকৃত কম সমস্যায় পড়তে হয়। যদি তোমার কম্পিউটার ধীর গতির মনে হয়, অল্প ডিস্ক স্পেস (Low disk space) সম্পর্কিত বার্তা প্রদর্শন করে বা বুট (boot) করতে সময় বেশি লাগে, তবে রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ করে সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায় এবং এটা কম্পিউটারকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে। নিয়মিত প্রিভেন্টিভ রক্ষণাবেক্ষণের কারণে সিস্টেম ভাইরাস আক্রমন অথবা ডেটা হারানো রোধ করে, স্পেস বাড়িয়ে দেয় এবং এমনকি সফটওয়্যার পারফরমেন্স বাড়িয়ে দেয়।

একটি কম্পিউটার অনেকগুলো পার্টস ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে তৈরি। যন্ত্রপাতি সমূহকে সাধারণত হার্ডওয়্যার বলা হয়। কম্পিউটারের এইসব হার্ডওয়্যার ক্রয় করা ও রক্ষনাবেক্ষনে প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মনিটর

যদি মনিটরের স্ক্রিন প্রায়ই ঝলকানি দেয়, তবে মনিটরের সমস্যা হতে পারে।এটি ত্রুটিপূর্ণ ভিজিএ ক্যাবলের লুজ কানেকশনের জন্য হতে পারে। তাই প্রথমে, মনিটর এবং কম্পিউটারের উভয় প্রান্তের ক্যাবলটি শক্ত করে পোর্টে লাগাতে হবে অথবা ক্যাবলটি পরিবর্তন করতে হবে। পাওয়ার ক্যাবলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এছাড়াও মনিটর ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভালো রেজুলেশন সম্বলিত ও নামকরা ব্রান্ডের হওয়া বাঞ্চনীয়। স্ক্রিনের রেডিয়েশন যেন কম হয় সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে মনিটর নিয়মিত বিরতিতে পরিস্কার করা এবং অন্তত ৬ মাস একবার খুলে সার্ভিসিং করা যেতে পারে।

মাউস

এটি বর্তমানে অপটিক্যাল সেন্সর ব্যবহার করে কাজ করে। মাউস সাধারণত তারের মাধ্যম আবার তারবিহীন ভাবে কম্পিউটারে সংযোগ করা যায়। মাউসে যদি সমস্যা হয়, তাহলে সাধারণত মাউস পয়েন্টার সঠিকভাবে কাজ করে না এবং সঠিকভাবে কমান্ড দেওয়া যায় না। এমন সমস্যা দেখা দিলে মাউসটি খুলে পুনরায় লাগালে সমস্যার সমাধান হতে পারে নতুবা মাউসটি পরিবর্তন করতে হবে। মাউস ক্রয়ের ক্ষেত্রে নামকরা ব্র্যান্ডের ক্রয় করা ভালো, এতে তা দ্রুত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

কী-বোর্ড

বাংলাদেশের বাজারে কী-বোর্ডের কী গুলোতে বাংলা ও ইংলিশ উভয় টেক্সট-এলেখা আছে এমন কী-বোর্ড বেশি চলে কেননা তা ব্যবহারকারিদের কাছে অধিকএর সহজ ব্যবহারের নিশ্চয়তা দেয়। কী-বোর্ডে যদি সমস্যা দেখা দেয় তবে এটি সঠিকভাবে ইনপুট নেয় না, যেমন- কোনো কোনো অক্ষর টাইপ করলে সেটা টাইপ হয় না বা একাধিক টাইপ হয়। এক্ষেত্রে কী-বোর্ডটি পরিবর্তন করে নতুন এবং ভালো কীবোর্ড লাগাতে হবে। এছাড়াও কী-বোর্ড ক্রয়ের ক্ষেত্রে নামকরা ব্যান্ড, ওয়্যারলেস/ওয়্যারড কি না এসবও দেখে নিতে হবে। নিয়মিত কী-বোর্ড পরিস্কার করা বা ত্রুটি দেখা দিলে খুলে আবার ঠিকমত লাগালে ভাল কাজ করতে পারে।

সিস্টেম ইউনিট

যে কাঠামোর বা বক্সের মধ্যে মাদারবোর্ড, সিপিইউ, র‍্যাম, স্টোরেজসহ (হার্ডডিস্ক,এসএসডি ইত্যাদি) থাকে সে বাক্সটিকে যন্ত্রাংশ সহ সিস্টেম ইউনিট বলে। যন্ত্রাংশ ছাড়া খালি বক্সটিকে কেসিং বলে। সিপিইউ এর পুর্ণরূপ হলো সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। সিস্টেম ইউনিটের বিভিন্ন সাধারন সমস্যাগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো- অপারেটিং সিস্টেম লোড নেওয়ার পুর্বেই সিস্টেম ক্রাশ করা, সিস্টেম চলাকালে কেসিংয়ের ভেতর শব্দ হওয়া, সিপিইউ গরম হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে র‍্যামসমূহ স্লট থেকে খুলে ভালো করে মুছে, অন্য যন্ত্রাংশগুলোও পরিষ্কার করে যথাস্থানে লাগিয়ে দিলে এবং কুলিং ফ্যান চেক করে সাধারণত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

২০২৪

বাংলাদেশের বাজারে কয়েকটি কোম্পানির মাইক্রোপ্রসেসর ভালো পাওয়া যায়, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ইন্টেল, এএমডি (এডভান্স মাইক্রো ডিভাইস ইনকর্পোরেশন) ইত্যাদি। মাইক্রোপ্রসেসর বা সিপিইউ ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোর দেখে নেওয়া উচিত। বর্তমান বাজারে প্রসেসর নির্বাচনে (Core i7) বা তার আপার ভারশন বা জেনারেশন নির্বাচন করা যেতে পারে।

র‍্যাম: এটি কম্পিউটারের মেমোরি অংশ। বাজারে র‍্যামের মধ্যে ডিডিআর-৩ (DDR-3), ও ডিডিআর-৪ (DDR-4), সহজলভ্য। অনেক সময় কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করার পর ডিসপ্লে-তে কিছু আসেনা, বিপ (beep) সাউন্ড দেয়। এমন হলে র‍্যাম স্লট থেকে খুলে স্লটসহ পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে দেখতে হবে। এতে সমাধান না হলে র‍্যামটি অন্য ভালো মাদারবোর্ডে লাগিয়ে চেক করে দেখতে হবে র‍্যামে সমস্যা আছে কি না। র‍্যামে সমস্যা থাকলে একই বৈশিষ্ট্যের অন্য ভালো র‍্যাম লাগাতে হবে। র‍্যাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে এর ধারণ ক্ষমতা ও বাস স্পিডের (bus speed) উপর জোর দেওয়া উচিত এবং অবশ্যই ভালো ও নামকরা ব্র্যান্ডের র‍্যাম ক্রয় করা উচিত।

প্রিন্টার

প্রিন্টার হলো এক প্রকার আউটপুট ডিভাইস। অনেক সময় কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট কমান্ড দিলেও প্রিন্টার কোনো সাড়া দেয় না । এরকম হলে প্রিন্ট করার সময় সঠিক প্রিন্টার নির্বাচন করে দিতে হবে, এতে কাজ না হলে প্রিন্টারের সকল সংযোগ পরীক্ষা করতে হবে। মাঝে মাঝে প্রিন্টারে প্রিন্টের সময় অস্পষ্ট ছাপা অথবা কোনো কিছুই ছাপা হয় না। সেক্ষেত্রে প্রিন্টারের কালি বা টোনার পরীক্ষা করতে হবে। উন্নত মানের প্রিন্ট আউট পেতে হলে প্রিন্টার ক্রয়ের সময় এর রেজুলেশন, প্রিন্ট কোয়ালিটি, প্রিন্টিং রেট, প্রিন্টের জন্য পেপার সাইজ, ডুপ্লেক্স প্রিন্টিং অটোমেটিক আছে কি না এসব দেখে নিতে হবে।

সফ্টওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ: কম্পিউটার ও আইটি সিস্টেম রক্ষনাবেক্ষনে বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধমূলক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ বর্ণনা করা হলো।

(ক) **সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণ:** সংশোধনমূলক রক্ষনাবেক্ষণ এর মধ্যে সমস্যা হয়ে যাওয়ার পর সংশোধন মুলক কাজ বা আপডেট করাকে বোঝায়।

(খ) নমনীয় রক্ষণাবেক্ষণ: নমনীয় রক্ষণাবেক্ষণ এর মধ্যে রয়েছে সফ্‌টওয়্যার হালনাগাদ পরিবর্তন এবং আপডেট করণ।

(গ) নিখুঁত রক্ষণাবেক্ষণ: নিখুঁত রক্ষণাবেক্ষণ দীর্ঘ সময় ধরে সফ্‌টওয়্যার ব্যবহারযোগ্য রাখার জন্য পরিবর্তন এবং আপডেট এর অন্তর্ভুক্ত। এতে নতুন বৈশিষ্ট্যের , সফ্‌টওয়্যার পরিমার্জন করে এর নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করা হয় ।

(ঘ) প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ: প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ হল সফটওয়্যারের ভবিষ্যত সমস্যা রোধে পরিবর্তন এবং আপডেট। এর লক্ষ্য হল সমস্যা হওয়ার আগেই প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহন করা , যা এই মুহূর্তে তাৎপর্যপূর্ণ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। সংশোধনের চেয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন অধিকতর শ্রেয় এবং সাশ্রয়ী।

১.২ সমস্যা সনাক্তকরণ এবং বিশ্লেষণের পদ্ধতিসমূহ।

প্রতিনিয়ত কম্পিউটার ব্যবহারে আমরা প্রায় প্রায়ই বেশ কিছু সাধারন সমস্যার মুখোমুখি হতে থাকি। যেমন-

- সিস্টেম চালু না হওয়া।
- সিস্টেম সঠিকভাবে চলছে কিন্তু মনিটরে কিছু দেখা না যাওয়া।
- সিস্টেম অল্প সময়েই অত্যন্ত গরম হয়ে যাওয়া বা অস্বাভাবিকভাবে বন্ধ হওয়া বা রিস্টার্ট নেওয়া।
- কম্পিউটার হঠাৎ থেমে যাওয়া।
- কম্পিউটারের মেটাল অংশে স্পর্শ লাগলে শক করা।
- তারিখ ও সময় ঠিক থাকে না বা বায়াসের কোনো অপশন পরিবর্তন করলে সেভ না হওয়া।
- Boot Disk Failure, Hard Disk Not Found, Out of Memory, Not Enough Memory প্রভৃতি মেসেজ দেখানো।
- কী-বোর্ড বা মাউস কাজ না করা।
- মনিটরে পাওয়ার থাকা সত্ত্বেও ডিসপ্লে না আসা।

এসকল সমস্যাগুলো সাধারণত অল্প কিছু স্টেপ নেওয়ার মাধ্যমেই সমাধান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেজন্য যন্ত্রাংশগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষন করা অত্যন্ত জরুরি। এরপর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

সমস্যা বিশ্লেষন পদ্ধতি হল-

১. সমস্যা চিহ্নিত করা।

২. সম্ভাব্য কারণের একটি তত্ত্ব স্থাপন করা।

৩. কারণ নির্ধারণের জন্য তত্ত্ব পরীক্ষা করা।

৪. সমস্যার সমাধান এবং সমাধান বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা করা।

৫. সম্পূর্ণ সিস্টেম কার্যকারিতা যাচাই করা এবং প্রযোজ্য হলে, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়ন করা।

৬. সমস্যার তথ্যাদি সংরক্ষন করা ও সমাধানের ব্যবস্থা করা।

সমস্যার মূল কারণসমূহ

যে কোন সমস্যা সমাধানের প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হলো সেটির মূল শেকড় খুজে বের করা। সমস্যার গোড়া জানতে পারলে সেটা সহজেই ঠিক করে ফেলা যায়। কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যার সাধারণ কিছু কারণ হলো-

- ক্যাবলে আলগা সংযোগ ।
- শর্ট সার্কিট হওয়া।
- হার্ডওয়্যারে ধুলাবালি জমা।
- ত্রুটিযুক্ত যন্ত্রপাতির সংযুক্তি।
- ডিভাইসের সঠিক ইন্সটলেশন না হওয়া।
- আর্থিং না থাকা।
- সিপিইউ এ থাকা কুলিং ফ্যান ঠিকমত ঠান্ডা করতে না পারা।
- হার্ডডিস্কে ম্যালওয়্যার থাকা।

অপারেটিং সিস্টেম এবং অন্যান্য সফটওয়্যারগুলি আপডেট করা

অপারেটিং সিস্টেম যেকোনো কম্পিউটারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ একটি অংশ এবং এটি ছাড়া কম্পিউটার সিস্টেম কাজই করতে পারে না। সফটওয়্যারবিহীন কম্পিউটার কিছু যন্ত্রপাতির সমাহার ব্যতীত আর কিছুই নয়।

নির্দিষ্ট সময় পর পর সফটওয়্যার আপডেট করা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিনিয়তই হ্যাকাররা সিস্টেমের প্যাঁচ (patch) এবং হোল (hole) খুঁজে সফটওয়্যারকে অরক্ষিত বানানোর চেষ্টায় লিপ্ত। সফটওয়্যারের আপডেটের মাধ্যমে সফটওয়্যার কোম্পানি গুলো নতুন আপডেটে এসব সিকিউরিটি প্যাঁচ ও হোল ঠিক করে। ফলে নতুন আপডেট ব্যবহারকারিদের সিকিউরিটি থ্রেটের কবলে পড়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। এছাড়াও সফট-ওয়্যার আপডেটের ফলে নতুন নতুন ফিচার যুক্ত সফটওয়্যার পাওয়া যায় যেগুলো বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে আরো সামঞ্জস্য। সামগ্রিকভাবে সফটওয়্যার আপডেটের ফলে কম্পিউটার যেমন নিরাপদ হয়, তেমনি নতুন নতুন ফিচারের আবির্ভাবে তা সহজে ব্যবহার উপযোগী হয়। এসকল আপডেট সফটওয়্যার কোম্পানি ব্যবহার-কারিদের নোটিফিকেশনের (Notification) মাধ্যমে জানান দেয়। ব্যবহারকারি যদি আপডেট করতে চায় তবে সফটওয়্যার প্রস্তুতকারি কোম্পানীর নিদেশনা অনুযায়ী ধাপগুলো অনুসরণ করে আপডেট সম্পন্ন করতে পারে।

হার্ডওয়্যার প্রতিস্থাপন

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বিভিন্ন ছোট বড় যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে গঠিত। এসব যন্ত্রাংশ অনেক সময়ই ব্যবহারের ফলে নষ্ট বা ত্রুটিযুক্ত হয়ে পরে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ত্রুটিযুক্ত যন্ত্রাংশ সারানো প্রচুর সময় ও অর্থ সাপেক্ষ। বরং এর চেয়ে নতুন যন্ত্রাংশ কিনে কম্পিউটারে প্রতিস্থাপনই বেশি সহজ ব্যবহারকারীদের জন্য। একারণে নতুন হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশ কিনে ঠিকঠাকভাবে সংযোজন করা অত্যন্ত সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত।

পিসি চেক করার পদ্ধতি

তোমরা যখন অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে যাও তখন ডাক্তার কী করে? তিনি তোমার রোগের লক্ষন সম্পর্কে জানতে চান, থার্মোমিটার, স্টেথিস্কোপ প্রভৃতি দিয়ে শরীরের অবস্থা নিরূপণ করেন, এরপর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কি রোগ হতে পারে সেটা শনাক্ত করেন ও তা সারানোর জন্য ওষুধ দেন। তেমনি কম্পিউটারের সমস্যার ক্ষেত্রে সমস্যা নির্ধারনে আমাদের ঠিক এ ধাপগুলোর মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। একটি সমস্যাযুক্ত কম্পিউটার সামনে আসলে আমাদের সমস্যাগুলোর তালিকা করতে হবে। এক্ষেত্রে-

- ব্যবহারকারির কাছে থেকে জানতে হবে সে কী কী সমস্যার সম্মুখিন হয়েছে।
- ডায়াগনোস্টিক টুল দিয়ে কম্পিউটারে কার্যকারিতা নিরীক্ষা করতে হবে।
- সিপিইউ স্পিড যাচাই করতে হবে।

- অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সফটওয়্যারের মাধ্যমে পিসি স্ক্যান করে ম্যালওয়্যার আছে কি না দেখতে হবে।
- যাচাইয়ের ফলাফল অনুসারে কম্পিউটারে কোন অংশে সমস্যা হয়েছে তা নিরূপন করতে হবে।

ডায়াগনস্টিক টুল এবং ব্যবহার

ডায়াগনস্টিক বলতে বোঝায় সমস্যা খুজে বের করা। কম্পিউটারের সমস্যা খুজে বের করার জন্য আমরা কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করি। এগুলোকে বলা হয় ডায়াগনস্টিক টুল। কম্পিউটার ডায়াগনস্টিক টুলসমূহ কম্পিউটার হার্ড ড্রাইভকে স্ক্যান করতে পারে, র‍্যামকে ভুল সনাক্তের জন্য যাচাই করতে পারে, সিপিইউ এর তাপমাত্রা যাচাই করতে পারে এবং কোন কোন ডিভাইস কম্পিউটারের সাথে সংযোগ আছে তা দেখতে পারে। কোনো কোনো কম্পিউটার ডায়াগনস্টিক টুল অপারেটিং সিস্টেমের সাথে বিল্ড-ইন থাকে, আবার কিছু ডায়াগনস্টিক টুল থার্ড পার্টি কোম্পানিগুলো উন্নয়ন করে। কিছু কম্পিউটার ডায়াগনস্টিক টুল হলো-

- **উইন্ডোজ পারফর্ম্যান্স মনিটর (Windows performance Monitor):** এই ডায়াগনোস্টিক টুলটি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের সাথে বিল্ড-ইন (built in) থাকে। এটি কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের ভাইটাল ইনফরমেশন (Vital Information) সম্পর্কে একটি কুইক ভিউ (Quick View) প্রদান করে। এছাড়াও পারফর্ম্যান্স মনিটরে সিপিইউ, মেমোরি, ডিস্ক ইনফো (Disk info), ইথারনেট ইনফোরমেশন (Ethernet Information) এবং রানিং এপ্লিকেশনের ইফেক্ট (Running Application Effect) সম্পর্কে জানা যায়।

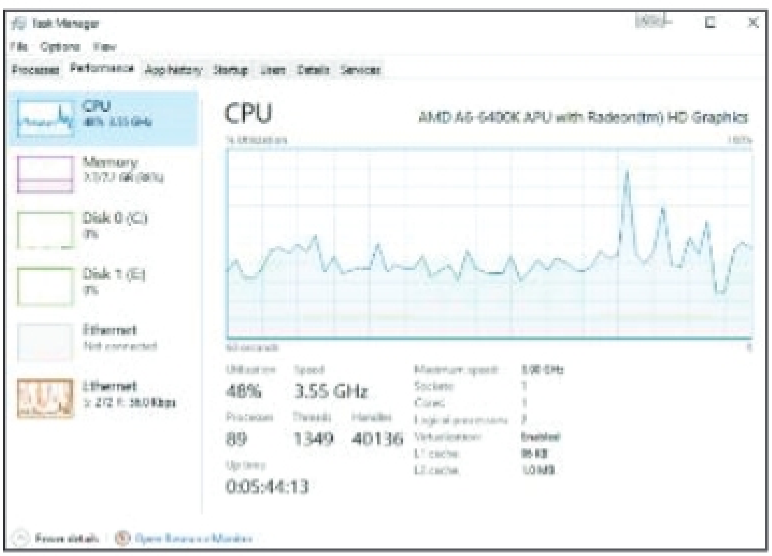

২০২৪

- **উইন্ডোজ রিসোর্স মনিটর (Windows Resource Monitor):** এটিতে সিপিইউ, নেটওয়ার্ক, মেমোরি ও ডিস্ক ইউজেস আলাদা আলাদা ভাবে ট্র্যাক করা সম্ভব। এই ডায়াগনোস্টিক টুল দিয়ে কোন কোন প্রসেস সিপিইউকে প্রভাবিত করছে, কতখানি মেমোরি ব্যবহৃত হচ্ছে, টিসিপি সংযোগ তথ্য এমনকি কোন পোর্টে কী ধরণের প্রসেস সম্পন্ন হচ্ছে সেগুলোও জানা যায়।

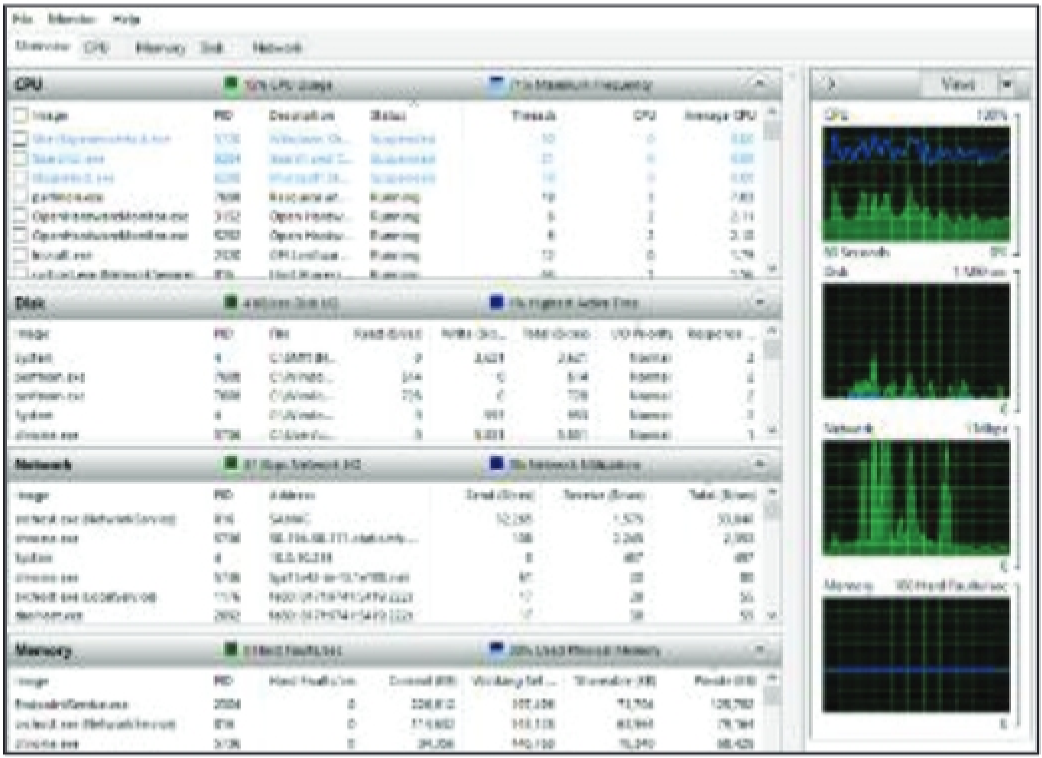

ওপেন হার্ডওয়্যার মনিটর (Open Hardware Monitor): এটি একটি ফ্রি ওপেন সোর্স (Free Open Source) সফটওয়্যার যা উইন্ডোজ ও লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে চালু করতে পারে। এই সফটওয়্যার কম্পিউটারের তাপমাত্রা সেন্সর, পাখার গতি, ভোল্টেজ, লোড (Load) এবং ক্লক স্পিড সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে। কম্পিউটার নিজে নিজে শাটডাউন (Shut down), হঠাৎ থেমে যাওয়া (Hang), ক্রাশ (Crash) হওয়ার ক্ষেত্রে এই টুল ব্যবহারকারিকে সিপিইউ অতিরিক্ত গরম বা ত্রুটিযুক্ত কুলিং ফ্যান সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে কাজে আসতে পারে।

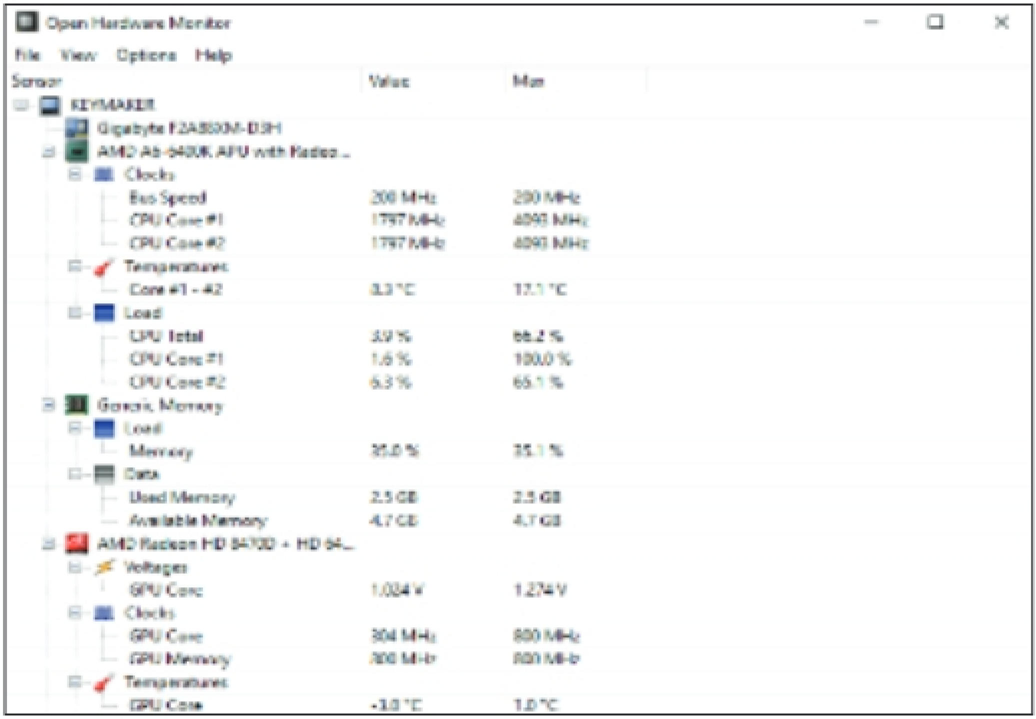

স্পেসি (Speccy) : স্পেসিও একটি কম্পিউটার ডায়াগনস্টিক টুল। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, গ্রাফিক্স, মেমোরি, নেটওয়ার্ক, ডিস্ক, পেরিফেরাল ডিভাইস ইত্যাদি সম্পর্কে স্পেসিফিক তথ্য খোঁজার জন্য এটির বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত চমৎকার।

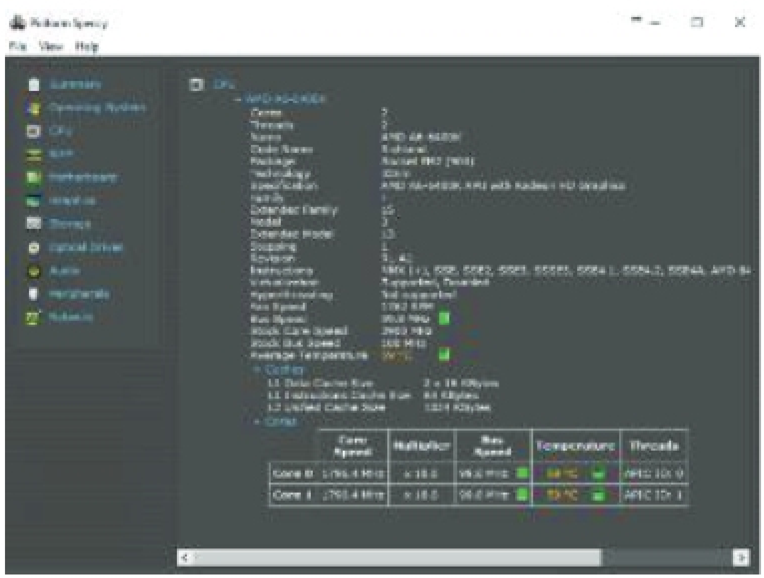

১.৩ আইটি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ

কম্পিউটার সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এর রক্ষনাবেক্ষন অত্যন্ত আবশ্যক। কিছু সময় পর পর অবশ্যই কম্পিউটারকে নিয়মমাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে রাখতে হবে ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য। এতে করে যেমন দীর্ঘদিন কোনো সমস্যা ছাড়া কম্পিউটার ব্যবহার করা যাবে, তেমনি কাজের গতিও কমে যাবে না। কম্পিউটার সরঞ্জামাদির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেসকল পদক্ষেপ নেওয়া উচিত-

- নির্দিষ্ট সময় পরপর কম্পিউটারের পার্টসমুহ মুছতে হবে যাতে ভেতরে ধুলা জমে না যায়।
- খাবার ও পানীয় কম্পিউটার থেকে দূরে রাখতে হবে।
- এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইন্সটল করে এনাবল করে রাখতে হবে।
- কম্পিউটারের পাওয়ার ক্যাবল ধরে টানাটানি করা যাবে না।
- কম্পিউটারের ক্যাবলসমুহের উপর ভারী বস্তু বা চেয়ার রাখা যাবে না।
- আলাদা ডিভাইস কম্পিউটারের সাথে লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ঠিক পোর্টে সেগুলো সংযোগ করা হয়।
- যত্নের সাথে রিমুভ্যাবল ড্রাইভগুলো খোলা বা লাগানোর কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময় পরপর ক্লিনআপ (Clean up) সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম্পিউটারের কার্যকারিতা বাড়াতে হবে।

১.৪ থ্রেট থেকে সিস্টেম রক্ষা

থ্রেট থেকে কম্পিউটার সিস্টেমকে রক্ষা করা বলতে আমাদের কম্পিউটারকে অননুমোদিত ব্যবহার থেকে বাঁচানোর ঝুকি বুঝায়। কম্পিউটার সিস্টেম থ্রেটের কবলে পরলে কাজের ক্ষেত্রে যেমন সমস্যার সৃষ্টি হয়, তেমনি কম্পিউটারে থাকা মূল্যবান তথ্য হারিয়ে বা অবাঞ্চিত ব্যক্তিবর্গের কাছে চলে যেতে পারে। এসব সমস্যা যাতে না হয় এজন্য বিভিন্ন থ্রেট থেকে কম্পিউটার সিস্টেমকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট প্রটেক্ট এবং সংরক্ষণের পদ্ধতি

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমকে বহিরাগতদের ও আনঅথোরাইজড লোকজনের হাত থেকে রক্ষা করে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টে পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকলে কম্পিউটারে অন্য কেউ অযাচিত সফটওয়্যার ইন্সটল করতে পারে না, এমনকি কোনো তথ্য মুছে ফেলতে পারে না। ফলে সিস্টেম থাকে সুরক্ষিত। কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টই যদি থ্রেটের কবলে পরে এবং কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় তবে পুরো সিস্টেমই অত্যন্ত ঝুকির সম্মুখিন হয়। এমনকি অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা থাকলেও শুধুমাত্র কম্প্রোমাইজড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টের সাহায্যে পুরো সিস্টেমকে ক্রাশ করে দেওয়া সম্ভব। এজন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট সুরক্ষিত রাখতে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়, যেমন-

- অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টের ডিফল্ট (Default) নাম চেঞ্জ করে ইউনিক (Uniqe) নাম দিতে হবে।
- প্রত্যেক কম্পিউটারে আলাদা আলাদা নাম দিতে হবে, যাতে কম্প্রোমাইজড হয়ে শুধু ওই কম্পিউটারের মধ্যেই সমস্যার বিস্তার সীমাবদ্ধ থাকে।
- একাউন্টের জন্য শক্তিশালী ও দীর্ঘ পাসওয়ার্ড নির্বাচন করতে হবে।
- পাসওয়ার্ড পায়শই পরিবর্তন করে দিতে হবে।
- পাসওয়ার্ড ঠিকমত ও সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সফ্টওয়্যার ইনস্টলেশনের প্রয়োজনীয়তা

কম্পিউটার সিস্টেমকে সুরক্ষিত রাখতে এন্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার সিস্টেমে ইন্সটল ও এনাবল করে রাখার কোনো বিকল্প নেই। এন্টিম্যালওয়্যার বিহীন কম্পিউটার দরজা খুলে রাখা বাড়ির মত, যে কেউ সহজেই ঢুকে পরতে পারে। ভালো এন্টি-ম্যালওয়্যার সফটওয়্যারগুলো-

- নতুন নতুন ম্যালওয়্যার আক্রমন থেকে সিস্টেমকে সুরক্ষা প্রদান করে।
- বিভিন্ন স্পাম ও অযাচিত বিজ্ঞাপন কে বাধা প্রদান করে।
- হ্যাকার ও ডেটা চোরের হাত থেকে সিস্টেমকে বাঁচায়।
- অপসারণযোগ্য ডিভাইস দ্বারা সংক্রমনের হাত থেকে রক্ষা করে।
- অযাচিত ফাইল মোছার মাধ্যমে প্রসেসরের স্পিড বাড়িয়ে দেয়।

- স্পাইওয়্যার ও ফিশিং থেকে বাঁচায়।
- ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ে সুরক্ষিত রাখে।

সাধারণ মেলওয়্যার সম্পর্কে ধারণা

ম্যালওয়্যার হলো ম্যালিশিয়াস সফটওয়্যারের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই অনুপ্রবেশকারী সফটওয়্যারগুলো হ্যাকাররা কম্পিউটার সিস্টেম থেকে তথ্য চুরি ও সিস্টেমে ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে তৈরিকরে থাকে। কিছু সাধারণ ম্যালওয়্যার হলো:

ভাইরাস: ভাইরাস মুলত ক্ষতিকর প্রোগ্রাম যা অন্য ফাইলের সাথে এটাচ থাকে। ফাইলটি যখন ইউজার এক্সিকিউট করে কেবল তখনই এটি সচল হয় এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করে সিস্টেমকে ধীরগতি এবং পরিশেষে অকেজো করে দেয়।

ওয়ার্ম: এটি খুব সহজেই নিজেই নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি করে একটি নেটওয়ার্কের অন্যান্য কম্পিউটারের মধ্যে ছড়িয়ে পরে। এটির অতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি সিস্টেমকে বিকল করে দিতে পারে।

ট্রোজান হর্স: ট্রোজান হর্স উপকারি সফটওয়্যারের ছদ্মবেশে সিস্টেমে ঢোকে। এরপর সিস্টেমের ডেটা গুলোকে মডিফাই, ব্লক বা ডিলিট করে ফেলে। এটি সাধারনত ভাইরাস বা ওয়ার্মেও মত নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না।

স্পাইওয়্যার: এধরনের ম্যালওয়্যারসমুহ সিস্টেমে লুকিয়ে থাকে এবং গুরুত্বপুর্ণ তথ্য অন্য জায়গায় প্রেরণ করে। এটি সাধারণত ফাইনান্সিয়াল তথ্য ও পাসওয়ার্ড সিজ করে নিতে ব্যবহার করা হয়। অত্যন্ত কমন একটি স্পাইওয়্যার হলো কি-লগার।

র‍্যানসোমওয়্যার: এটি সিস্টেমে প্রবেশ করলে ডেটাবেজকে এনক্রিপ্ট করে ফেলে, ফলে ইউজার আর তথ্য ব্যবহার করতে পারে না এবং এরপর ডিক্রিপশন-কি এর জন্য অর্থ দাবি করে। সাধারণত ফিশিং লিংকগুলোতে ক্লিক করার মাধ্যমে এই ম্যালওয়্যার সিস্টেমে ঢোকার সুযোগ পায়।

এডওয়্যার: এডওয়্যার সাধারণত নরমাল এডভারটাইজ দেখায় এবং এভাবে ইউজারকে সন্দেহ ছাড়াই আনসিকিউরড সাইটে নিয়ে যায়। অনেক সময় এডওয়্যার স্পাম বা ট্রোজান হর্সও বহন করতে পারে। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সিস্টেমের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা

কম্পিউটার সঠিক রক্ষনাবেক্ষনের জন্য এর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকা অত্যন্ত জরুরি। কেননা কোনো সমস্যাকে যদি ফেলে রাখা হয় তবে তা আরো বৃহৎ আকার ধারণ করে সিস্টেমকে বিকল করে রাখতে পারে। কম্পিউটারের কিছু বিষয় যেগুলোর পর্যবেক্ষণে রাখলে সর্বপরি কম্পিউটার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। যেমন-

- প্রসেসর গতি ঠিক আছে কি না।
- কম্পিউটারে জমা করা তথ্য অবিকৃত আছে কিনা।
- সিস্টেমের অননুমোদিত ব্যবহার হচ্ছে কি না ।
- সকল যন্ত্রাংশ ঠিকঠাক কাজ করছে কি না।

সিস্টেমের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর উপায়

নিত্যদিনের ব্যবহার্য কম্পিউটারের সঠিক যত্নের মাধ্যমে কম্পিউটারকে দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী রাখা সম্ভব। কিছু ছোট পদক্ষেপ যা আপাত দৃষ্টিতে তেমন কাজের নয় বলে মনে হলেও একত্রে তা কম্পিউটারের কর্মদক্ষতা বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখে। যেমন-

- অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যারসমুহ আনইন্সটল করা।
- পিসিতে বারতি র‍্যাম সংযুক্ত করা।
- এ্যান্টিম্যালওয়্যার সফ্টওয়্যার ইন্সটল রাখা এবং মাঝে মাঝেই সিস্টেম স্ক্যান করা।
- ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন ব্যবহার করা।
- কম্পিউটারে হার্ডডিস্কের পরিবর্তে এসএসডি সংযুক্ত করা।
- ওয়েব কুকি ও ক্যাশি ক্লিন করা।

জব শিট (Job Sheet)

জব-১: কম্পিউটারে ক্রুটির কারণ নির্ধারণ করে মেরামত/পার্টস প্রতিস্থাপন পূর্বক থ্রেট থেকে সিস্টেম রক্ষা করার ব্যাবস্থা গ্রহন ।

পারদর্শিতার মানদন্ড
• স্বাস্থ্য সুরক্ষার ও নিরাপত্তা বিধি অনুসরণপূর্বক কাজ শুরু করা
• হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করে ত্রুটি শনাক্ত করা
• বিদ্যমান সমস্যার ক্ষেত্র ও কারণ চিহ্নিত করা ।
• সমস্যাযুক্ত হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল, ত্রুটির পূর্ব রেকর্ড দেখা।
• হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার প্রতিস্থাপন বা মেরামতের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
• পরিকল্পনার ভিত্তিতে মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ও পার্টস নির্বাচন করা।
• অপারেটিং সিস্টেম এবং অন্যান্য সফটওয়্যারগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করা ।
• মেরামতের পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা।
• সমস্যাযুক্ত সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি মেরামত/পরিবর্তন করা।
• মেরামত/প্রতিস্থাপন রেকর্ড সংরক্ষণ করা।
• রক্ষণাবেক্ষণের ডকুমেন্ট যথাযথ ব্যক্তির পরামর্শে আপডেট করা।
• রক্ষণাবেক্ষণের ডকুমেন্ট ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা।
• সম্ভাব্য সিকিউরিটি থ্রেট চিহ্নিত করা।
• থ্রেটের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয়ের জন্য তা বিশ্লেষন করা।
• থ্রেটের সম্ভাব্য কারণগুলি নির্ধারণ করে তার প্রতিরোধ ও প্রতিশোধক ব্যবস্থা নেয়া ।
• গুরুপূর্ণ ফাইলগুলির নিয়মিত ব্যাক অ্যাপ তৈরি করা।

২০১৪

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	সুরক্ষা সরঞ্জামের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	সংস্থার বিধি অনুযায়ী	১ টি
২	মাস্ক	-	১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লোভ		১ টি
৪	এ্যান্টিস্ট্যাটিক রিসব্যান্ড		১ টি

যন্ত্রপাতি

ক্রমিক নং	মেশিন ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	কম্পিউটার	পারসোনাল কম্পিউটার	১ সেট
২	স্ক্রু ড্রাইভার	স্টার ও ফ্লাট টাইপ	২ টি
৩	হ্যান্ড ব্লোয়ার	ম্যানুয়াল/বিদ্যুৎ চালিত	১ টি

কাঁচামাল/সফটওয়্যার

ক্রমিক নং	মেশিন ও অন্যান্য মালামালের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ
১	উইন্ডোজ / লিনাক্স	মাইক্রোসফট কোম্পানির অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা	১ টি
২	ডায়াগনেস্টিক সফটওয়্যার	প্রাপ্ততা অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী

অন্যান্য প্রয়োজন

ইন্টারনেট সংযোগ

কাজের ধারা

১. প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান করে কাজ কর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত কর।

১.২ হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যারের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন

১.২.১ কম্পিউটারে নিচে উল্লেখিত সমস্যা গুলো দেখা যাচ্ছে কি না দেখো-

১.২.১.১ স্ক্রিন জুড়ে ব্লু-স্ক্রিন দেখাচ্ছে

১.২.১.২ সিস্টেম প্রায়ই রিবুট বা ক্রাশ হচ্ছে

১.২.১.৩ বেশি মেমোরি ব্যবহার করে এমন কাজ যেমন- গেমিং, ফোটোশপ প্রভৃতিতে সিস্টেম ক্রাশ হচ্ছে

১.২.১.৪ গ্রাফিক্স স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না

১.২.১.৫ কম্পিউটার বুট বা অন করতে অনেক সময় লাগছে বা করা যাচ্ছে না

১.২.১.৬ ঘন ঘন মেমোরি এরোর (error) দেখাচ্ছে

১.২.১.৭ কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করার পর ডিস্প্লেতে কিছু আসছে না, কিন্তু বিপ করছে

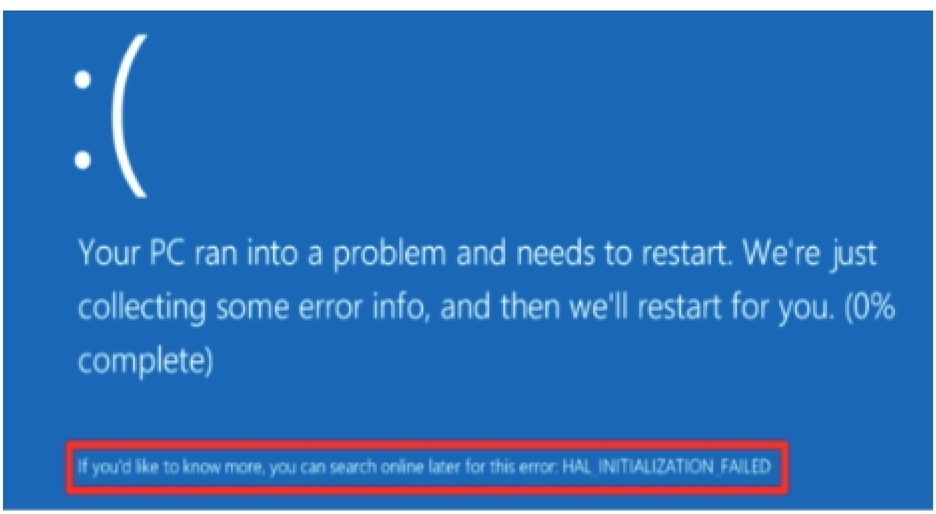

২০২৪

১.৩ বিদ্যমান সমস্যার ক্ষেত্রটি চিহ্নিতকরণ

১.৩.১ উপরের সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করো।

১.৩.২ র‍্যাম স্লটে সঠিকভাবে লাগানো আছে কি না তা পরীক্ষা করো।

১.৩.৩ র‍্যাম ও র‍্যামের স্লটে ধুলাবালি আছে কি না দেখো

১.৩.৪ র‍্যামের কন্ডাকশন অংশে ময়লা আছে কি না যাচাই করো।

১.৩.৫ র‍্যাম ও মাদারবোর্ডের বাস স্পিডে সমন্বয় আছে কি না দেখো

১.৩.৬ র‍্যাম ঠিক আছে কি না দেখো

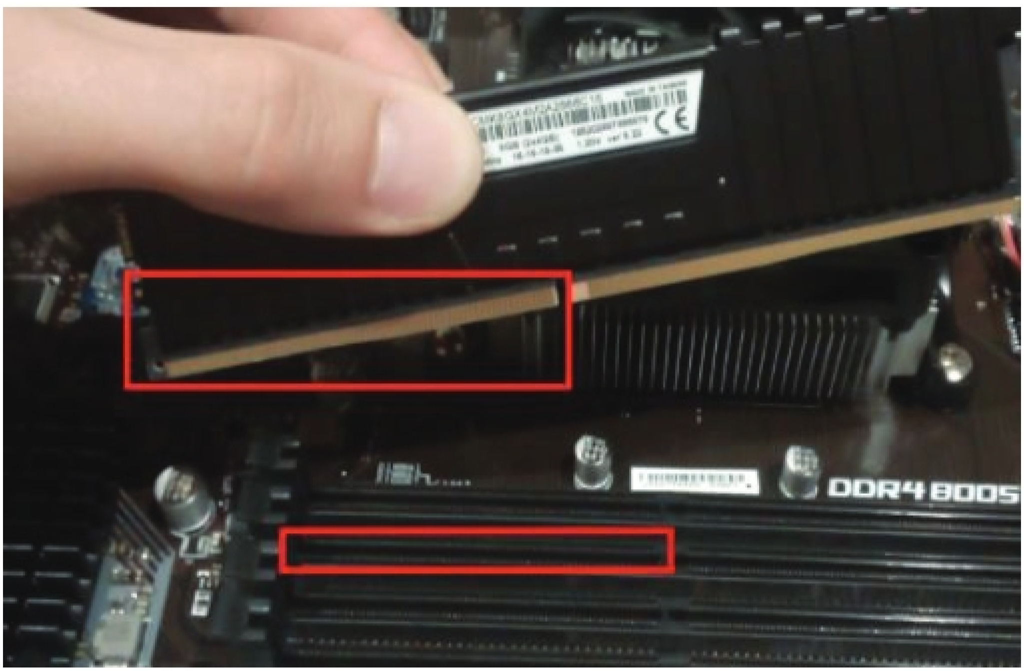

র‍্যামের কন্ডাকশন অংশ নিরীক্ষা করা

২০২৩

১.৪ সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত

১.৪.১ দেখো ১.৩ অনুচ্ছেদের কোন কোন সমস্যাগুলো কম্পিউটারে বিদ্যমান।

১.৪.২ যদি ১.৩.১ থেকে ১.৩.৫ পর্যন্ত সমস্যাগুলো যদি না দেখা যায় তবে বুঝে নাও, কম্পিউটারের র‍্যাম সমস্যাযুক্ত।

১.৫ সমস্যাযুক্ত হার্ডওয়্যারের তথ্য বিশ্লেষণ

১.৫.১ কম্পিউটারের সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালটি পড়ে তথ্য সংগ্রহ করো।

১.৫.২ ম্যানুয়াল থেকে কোন ধরণের র‍্যাম উক্ত কম্পিউটারের জন্য কম্পিটেবল সেটি নির্বাচন করো।

১.৬ ত্রুটি সনাক্ত (র‍্যাম)

১.৬.১ র‍্যামের স্পেসিফিকেশন ঠিক আছে কিনা তা দেখে নাও

১.৬.২ র‍্যামটি একই ধরণের অন্য মাদারবোর্ডে লাগাও।

১.৬.৩ লাগানোর পর একই সমস্যা হচ্ছে কি না চেক করো।

১.৬.৪ যদি একই সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে বুঝতে হবে র‍্যামটি ত্রুটিযুক্ত।

২ ত্রুটিযুক্ত পার্টর্স মেরামত বা প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন

২.১ ত্রুটিযুক্ত পার্টর্স বা সফ্টওয়্যার প্রতিস্থাপন বা মেরামতের জন্য কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুত

২.১.১ একই স্পেসিফিকেশনের র‍্যাম নির্বাচন কর ।

২.১.২ ভালো কোন কোম্পানি তা সরবরাহ করে খোঁজ নাও।

২.১.৩ বাজারদর দেখে র‍্যাম প্রতিস্থাপনে কি পরিমান খরচ হতে পারে তা নির্ধারন করে খসড়া প্রস্তুত করো।

২.২ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ডিভাইস ও কম্পোনেন্টসমূহ নির্বাচন

২.১.১ অবশ্যই যেই স্পেসিফিকেশনের ডিভাইস নষ্ট সেই স্পেসিফিকেশনের ডিভাইস বা কম্পোনেন্ট নির্বাচন করো।

২.১.১ পার্টর্স বা কম্পোনেন্ট পাওয়ার পর চেক করে নাও।

২.৩ অপারেটিং সিস্টেম এবং অন্যান্য সফ্টওয়্যারের সিকিউরিটি সুরক্ষা আপডেট ডাউনলোড/ সংগ্রহ এবং তার প্রয়োগ

২.৩.১ সেটিংস থেকে আপডেট অ্যান্ড সিকিউরিটিতে যাও।

২.৩.২ উইন্ডোজ আপডেটে ক্লিক করো।

২.৩.৩ এরপর ডাউনলোড অ্যান্ড ইন্সটল এ ক্লিক করে সর্বশেষ ভার্সনের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ডাউনলোড ও ইন্সটল করো।

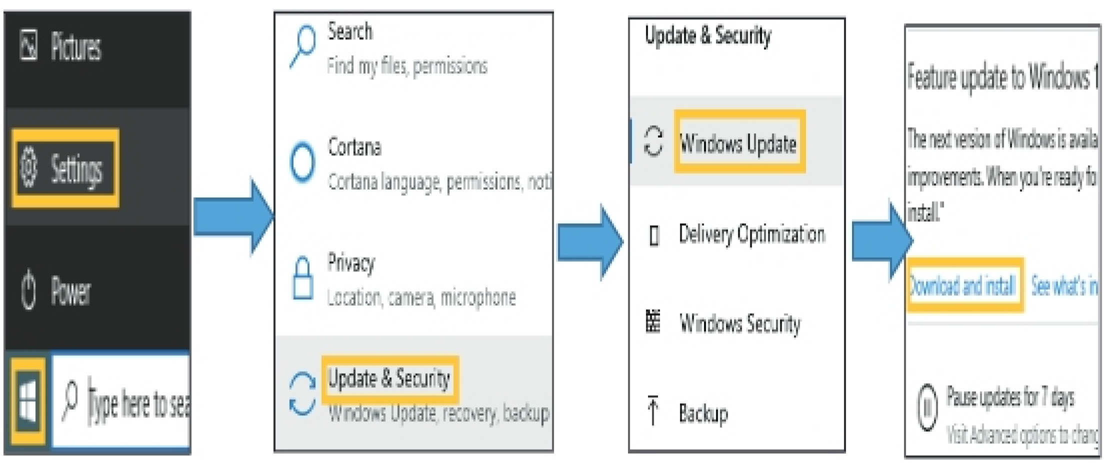

২.৪ প্রতিস্থাপন বা মেরামতের পরিকল্পনা উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে অনুমোদন গ্রহণ

২.৪.১ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করো।

২.৪.২ পার্টর্স বা কম্পোনেন্ট মেরামতে বা পুনঃস্থাপনে কি কি প্রয়োজন তার তালিকা সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে দেখাও।

২.৪.৩ পার্টর্স বা কম্পোনেন্ট প্রতিস্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি গ্রহন কর।

৩। ট্রাবল স্যুট এবং আপডেট করন ডকুমেন্টেশন

৩.১ সমস্যাযুক্ত পার্টর্স পরিবর্তন

৩.১.১ নতুন পার্টর্স সংগ্রহ কর ।

৩.১.২ যে স্থানে বা স্লটে পার্টর্সটি বসবে তার স্লটটি পরিষ্কার আছে কি না দেখো।

৩.১.৩ পার্টর্সটি সঠিকভাবে স্লটে প্রবেশ করাও।

৩.২ ফল্ট এবং রক্ষণাবেক্ষণের ডেটা, পার্টর্স বা সফ্টওয়্যার প্রতিস্থাপন সংরক্ষণ

৩.২.১ পুরাতন পার্টর্স কী কী সমস্যা খুজে পেয়েছিলে তার তালিকা তৈরি করো।

৩.২.২ নতুন পার্টর্স কীভাবে মাদারবোর্ডে সংযুক্ত করলে তার তালিকা তৈরি করো।

৩.৩ রক্ষণাবেক্ষণের ডকুমেন্ট যথাযথ ব্যক্তির পরামর্শের সাথে পর্যালোচনা এবং আপডেট

৩.৩.১ পুর্বে তাই কম্পিউটারের পার্টর্স পরিবর্তন করানো হলে সেই ডকুমেন্ট সংগ্রহ করো।

৩.৩.২ নতুন বানানো রেকর্ড ও পূর্বের রেকর্ড যথাযথ ব্যক্তিকে দেখাও।

৩.৩.৩ নতুন কোনো কিছু রেকর্ডে থাকলে তা সংশ্লিষ্ট কর ।

৩.৫ রক্ষণাবেক্ষণের ডকুমেন্ট ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ

৩.১.১ আপডেটকৃত নতুন রেকর্ডের কপি তৈরি করো।

৩.১.২ রেকর্ডের একটি হার্ডকপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জমা দাও।

৩.১.৩ একটি সফট কপি পেনড্রাইভ বা অন্য কোথাও সংরক্ষন করো।

৪. থ্রেট চিহ্নিত এবং সিস্টেম রক্ষা

৪.১ সম্ভাব্য সিকিউরিটি থ্রেট চিহ্নিত করা

৪.১.১ Phishing.

৪.১.২ User Account Control (UAC).

৪.১.৩ Data Execution Prevention (DEP).

৪.১.৪ Malware.

৪.২ চিহ্নিত সিকিউরিটি থ্রেট'র বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয়ের জন্য থ্রেটসমূহ বিশ্লেষণ

৪.২.১ কম্পিউটারের পারফর্ম্যান্স স্লো হয়ে গিয়েছে কি না দেখো।

৪.২.২ শাটডাউন ও রিস্টার্ট নিয়ে সমস্যা হচ্ছে কি না দেখো।

৪.২.৩ ফাইলসমুহ বাদ পড়ছে কিনা যাচাই করো।

৪.২.৪ প্রায়ই সিস্টেম ক্রাশ বা এরোর মেসেজ দেখাচ্ছে নাকি চেক করো।

৪.২.৫ অনাকাঙ্ক্ষিত পপ-আপ মেনু বা এপ্লিকেশন শো করছে নাকি দেখো।

৪.২.৬ হার্ডড্রাইভ ওভারওয়ার্ক বা ব্রাউজার ল্যাগ করছে কি না দেখো।

৪.২.৭ উপোরোক্ত সমস্যাগুলো দেখা গেলে ধরে নাও কম্পিউটারটি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গিয়েছে।

৪.৩ আক্রান্তের সম্ভাব্য কারণগুলি নির্ধারণ

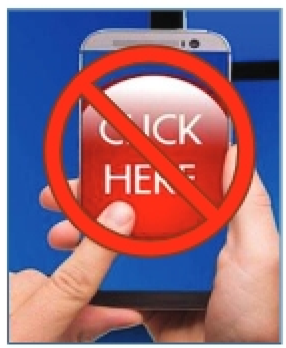

৪.৩.১ এছাড়াও অবিশ্বস্থ উৎস থেকে আসা লিংক ক্লিক করা,

৪.৩.২ যেখানে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রাখা,

৪.৩.৩ ম্যালওয়্যার এফেক্টেড ডিভাইস কম্পিউটারে কানেক্ট করা,

৪.৩.৪ অ্যান্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ব্যবহার না করা ।

৪.৪ অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সফ্‌টওয়্যার ইনস্টল

৪.৪.১ ব্রাউজার থেকে অ্যাভাস্ট এন্টিভাইরাস সফ্‌টওয়্যারের সেটআপ ফাইল ডাউনলোড করো।

৪.৪.২ ডাউনলোড ফোল্ডারে গিয়ে অ্যাভাস্টের আইকনে রাইট-ক্লিক করে পপ-আপ মেনু ওপেন হলে সেখানে "Run as Administrator" এ ক্লিক করো।

৪.৪.৩ User Account Control ডায়ালগ বক্সে Yes ক্লিক করো।

৪.৪.৪ এরপর ইন্সটল বাটনে ক্লিক করে ইন্সটলেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

৪.৪.৫ ইন্সটলেশন শেষ হলে কন্টিনিউ বাটনে চাপ।

আভাস্ট ইন্সটলেশন

৪.৭ গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলি নিয়মিত ব্যাকআপ তৈরি

৪.৭.১ স্টার্ট মেনু থেকে সেটিংসে যাও।

৪.৭.২ Update & Security তে ক্লিক করো।

৪.৭.৩ Backup এ গিয়ে Go to Backup and Restore (Windows 7) এ ক্লিক করো।

৪.৭.৪ বাম পাশের প্যানেল থেকে Create a system image এ ক্লিক করো।

৪.৭.৫ On a hard disk এ ক্লিক করো।

৪.৭.৫ Next এ ক্লিক করো।

৪.৭.৬ যেই হার্ডড্রাইভে ব্যাকআপ রাখতে চাও সেটি সিলেক্ট করে দাও।

৪.৭.৭ Next এ ক্লিক করো।

৪.৭.৮ Start backup অপশনে প্রেস করো।

৪.৭.৯ No তে ক্লিক করো।

৪.৭.১০ Close এ ক্লিক করো।

৪.৭.১১ ব্যাকআপ ফাইল ট্রান্সফার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

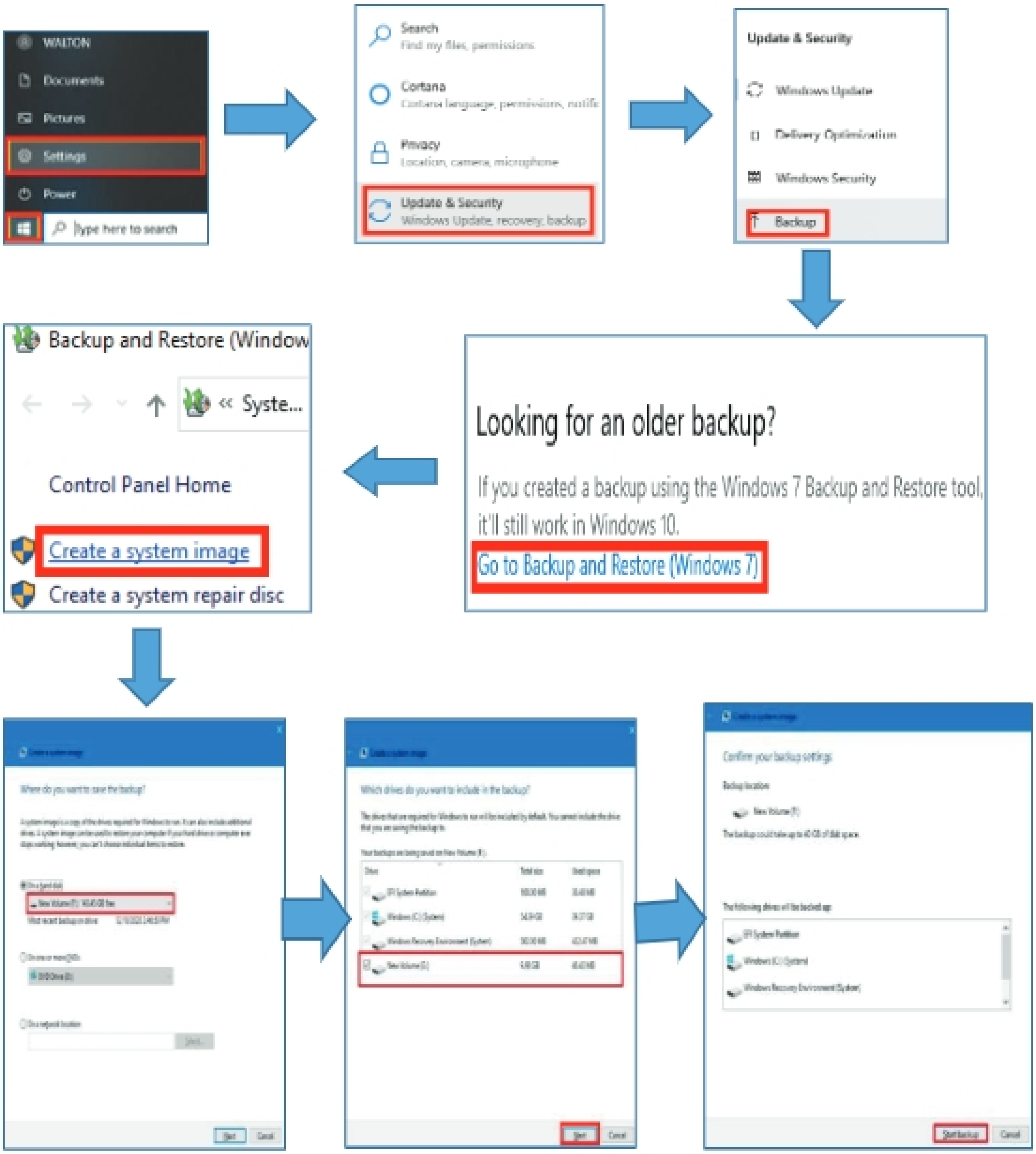

চিত্র: ফাইলের ব্যাকআপ তৈরি

৪.৭.১২ সম্পুর্ণ হওয়ার পর এক্সটার্নাল হার্ডডিস্কটিকে যথাযথ স্থানে সংরক্ষন করো।

৫.৯ অ্যান্টি-ম্যালওয়ার ব্যবহার করে সিকিউরিটি থ্রেট সিস্টেম থেকে সরানো-

৫.৯.১ টাস্কবারের নোটিফিকেশন এরিয়া থেকে উইন্ডোজ সিকিউরিটি অন করে ভাইরাস এন্ড থ্রেট প্রোটেকশন সিলেক্ট করো।

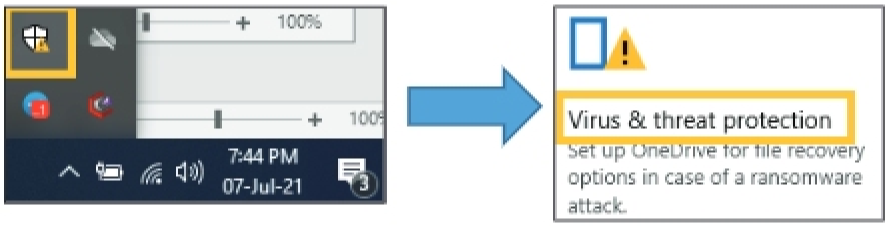

৫.৯.২ Scan option ক্লিক করে Windows Defender Offline scan সিলেক্ট করে Scan now এ ক্লিক করো। এই স্ক্যান অটোমেটিকলি ম্যালওয়্যার এফেক্টেড ফাইলগুলোকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠাবে।

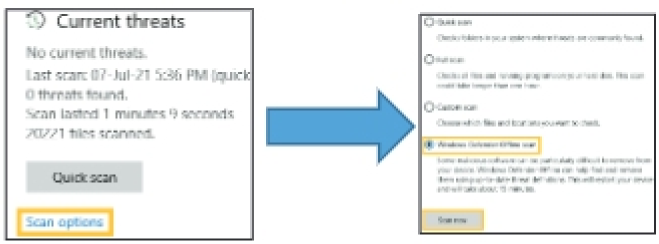

কাজের সতর্কতা: অপ্রয়োজনে কোন অপশন চালু বা বন্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

অ্যাসাইনমেন্ট : তোমাদের ল্যাবের কম্পিউটারগুলোতে অপারেটিং সিস্টেমের ডিফল্ট অ্যান্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার চালুর ব্যবস্থা করো।

অনুশীলনী-৩

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

৬. হার্ডওয়্যার কী?
৭. ডায়াগনস্টিক টুল কী?
৮. ম্যালওয়্যার কী?
৯. স্পেসি কী?
১০. ট্রোজান হর্স কী?
১১. এন্টিম্যালওয়্যার সফটওয়্যার কেন ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

৪. তোমার কম্পিউটার সিস্টেমের কর্মক্ষমতা কিভাবে বাড়াবে?
৫. এডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টের সুরক্ষা প্রদান জরুরি কেন?
৬. কম্পিউটারের কমন সমস্যাগুলো কী কী?
৭. কম্পিউটার সিস্টেমের সম্ভাব্য সিকিউরিটি থ্রেটসমুহ কী কী?
৮. কেন একটি কম্পিউটার সিকিউরিটি ঝুকির মধ্যে পরতে পারে?

রচনামুলক প্রশ্ন

৪. একটি সাধারন কম্পিউটারের বিভিন্ন পার্টস সম্পর্কে লেখ।
৫. ম্যালওয়ার সম্পর্কে লেখ।
৬. ডায়াগনোস্টিক টুল কী? বিস্তারিত বর্ণনা করো।
৭. কম্পিউটারের গুরুত্বপুর্ণ ফাইলের কিভাবে ব্যাকআপ তৈরি করবে? ধাপগুলো লেখ।

চতুর্থ অধ্যায়
ল্যাপটপ সার্ভিসিং
Laptop Servicing

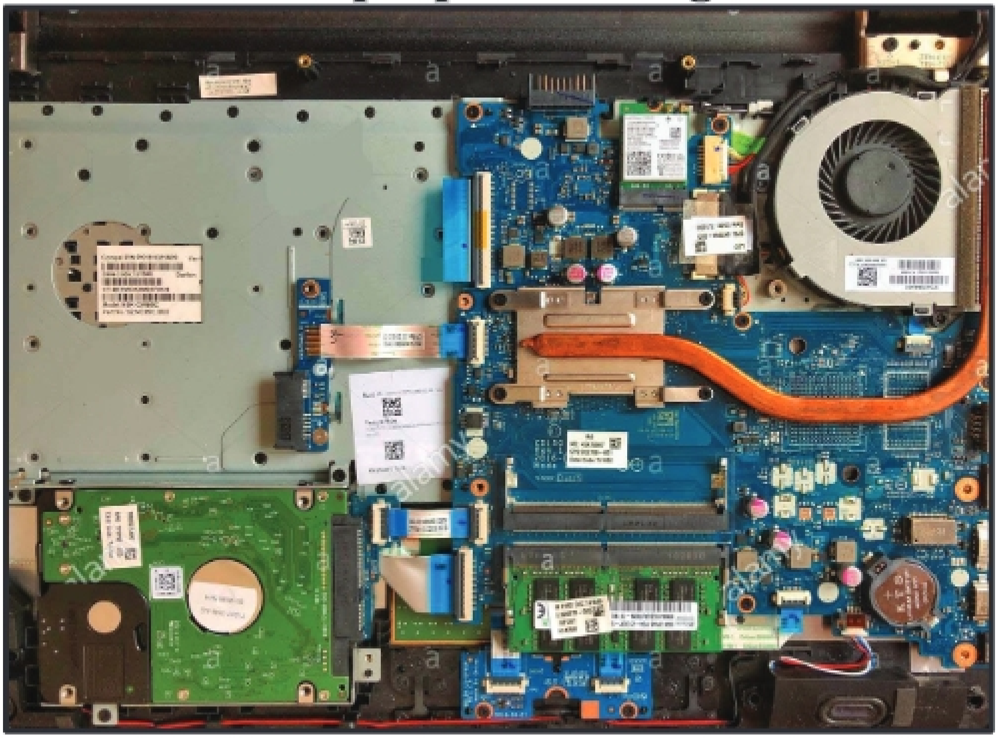

ল্যাপ (LAP) একটি ইংরেজী শব্দ। এর অর্থ হলো কোল। সাধারণ অর্থে ল্যাপটপ কম্পিউটার (Laptop Computer) বলতে বুঝায় সহজে বহনযোগ্য কোলের উপর নিয়ে কাজ করা যায় এমন কম্পিউটার কে বুঝায়। বর্তমানে ল্যাপটপ কম্পিউটার খুবই জনপ্রিয় এবং অপরিহার্য একটি ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র। এটি সহজে বহনযোগ্য বলে অফিস, বাসা, ট্রেন, বাস, বেড রুম, লিভিং রুম ইত্যাদি যেকোন জায়গায় এবং যে কোন পরিবেশে বসে কাজ করা যায়। ডেস্কটপ কম্পিউটার দিয়ে যে সকল কাজ করা যায় তার সকল কাজই ল্যাপটপ কম্পিউটার দিয়ে করা যায়। ব্যবহারজনিত কারণে বা সময়ের পরিক্রমায় যেকোন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস এ সমস্যা হতে পারে। এ কারণে বাজারে ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। একজন দক্ষ ল্যাপটপ সার্ভিসিং টেকনিশিয়ান শুধুমাত্র ল্যাপটপ সার্ভিসিং করে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ভরণপোষনের জন্য অর্থ উপার্জন করতে পারেন। এ অধ্যায়ে আমরা ল্যাপটপ কিভাবে সার্ভিসিং করতে হয় তা বিস্তারিত জানব ও ল্যাপটপ সার্ভিসিং এ দক্ষতা অর্জন করব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর জন্য ক্লায়েন্টের চাহিদা নিরুপন করতে পারব।

- ল্যাপটপ ডিসঅ্যাসেম্বল করতে পারব
- ল্যাপটপের পার্টস প্রতিস্থাপন/সংযুক্ত ও ছোট খাটো ট্রাবলসুটিং করতে পারব
- ল্যাপটপ অ্যাসেম্বল করতে পারব।
- ল্যাপটপের সাধারন ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে তা মেরামত করতে পারব।

উপরোক্ত শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা একটি জব সম্পন্ন করব। এ জবের মাধ্যমে ল্যাপটপ ডিসঅ্যাসেম্বল, বিভিন্ন কম্পোনেন্ট প্রতিস্থাপন ও সংযোগ এবং ল্যাপটপ অ্যাসেম্বল করার দক্ষতা অর্জন করব এবং জবটি সম্পন্ন করার পূর্বে প্রথমেই প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

২.১ ল্যাপটপ সার্ভিসিং-এ স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা

ইংরেজীতে একটা কথা আছে "Safety First" যার বাংলা অর্থ হচ্ছে "প্রথমেই নিরাপত্তা"। সার্ভিসিং শুরু করার পূর্বে জানব আগে জীবন তারপর কাজ। ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রিসিটির সাথে সম্পর্ক রয়েছে। তাই ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর পূর্বে সকল নিরাপত্তা অনুসরণ করে কাজ শুরু করবে। ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে ল্যাপটপ রাখার স্থানটি এমন জায়গায় হতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। কাজ শুরু করার পূর্বে নিজেকে নিরাপদে রেখে কাজ করবে। এজন্য মাস্ক, এ্যাপ্রোন, জুতা, গ্লাবস, পরিধান করবে। ল্যাপটপের কিছু যন্ত্রাংশ আছে যেগুলো মানুষের শরীরে যে পরিমান স্টাটিক ইলেকট্রিক চার্জ থাকে তার চেয়েও কম চার্জে ইফেক্টেড হতে পারে। সুতরাং বুঝতেই পারছ খালিহাতে ঐ সকল যন্ত্রাংশ স্পর্শ করলে মানুষের শরীরের স্টাটিক ইলেকট্রিসিটির প্রবাহের কারণে যন্ত্রাংশগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে; এ জন্য স্টাটিক ইলেকট্রিক চার্জ এর ক্ষতি থেকে যন্ত্রাংশসমূহকে রক্ষার জন্য এন্টি স্টাটিক ব্রাসলেট বা রিচ ব্যান্ড পরিধান করে কাজ শুরু করতে হবে।

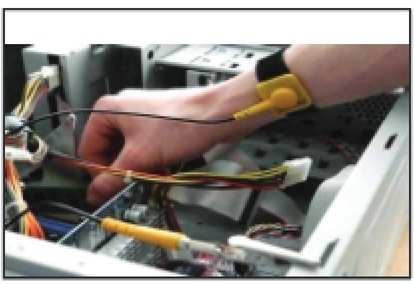

চিত্র: ২.১ এন্টি স্টাটিক ব্রাসলেট

চিত্র: ২.২ অ্যাপ্রোন

চিত্র: ২.৩ হ্যান্ড গ্লোভস

শোভন পোশাকের প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশে ছাত্র ও ছাত্রীদের পরিধেয় পোশাক কিছুটা আলাদা হয়। নিরাপত্তার ইস্যুতে তাই ছেলে ও মেয়েদের নিরাপত্তা পোশাকে কিছুটা পরিবর্তন থাকতে পারে। মেয়েরা সাধারণত সেলোয়ার-কামিজ পরে সাথে স্যান্ডেল আবার ছেলেরা সার্ট প্যান্টের সাথে স্যু পরে। কোনো কোনো ছেলে পাজামা পাঞ্জাবি পরে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কাজ করার সময় যেন প্রত্যেকেরই পায়ে রাবারের বা প্লাস্টিকের স্যু অথবা স্যান্ডেল থাকে। ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে রাবার বা প্লাস্টিকের স্যু/সান্ডেল পরে কাজ করা খুবই জরুরী, কেননা কোনো কারণে ইলেকট্রিক সক যেন মানুষের শরীরে যেন না লাগে সে দিকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে।

চাহিদা নিরুপন পদ্ধতি

সেবা গ্রহণকারী যখন তোমার সার্ভিস সেন্টার/দোকানের আসবে প্রথমে তুমি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে। তুমি সেবা গ্রহণকারীর কাছ থেকে জেনে নিবে তার ল্যাপটপে কোথায় সমস্যা হচ্ছে, কবে থেকে হচ্ছে, কেন হচ্ছে। এ সকল প্রশ্নের জবাব জেনে নিলে তোমার জন্য পরবর্তীতে কাজ করতে সুবিধা হবে। সে ক্ষেত্রে তার কথা তুমি একটি নোট খাতায় নোট করে নিবে। যখন কাজশুরু করবে তখন তার মন্তব্যগুলো খেয়াল করবে। তার সাথে আর্থিক বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করে নিবে। যেমন ল্যাপটপটি ঠিক করলে কিকি ডিভাইস লাগতে পারে অথবা মজুরী কত হবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সেবা গ্রহণকারীকে প্রদান করবে। আবার আমরা যারা ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করি তারা কাজ করার সময় দেখা যায় সেবা গ্রহণকারী যে অবস্থায় ল্যাপটপটি দিয়েছিল কাজ করার পর দেখা গেল ল্যাপটপটি ঠিকতো হয় নাই বরং আগে যে অবস্থায় ছিল তার চেয়ে বর্তমানে আরও খারাপ হয়ে গেল। কাজ করতে গেলে এমন অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। বিষয়গুলো সেবাগ্রহণকারীদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত করে নিবে। নতুবা তুমি নানা প্রকার জটিলতায় পড়তে পার।

ক্লায়েন্টের সাথে শোভন যোগাযোগ ও উত্তম সম্পর্ক স্থাপন

একজন ল্যাপটপ টেকনিশিয়ান হিসেবে তোমাকে যেমন ল্যাপটপ ঠিক/মেরামত করার দক্ষতা থাকতে হবে ঠিক তেমনি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, সেবাগ্রহণকারীদেরকে বুঝতে পারা, ভালো ব্যবহার করা, প্রয়াজনে হালকা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এ সকল বিষয়ে ভালো অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মানুষ মাত্রই বিনয়ী, ভদ্র আচরণ, সামান্য আপ্যায়ন পছন্দ করে। এ জন্য সেবা গ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক দৃঢ় করবে। তোমার দোকানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মানুষ যত আসা যাওয়া করবে ততো তোমার জন্য ভালো এবং লাভজনক হবে। এজন্য সেবা গ্রহণকারীদের সবসময় আপডেট তথ্য প্রদান করবে। এ জন্য তুমি মোবাইল ফোন নাম্বার, ইমেইল, ফেসবুক, হোয়াটসএ্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করতে পার। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়–মঙ্গলবার তোমার দোকান স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা থাকে কিন্তু ঐ দিন তোমার একটা সমস্যা হয়েছে, তুমি দোকান খুলতে পারবে না। ঐ দিন হয়তো তোমার কাছে অনেক সেবা গ্রহণকারী এসে ফেরত যাবে। সেবা গ্রহণকারী যাতে এসে ফেরত না যায় তার জন্য তুমি ফেসবুক পেইজ, ওয়াটসএ্যাপ এ মেসেজ দিয়ে রাখো অথবা মোবাইলে ফোন করে অথবা মেসেজ দিয়ে জানিয়ে রাখবে । এতে সেবাগ্রহণকারী তোমার উপর আস্থা লাভ করবে । ফলে ঐ সেবা গ্রহণকারী আরও দু - একজন কে তোমার সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করবে। ফলে দিন দিন তোমার ব্যবসায় উন্নতি হবে। এ কারণে এ ডিজিটাল যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো সেবা গ্রহণকারীদের সাথে উত্তম যোগাযোগ স্থাপন করা।

২.২ ল্যাপটপের স্পেসিফিকেশন

ল্যাপটপের প্রতিটি যন্ত্রাংশসমূহের নাম, বিবরণ ও পরিমাণকে একসাথে ল্যাপটপের স্পেসিফিকেশন বলে। ল্যাপটপের স্পেসিফিকেশন জানতে হলে আমাদের যে সকল বিষয় জানতে হয় তা হলো ব্রান্ডের নাম,জেনারেশন,প্রসেসর,সিপিইউ ক্লক স্পিড,র‍্যাম এর ধারণ ক্ষমতা,এসএসডি/হার্ড ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা, ডিসপ্লে ইউনিটের সাইজ, গ্রাফিক্স কার্ডের ধারণ ক্ষমতা, ওয়াইফাই রেঞ্জ, ব্লুটুথ রেঞ্চ ইত্যাদি।

ল্যাপটপ কম্পিউটারের বিভিন্ন ব্রান্ড

সাধারণত কাস্টমারের চাহিদার ভিত্তিতে স্পেসিফিকেশন তৈরি করতে হয়। এটা নির্ভর করে কাস্টমারের আর্থিক যোগানের উপর। ল্যাপটপের আপার ভার্সনের দাম লোয়ার ভার্সনের থেকে একটু বেশি হয়ে থাকে।

ল্যাপটপের স্পেসিফিকেশন এর আইটেম/ কম্পোনেন্টসমূহ

একটি ল্যাপটপ অনেকগুলো ডিভাইস/যন্ত্রাংশ/কম্পোন্টের সমন্বয়ে তৈরি হয়। যেমন– মাদার বোর্ড, র‍্যাম, এসএসডি/হার্ডডিস্ক, অপটিক্যাল ড্রাইভ ইত্যাদি। একজন দক্ষ ল্যাপটপ টেকনিশিয়ান হিসেবে ল্যাপটপের এ সকল কম্পোনেট সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে ল্যাপটপের কম্পোনেন্টসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ডিসপ্লে স্ক্রিন

ডিসপ্লে ডিভাইসটি ল্যাপটপের একটি আউটপুট ডিভাইস। এটি আমাদের কম্পিউটারে ব্যবহৃত মনিটরের মাতো কাজ করে। সাধারণ মনিটর ও ল্যাপটপের ডিসপ্লে ইউনিটের পার্থক্য হলো–মনিটর আলাদা একটি ডিভাইস। এর সাথে কম্পিউটারের ডেটা ক্যাবল ও পাওয়ার সাপ্লাই আলাদা আলাদা দিতে হয়। ল্যাপটপের ডিসপ্লেটি ল্যাপটপের সাথে একত্রে থাকে। আলাদা ডেটা ক্যাবল বা পাওয়ার ক্যাবল সংযোগ দিতে হয় না। সাধারণ মনিটরের চেয়ে ল্যাপটপের ডিসপ্লেতে বিদ্যুৎ খরচ কম।

চিত্র ২.৪: ডিসপ্লে ইউনিট

কী-বোর্ড

ল্যাপটপের কীবোর্ড ল্যাপটপের সাথে বিল্টইন থাকে। সাধারণ কীবোর্ড ক্যাবল দিয়ে কম্পিউটারে সংযোগ করতে হয়। কিন্তু ল্যাপটপের কীবোর্ড রিবন দিয়ে ল্যাপটপের মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ করা থাকে। তবে সাধারণ কীবোর্ডের কী সংখ্যা ও ল্যাপট কীবোর্ডের কী সংখ্যা সমান নয়। ল্যাপটপ কীবোর্ডে কিছু স্পেশাল কী থাকে। যেমন-ব্রাইটনেস কী, স্পিকার ভলিউম কী, ওয়াইফাই কী ইত্যাদি।

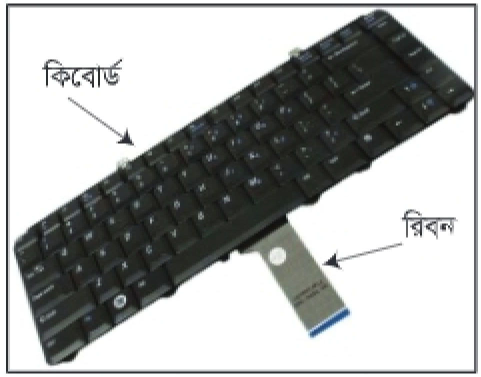

চিত্র ২.৫: রিবনসহ ল্যাপটপ কীবোর্ড

বেজ প্যানেল

বেস প্যানেলকে ডেস্কটপ কম্পিউটারের কেসিং এর সাথে তুলনা করা যায়। এ কেস এ ল্যাপটপের মাদারবোর্ডটি স্থাপন করা হয়।ল্যাপটপের সাইজ ও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ডিজাইন অনুযায়ী বেজ প্যানেল তৈরি করা হয়।

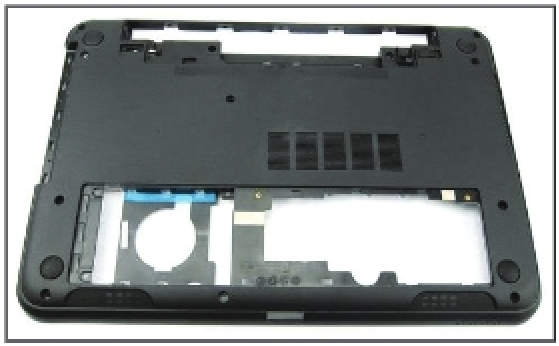

চিত্র ২.৬: বেজ প্যানেল

টপ প্যানেল

ল্যাপটপে মেরামতের কাজ করার সময় আমরা ল্যাপটপের ডিসপ্লে অংশকে নিচের দিকে রেখে কাজ করি। ল্যাপটপে মেরামতের কাজ করার সময় যে তলা স্ক্রু দিয়ে আটকানো থাকে সেটিই হলো টপ প্যানেল। টপ প্যানেলকে ডেক্সটপ কম্পিউটারের কভার হিসেবে বিবেচনা করা যায়। মাদার বোর্ড, হার্ড ডিস্ক, র‌্যাম, এসএসডি ইত্যাদি যন্ত্রাংশসমূহকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কভার ব্যবহার করা হয়।

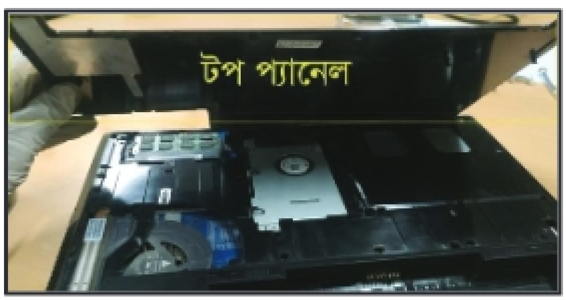

চিত্র ২.৭: টপ প্যানেল

টপ প্যানেল লাগানোর পর স্ক্রু দিয়ে কভার ও বেজ প্যানেল শক্তভাবে আটকানো থাকে।

সিস্টেম বোর্ড

সিস্টেম বোর্ডকে অনেকে মাদার বোর্ড নামে বেশি চিনে। এ বোর্ডে যে সকল কম্পোনেন্ট থাকে তা হলো-CPU (Central Processing Unit), GMCH (Northbridge), ICH (Southbridge), RAM, SIO IC, BIOS IC, Charge IC, System Power 3V/5V IC, CPU Power IC, RAM Power IC, System Power

২০২৪

1,8V/1,5V IC, Clock Generator IC, Audio IC, RJ45 IC, Mosfet / Transistor, Coils, Polarized Capacitor, PF Capacitor, Diode , Resistor , Quartz Crystal Oscillator. CMOS Battery, CPU Fan. এ সকল কম্পোনেন্ট এর মধ্যে সবগুলো কম্পোন্টে নিয়ে আমরা মেরামতের কাজ করতে পারি না। মেরামতের কাজ করা যায় এমনকিছু পোর্ট, ডিভাইস, কম্পোনেন্ট নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

সিপিইউ (CPU-Central Processing Unit): ল্যাপটপের সিপিইউ/প্রসেসর সাধারণত বিল্ট ইন অবস্থায় থাকে। পুরাতন কিছু কিছু মাদার বোর্ডের প্রসেসর আলাদা থাকলেও এখনকার প্রায় সকল মাদারবোর্ডে প্রসেসর মাদার বোর্ডের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে। কোন কারণে প্রসেসর নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ মাদার বোর্ড পাল্টাতে হয়। তবে কিছু কিছু আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান আছেন যারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিজিএ (BGA-Ball Grid Array) মেশিনের মাধ্যমে ব্যবহৃত প্রসেসর আলাদা করতে পারেন এবং সঠিক জায়গায় নতুন প্রসেসর লাগাতে পারেন। এটি একটি জটিল ও ব্যববহুল প্রক্রিয়া। বাজারে বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন জেনারেশনের ল্যাপটপ প্রসেসর পাওয়া যায়। যেমন– Core i3, Core i5, Core i7 ইত্যাদি।

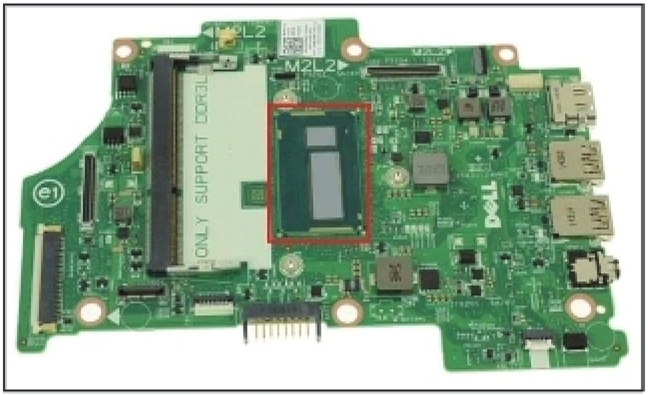

চিত্র ২.৮: ল্যাপটপ প্রসেসর

র‍্যাম স্লট

র‍্যাম স্লটে র‍্যাম বসানো থাকে। ল্যাপটপের র‍্যাম স্লট ডেস্কটপ কম্পিউটারের চেয়ে একটু আলাদা হয়। তাই ল্যাপটপের র‍্যামের সাইজও ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তুলনামূলকভাবে ডেস্কটপ কম্পিউটারের র‍্যাম সাইজে একটু বড় আর ল্যাপটপের র‍্যাম ছোট।

চিত্র ২.৯: র‍্যাম স্লট

এসএটিএ (SATA-Serial Advanced Technology Attachment) এবং এসএটিএ পাওয়ার

এসএটিএ পোর্টে অপটিক্যাল ড্রাইভ যেমন ডিভিডি ড্রাইভ সংযোগ করা হয় এবং এসএটিএ পাওয়ারটি অপটিক্যাল ড্রাইভের পাওয়ার পোর্টে সংযোগ দেয়া হয়। তবে কোন কোন মাদার বোর্ডে এসএটিএ পোর্টে হার্ডডিস্ক লাগানো হয়।

হার্ডডিস্ক সংযোগ পোর্ট: এ পোর্টে হার্ডডিস্কের সংযোগ দেয়া হয়। এ পোর্টে ডাটা কেবল ও পাওয়ার ক্যাবল একত্রে থাকে।

চিত্র ২.১০: হার্ড ডিস্ক সংযোগ পোর্ট

ডিসপ্লে পোর্ট

মাদার বোর্ডের ডিসপ্লে পোর্টের সাথে ল্যাপটপের ডিসপ্লে ইউনিট সংযোগ করা হয়। কোন কোন ল্যাপটপের ডিসপ্লেতে রিবন থাকে আবার কখনও ক্যাবল থাকে। ডিসপ্লে সংযোগের পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে ডিসপ্লে কোন ধরনের, ক্যাবল নাকি রিবন। কানেকশন পদ্ধতি রিবনের হলে একধরণের পোর্ট হবে আবার ক্যাবল হলে অন্য ধরণের পোর্ট হবে। তবে সাধারণত দুই ধরণের পোর্ট একই মাদার বোর্ডে থাকে না।

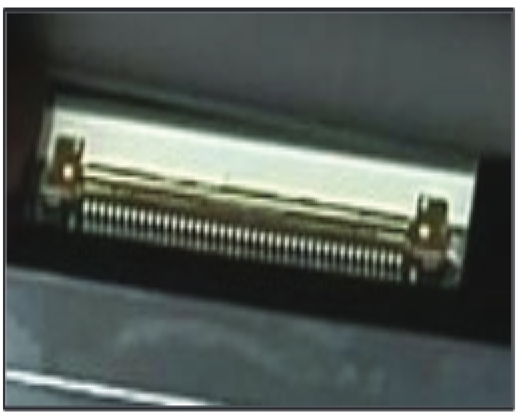

চিত্র ২.১১: ডিসপ্লে পোর্ট রিবন টাইপ

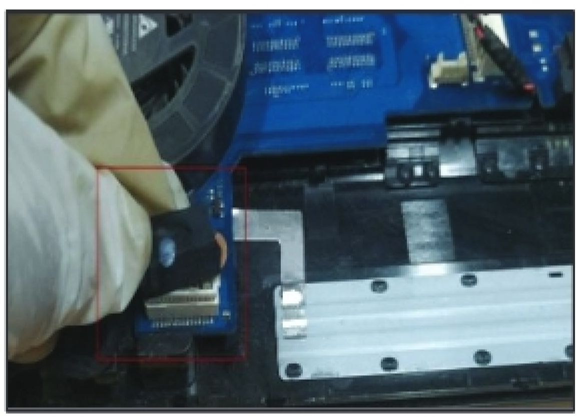

চিত্র ২.১২: ডিসপ্লে পোর্ট ক্যাবল টাইপ

কুলিং ফ্যান পাওয়ার পোর্ট

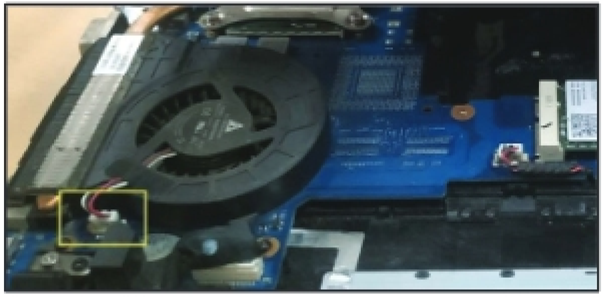

চিত্র ২.১৩: কুলিং ফ্যান পাওয়ার পোর্ট

কুলিং ফ্যানের পাওয়ার এই পোর্ট থেকে সংযোগ করা হয়। এটি ± ডিসি ৫ ভোল্ট ২০ ওয়াটের একটি পাওয়ার কানেক্টর। কুলিং ফ্যান কোনো কারণে নষ্ট থাকলে প্রসেসর ঠিক মতো কাজ করতে পারে না। সে কারণে কুলিং ফ্যান নষ্ট থাকলে ল্যাপটপ অকেজো হয়ে যায়। এ কারণে ল্যাপটপ চালু করলে দেখে নিতে হয় কুলিং ফ্যান চালু আছে কিনা। সাধারণত হাত দিয়ে বাতাস অনুভব করে অর্থাৎ ফ্যানের শব্দ শুনে নিশ্চিত হওয়া যায় ফ্যান চালু আছে কি নাই।

কীবোর্ড রিবন পোর্ট

এ পোর্টে ল্যাপটপের কী-বোর্ড সংযোগ করা হয়। কোন কারণে রিবন নষ্ট হলে বা ছিড়ে গেলে কী-বোর্ডের ফাংশন কাজ করে না। এ কারণে রিবন নষ্ট হলে নতুন কী-বোর্ড কিনে রিপ্লেস করতে হয় অথবা ইউএসবি কী-বোর্ড ব্যবহার করে কাজ করা হয়।

মাউস রিবন পোর্ট

ল্যাপটপের টাচপ্যাড তাই সেটি এ পোর্টের সাথে সংযোগ করা হয়। টাচপ্যাডে রিবন কাজ না করলে ইউএসবি পোর্টের মাউস দিয়ে টাচপ্যাডের কাজ করা যায়।

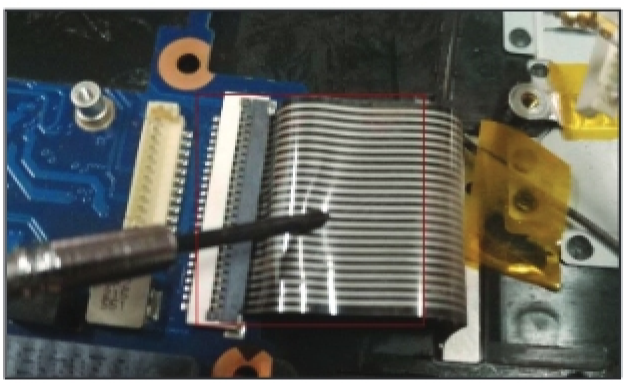

চিত্র ২.১৪: কী-বোর্ড রিবন পোর্ট

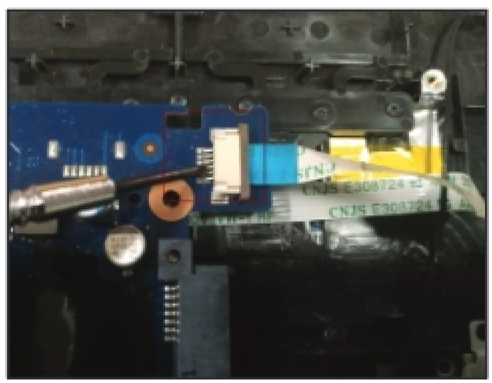

চিত্র ২.১৫: মাউস রিবন পোর্ট

ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক কার্ড স্লট: এ স্লটে ওয়ারলেস ডিভাইস সংযোগ করা হয়।

স্পিকার পোর্ট

ল্যাপটপের ভিতরে যে ইন্টারনাল স্পিকার থাকে সেটির সংযোগ এ পোর্টে দেয়া হয়।

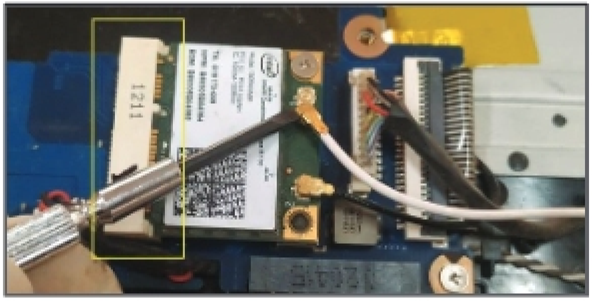

চিত্র ২.১৬: ওয়্যারলেস পোর্ট

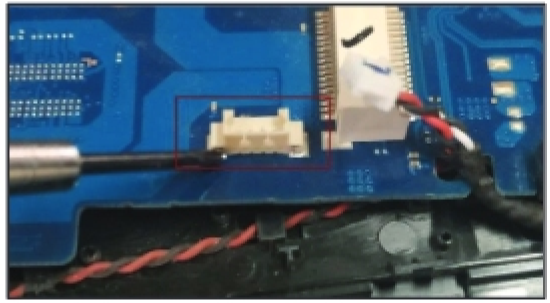

চিত্র ২.১৭: স্পিকার পোর্ট

কুলিং ফ্যান

কুলিং ফ্যান ল্যাপটপের কম্পোনেন্ট সমুহ বিশেষ করে প্রসেসরকে ঠান্ডা রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। ল্যাপটপ চালু অবস্থায় থাকলে এর প্রসেসর গরম হয়। তখন ঠান্ডা না করলে ল্যাপটপ কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এ জন্য কুলিং ফ্যান সবসময় সচল রাখা প্রয়োজন।

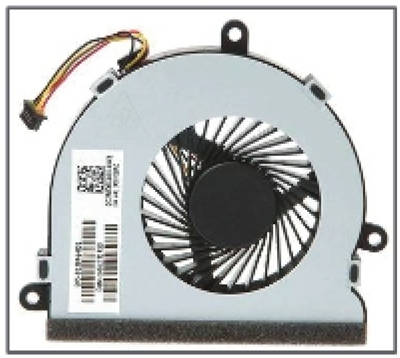

চিত্র ২.১৮: কুলিং ফ্যান

মাইক্রোপ্রসেসরের থার্মাল কুলিং সিস্টেম

প্রতিটি কম্পিউটিং ডিক্স ডিভাইসে প্রসেসর, গ্রাফিক্স, মেমোরি ড্রাইভস অন্যান্য কম্পোনেন্ট বা পার্টর্সক শীতল করতে কুলিং সিস্টেম রয়েছে। ল্যাপটপেও এ ধরণের একটি শীতল করার পদ্ধতি রয়েছে। এ শীতল সিস্টেমটি ল্যাপটপের প্রসেসরকে অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা করে ল্যাপটপকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার ব্যবস্থা করে থাকে। ল্যাপটপে কুলিং সিস্টেমে সাধারণত তিনটি কম্পোনেন্ট ব্যবহার করা হয়। যেমন–

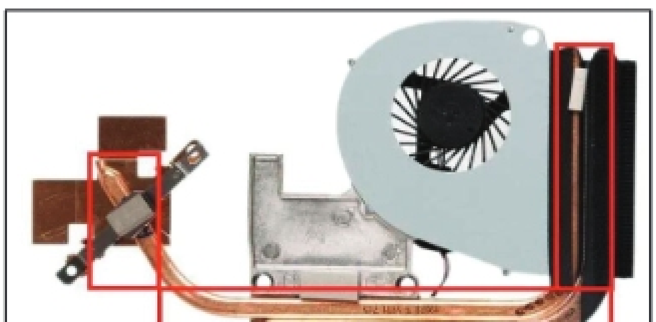

চিত্র ২.১৯: থার্মাল কুলিং সিস্টেম

(ক) তাপ নিয়ন্ত্রন টিউব: এই টিউবের ভিতর দিয়ে বিশেষ ধরনের তরল প্রবাহিত করা হয় যা প্রসেসর থেকে তাপ অপসারণ করতে সহায়তা করে।এই টিউব গুলো সাধারণত তামা তৈরি। ফলে অতিরিক্ত তাপ কুলিং ফ্যানের কাছে ট্রান্সফার করে তা নিয়ন্ত্রন করা যায়

(খ) কপার রেডিয়েটর: একটি ছোট তামার প্লেট যা তাপ দূর করে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাতটি এ্যালুমিনিয়াম দিয়েও তৈরি করা হয়।

(গ) ফ্যান: কুলিং সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ফ্যান। এটি ল্যাপটপের গরম বাতাসকে উড়িয়ে দিতে সহায়তা করে। কুলারের ঘূর্ণন গতি প্রসেসরের সেন্সর দ্বারা নির্ধারিত হয়।

র‍্যাম (RAM-Random Access Memory)**:** র‍্যাম ল্যাপটপের একটি প্রাইমারী/প্রধান স্মৃতি। র‍্যাম ছাড়া ল্যাপটপ অচল। কোন কারণে ব্যবহৃত ল্যাপটপে র‍্যাম নষ্ট থাকলে ল্যাপটপ অচল হয়ে যাবে। এমনকি ডিসপ্লেতে কোন তথ্য বা দৃশ্য দেখা যাবে না। ল্যাপটপের জেনারেশন বিভিন্ন ধরনের র‍্যাম ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন– ডিডিআর (DDR-Double Data Rate) ডিডিআর-২, ডিডিআর-৩, বর্তমানের ল্যাপটপগুলোতে ডিডিআর-৩ এবং ডিডিআর-৪ এর ব্যাবহার বেশি। তোমরা একটি বিষয় খেয়াল রাখবে যে সকল ল্যাপটপের মাদার বোর্ড ডিডিআর-৩ এর জন্য তৈরি সে সকল মাদারবোর্ডে ডিডিআর-৪ অথবা অন্য কোন সিরিজের র‍্যাম লাগাতে পারবে না। এর একটা কারণ হল– ডিডিআর-৩ এবং ডিডিআর-৪ এর খাঁজ (Notch) সমান দূরত্বে থাকে না। ফলে যে মাদার বোর্ডে যেরকম খাঁজ সে মাদার বোর্ডে তেমন র‍্যাম লাগাতে হবে। প্রতি সিরিজের র‍্যামের ধারণ ক্ষমতা ও বাস স্পিড আলাদা থাকে। র‍্যাম পরিবর্তন করার সময় তোমাকে এটাও খেয়াল রাখতে হবে,তোমার ল্যাপটপ সর্বোচ্চ কত বাস স্পিডের অথবা সর্বোচ্চ কত ধারণ ক্ষমতার র‍্যাম সাপোর্ট করে।

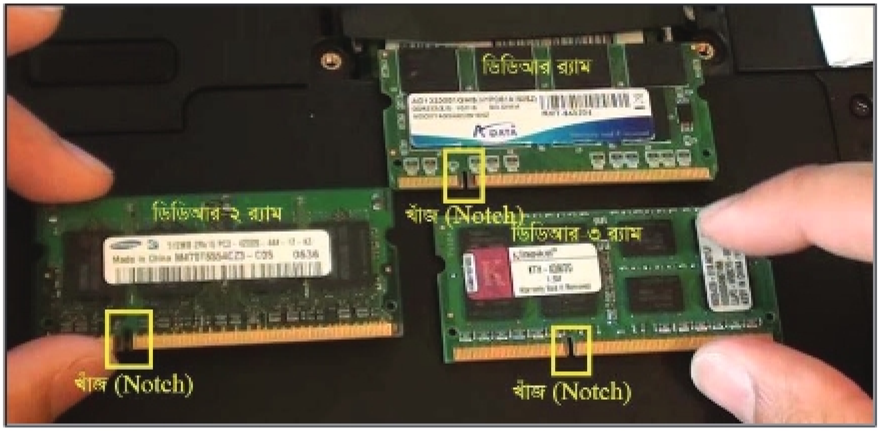

চিত্র ২.২০: বিভিন্ন সিরিজের র‍্যাম

হার্ড ড্রাইভ/ ডিস্ক

চিত্র ২.২১: ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক

হার্ড ড্রাইভ কে আমরা হার্ডডিস্ক নামেও চিনি। এটি একটি সেকেন্ডারি/অক্সিলারি স্মৃতি হিসেবে ল্যাপটপে কাজ করে। এ ডিস্কে সাধারণত অপারেটিং সিস্টেম যেমন–উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম, লিনাক্স, ইউনিক্স ইত্যাদির মধ্যে থেকে যে কোন একটি অথবা দুটি অথবা তিনটি অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা থাকে। আমরা যে সকল এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যেমন–মাইক্রোসফট অফিস, অটোক্যাড, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর ইত্যাদি ব্যবহার করি এসকল সফটওয়্যার সাধারণত হার্ড ড্রাইভে ইনস্টল করতে হয়। আবার আমরা যখন এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করে কোন ডকুমেন্ট তৈরি করি সেসকল ডকুমেন্ট স্থায়ীভাবে জমা রেখে পরবর্তীতে আবার ব্যবহার করার জন্য হার্ড ড্রাইভে জমা রাখি। ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ হার্ড ডিস্কের মূল পার্থক্য হলো এর আকারে। ডেস্কটপ কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক ৩.৫ ইঞ্চি হার্ড ডিস্ক নামে পরিচিত যার দৈর্ঘ × প্রস্থ × উচ্চতা = ৫.৭৫ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি × ১ ইঞ্চি। ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক ২.৫ ইঞ্চি হার্ড ডিস্ক নামে পরিচিত যার দৈর্ঘ × প্রস্থ × উচ্চতা = ২.৮ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি × ০.৪ ইঞ্চি। হার্ড ডিস্কে ফিজিক্যাল সাইজ দু রকমের হলেও ধারণক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধারণের হার্ড ড্রাইভ আছে। বর্তমানে আমাদের কম্পিউটার বাজারে খুব সহজলভ্য হার্ড ডিস্ক হলো ১ টিবি থেকে ১০০ টিবি পর্যন্ত। দুই ধরণের পোর্ট যুক্ত ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করা হয়। পিএটিএ (PATA-Parallel Advanced Technology Attachment) এবং এসএটিএ (SATA-Serial Advanced Technology Attachment)। বর্তমানে এসএটিএ পোর্টের হার্ড ডিস্ক ব্যবহৃত হচ্ছে। হার্ড ডিস্ক কত দ্রুত সময়ে কাজ করবে সেটি নির্ভর করে হার্ড ডিস্কের স্পিডের উপর। বর্তমানে আমরা ৭২০০ আরপিএম এর হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করছি।

টাচপ্যাড (Touch Pad)

টাচ একটি ইংরেজী শব্দ। এর অর্থ স্পর্শ করা। টাসপ্যাড হলো এমন একটি ইনপুট ডিভাইস যার উপর হাতের আঙ্গুল ঘুরিয়ে মাউসের কার্সর পয়েন্টার ডানে-বামে, উপরে-নীচে ঘুরানো যায়। ফলে ল্যাপটপ স্ক্রিনের যে কোন জায়গায় মাউস পয়েন্টার রাখা যায়। টাচপ্যাডের কাজকে আমাদের বহুল ব্যবহৃত মাউসের সাথে তুলনা করা যায়। সত্যিকার অর্থে মাউস দিয়ে আমরা যে কাজ করি ল্যাপটপের টাচপ্যাড সে কাজটিই করে থাকি। আমরা মাউস ব্যবহারের সময় মাউস পয়েন্টার যে দিকে নেব মাউসকে ঠিক সেদিকে ঘুরাতে হয়। কিন্তু টাচপ্যাড ব্যবহারে একটু ভিন্নতা রয়েছে সেটি হল আমরা মাউস পয়েন্টার যেদিকে নিতে চাই আমাদের হাতের আঙ্গুল সেদিকে নিতে হয়। অর্থ্যাৎ মাউসের ক্ষেত্রে মাউস পয়েন্টার ঘুরানোর জন্য মাউস ঘুরে আর টাচপ্যাডের ক্ষেত্রে মাউস পয়েন্টার ঘুরানোর জন্য আমাদের হাতের আঙ্গুল ঘুরে। টাচপ্যাডে বাম বাটন ও ডান বাটন নামে দুটি বাটন থাকে। তবে কোনো কোনো টাচপ্যাডে বাটন নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে হাতের আঙ্গুল একটু উপরে উঠিয়ে ছেড়ে দিলে সিঙ্গেল ক্লিক হয় আর দ্রুত দুবার আঙ্গুল উপরে উঠিয়ে ছেড়ে দিলে ডাবল ক্লিক হয়। টাচপ্যাডটি মাদার বোর্ডের সাথে একটি রিবন কন্ডাক্টারের মাধ্যমে সংযোগ করা থাকে। টাচপ্যাড অকেজো হয়ে গেলে বিকল্প হিসেবে ইউএসবি পোর্টে মাউস লাগিয়ে টাচপ্যাডের কাজ করা যায়।

চিত্র ২.২২: টাচপ্যাড

ব্যাটারি (battery)

ব্যাটারির সাথে আমরা বেশ পরিচিত। নানাবিধ ইলেকট্রিক্সি ডিভাইস মোবাইল ফোন, রিমোটকন্ট্রোল, বাচ্চাদের খেলনা, কলিং বেল, আইপড ইত্যাদি ব্যাটারি ছাড়া চলতে পারে না। ল্যাপটপের মধ্যেও একটি রিচার্জেবল ব্যাটারি থাকে। আমরা যখন ল্যাপটপে কাজ করি কখনো সরাসরি A/C লাইনে সংযোগ করে কাজ করি। তখন ল্যাপটপে ব্যবহৃত ব্যাটারী চার্জ ধারণ করে। পরবর্তীতে আমরা A/C লাইনে সরাসরি সংযোগ না করেও কাজ করতে পারি। তখন ব্যাটারী ব্যাকআপ এর পাওয়ার বা চার্জ ব্যাবহার করে ল্যাপটপে কাজ করি।

চিত্র ২.২৩: ল্যাপটপের ব্যাটারি

এটি ল্যাপটপের একটি বড় সুবিধা। রিচার্জেবল ব্যাটারি থাকার কারণে আমারা যেকোন পরিবেশে যেমন- বেডরুম, লিভিংরুম, বাস, ট্রেন, ক্লাশরুম, অফিসরুম ইত্যাদি জায়গায় জরুরী প্রয়োজনে ল্যাপটপ ব্যবহার করতে পারি। আমরা সচরাচর যে সকল ড্রাইসেল রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার করি সেরকম ৬/৮ টি ড্রাইসেল

রিচার্জেবল ব্যাটরী সিরিজে সংযোগ দিয়ে ল্যাপটপের ব্যাটারি কেস এ সাজিয়ে সংযোগ পোর্টের সাথে ল্যাপটপের সাথে সংযোগ করে ব্যবহার করা হয়। ব্যাটারিতে সেলের সংখ্যা যত বেশি হবে ব্যাটারী তত বেশি চার্জ ধরে রাখতে পারবে অর্থ্যাৎ ল্যাপটপ তত বেশি সময় চালানো যাবে। বাজারে সাধারণত তিন ধরনের টেকনোলজির ব্যাটারী পাওয়া যায়। Nickel Cadmium (Ni-Cd), Nickel Metal Hydride (Ni-MH), Lithium Ion (Li-ion) | বর্তমানে Lithium Ion (Li-ion) টেকনোলজির ব্যাটারি বেশি ব্যবহৃত হয়। তোমরা অনেক সময় লক্ষ করবে ব্যাটারীর গায়ে ব্যাটারি ক্যাপাসিটি যেমন– 8800 mAh (milliampere hour) লেখা থাকে। mAh এটি ইলেকট্রিক চার্জের একক। এটি যত বেশি হবে ব্যাটারি চার্জধারণ ক্ষমতা তত বেশি। সুতরাং তোমরা যখন ল্যাপটপ কিনবে mAh বেশি দেখে কিনবে।

স্পিকার

স্পিকার ল্যাপটপের প্রসেসকৃত অডিও সিগনালকে মানুষের বোধগম্য শব্দে রূপান্তর করে সচারাচর। ল্যাপটপে ছোট স্পিকার ব্যবহার করা হয় কোন কোন ল্যাপটপে একটি আবার কোন ল্যাপটপে দুটি স্পিকার ব্যাবহার করা হয়। স্পিকারগুলো ল্যাপটপের কভারের মধ্যে সেট করতে হয়। প্রত্যেক মডেলের ল্যাপটপের জন্য আলাদা মডেলের স্পিকার সংগ্রহ করে লাগাতে হয়।প্রত্যেকটি ল্যাপটপের কেসিং আলাদা তাই সব স্পিকার সবধরণের ল্যাপটপের সাথে সংযোগ করা সম্ভব হয় না। স্পিকারের ক্যাবলের শেষ প্রান্তে একটি জ্যাক থাকে এ জ্যাকটি মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ করতে হয়। ল্যাপটপে ব্যবহৃত স্পিকারের পাওয়ার সাধারণত ১ থেকে ৫ ওয়াটের হয়।

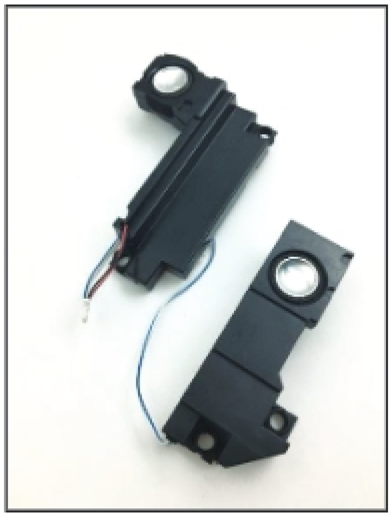

চিত্র ২.২৪: ল্যাপটপের স্পিকার

অপটিক্যাল ড্রাইভ অপটিক্যাল শব্দের অর্থ আলোক শক্তির এ বিশেষক ক্রিয়া ব্যবহার করে কম্পিউটারে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অপটিক্যাল ড্রাইভ আলোক শক্তি ব্যবহার করে কাজ করে। সিডি ড্রাইভ ও ডিভিডি ড্রাইভ অপটিক্যাল ড্রাইভের দুটি উদাহরণ। অপটিক্যাল ড্রাইভ মূলত আলোর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে তথ্য জমা করে। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটারের তথ্যের উপর ভিত্তি করে

চিত্র ২.২৫: অপটিক্যাল ড্রাইভ

আলো ডিস্কের উপর ফেলা হয়। ডিস্কের উপর একধরণের পাতলা প্লাস্টিকের আবরণ থাকে। যেখানে আলো পরে ঐ জায়গায় আলোক রশ্মির কারণে পুড়ে যেয়ে একধরনের ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। যাকে আমারা তথ্য লেখা (রাইট) বলি। যখন কোন অপটিক্যাল ড্রাইভ সিডি অথবা ডিভিডি থেকে তথ্য পড়ে (রিড) করে তখন পূর্বে জমাকৃত আলোক রশ্মির মাধ্যমে হওয়া ছিদ্রের উপর ভিত্তি করে জমাকৃত তথ্য আবার কম্পিউটারে উপাস্থাপন করে। যাকে আমরা তথ্য পড়া (রিড) বলি। ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ল্যাপটপ কম্পিউটারে ব্যবহৃত অপটিক্যাল ড্রাইভের টেকনোলজি এক হলেও ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ল্যাপটপ কম্পিউটারের অপটিক্যাল ড্রাইভের আকারে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

ল্যাপটপে ব্যবহৃত অপটিক্যাল ড্রাইভটি তুলনামূলকভাবে পাতলা ও আকারে ছোট থাকে। অপটিক্যাল ড্রাইভের একটি এসএটিএ পোর্ট ও একটি এসএটিএ পাওয়ার পোর্ট থাকে। এ পোর্ট দুটি মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ করা থাকে।

WiFi (Wireless fidelity) card: WiFi শব্দটির সাথে আমরা বেশ পরিচিত। এটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের তারবিহীন একটি পদ্ধতির নাম। যেমন– আমরা ছোট নেওয়ার্কে ডাটা ট্রান্সফারের জন্য Bluetooth অথবা Infra Red ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করি। WiFi ঠিক তেমনি ডাটা আদান প্রদানের একটি তারবিহীন মাধ্যম। এ মাধ্যমটি ব্যবহারের জন্য যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করা হয় তার নাম WiFi কার্ড। মূলত WiFi কার্ড একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট মাত্র। এটি আলাদা একটি ইউনিট। যে ইউনিটটি ল্যাপটপের মাদারবোর্ডে WiFi স্লটে সংযোগ করে ব্যবহার করা হয়। WiFi কার্ডে সিগনাল আদান প্রদানের জন্য ছোট দুটি এন্টিনা থাকে। এ এন্টিনার সাথে দুটি তারের সংযোগ থাকে এবং তারের অপর প্রান্ত ল্যাপটপের এ্যালুমোনিয়াম বডির সাথে সংযুক্ত থাকে ফলে এ তারটি এন্টিনা হিসেবে কাজ করে। সাধারণত WiFi ডিভাইস ৫০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত কাজ করতে পারে।

চিত্র ২.২৬: WiFi কার্ড

২০২৪

WiFi (Wireless fidelity) card Socket: WiFi কার্ড ল্যাপটপের যে অংশে লাগানোর ব্যবস্থা থাকে সে অংশকে ওয়াইফাই কার্ড সকেট বলে। ওয়াইফাই কার্ডে কন্ডাকটিভ লাইনের পাশে দুটি খাঁজ থাকে এবং ওয়াইফাই স্লটেও দুটি খাঁজ থাকে। ওয়াইফাই কার্ডকে ওয়াইফাই সকেটে এমনভাবে বসাতে হয় যেন কার্ডটি খাঁজ বরাবর বসে। খাঁজ বরাবর কার্ডটি বসানোর পরে কার্ডটিকে আটকানোর জন্য একটি বা দুটি স্ক্রু দিয়ে লাগাতে হয়।

চিত্র ২.২৭: WiFi সকেট

Eye Tracking Sensor: Eye Tracking Sensor বর্তমান বিশ্বে জাদুকরী ইলেকট্রনিক ডিভাইস হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এ সেন্সরটি মানুষের চোখকে ইনপুট ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করে। আমরা যখন কোন ফোল্ডার বা ফাইল মাউস দিয়ে সিলেক্ট করি তখন মাউসকে ঘুরিয়ে ফাইল বা ফোল্ডারের উপর রেখে বাম বাটন দিয়ে একটি হালকা ক্লিক করি। যখন এ কাজটি করি তখন ফাইল বা ফোল্ডারের গ্রাফিক্স পরিবর্তন হয়। অর্থ্যাৎ এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পরিবর্তন হয় যাতে আমরা বুঝতে পারি আমার কাঙ্খিত ফাইল অথবা ফোল্ডার সিলেক্ট হয়েছে। এ কাজটি Eye Tracking Sensor দিয়ে মাউস ছাড়া চোখের মাধ্যমে আরও দ্রুত করা যায়। শুধুমাত্র চোখ দিয়ে যে ফোল্ডার বা ফাইল সিলেক্ট করব সেদিকে তাকালেই হবে। আইট্রেকিং ডিভাইজ ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করে। চোখ দিয়ে মাউসের কাজ করা সম্ভব যদি মাউসের মতো ডাবল ক্লিক করতে চাও তবে যে ফোল্ডার বা ফাইল ওপেন করতে চাও ওটারদিকে তাকিয়ে চোখের (Blink) পাতা দ্রুত খুলে বা বন্ধ করে ডাবল ক্লিক করতে হবে। ফলে ফাইল বা ফোল্ডার ওপেন হয়ে যাবে।

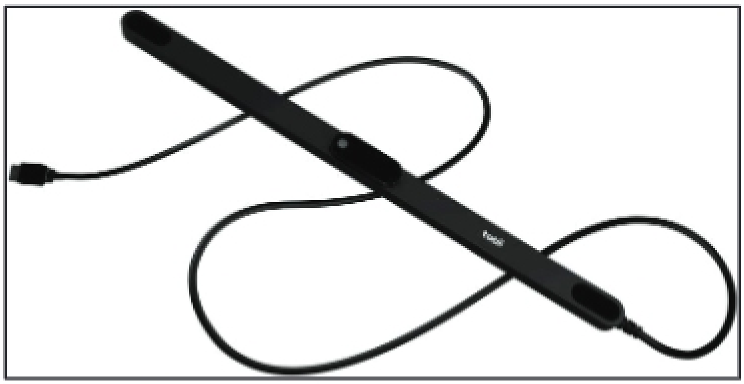

চিত্র ২.২৮: Eye Tracking Sensor

ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর: ফিঙ্গার প্রিন্ট সেনসর একটি বায়োমেটিক ডিভাইস। এ ডিভাইসটি আমাদের হাতের আঙুলে যে ছাপ আছে সেটি ব্যবহার করে কাজ করে। তোমরা হয়তো একটা বিষয় জান যে, পৃথিবীর যত মানুষ আছে

কারও হাতের ছাপের সাথে কারও হাতের ছাপের সম্পূর্ণরূপে মিল নাই। মানুষের আঙ্গুলের ছাপ একটি ইউনিক চিহ্ন। কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা এ ইউনিক চিহ্ন বা ছাপকে কাজে লাগিয়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর আবিষ্কার করেন। এ সেন্সরটি মূলত আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে একটি ডাটাবেজে (database) এ ব্যক্তির তথ্য জমা করে রাখে।

চিত্র ২.২৯: ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর

ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী যখন ফিংগারপ্রিন্ট সেন্সরে ছাপ দেয় তখন কম্পিউটার পূর্বের তথ্যের সাথে বর্তমান তথ্য তুলনা করে। যদি তথ্যের মান একই হয় হবে কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে শনাক্ত করতে পারে। এভাবে আমরা মোবাইল বা ল্যাপটপে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর দিয়ে পাসওয়ার্ড দেই এবং পাসওয়ার্ড ব্রেক করে মোবাইল/কম্পিউটার এ প্রবেশ করে কাজ করি।

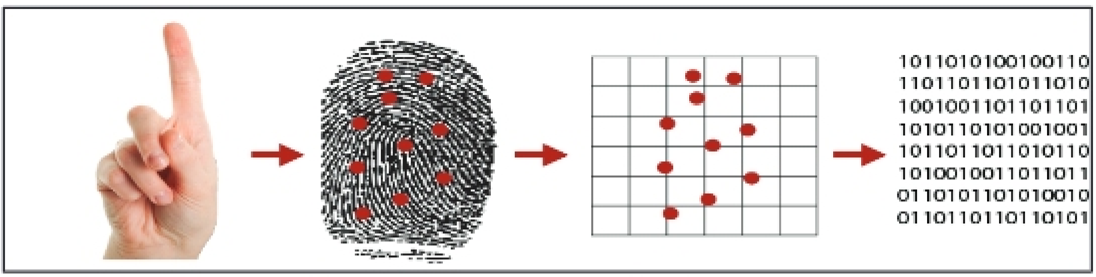

চিত্র ২.৩০: আঙ্গুলের ছাপ অনুযায়ী সংখ্যা

ব্লুটুথ চিপ: ব্লুটুথ স্বল্প পরিসরে ওয়ারলেস কমিউনিকেশনের একটি স্ট্যান্ডার্ড যা কম্পিউটার টু কম্পিউটার অথবা মোবাইল টু মোবাইল অথবা মোবাইল টু কম্পিউটার এ ডাটা আদান প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি ইউ এইচ এফ (UHF-Ultra High Frequency) রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে। ব্লুটুথ নেটওয়ার্কিং এ যে কম্পোনেন্ট ব্যবহার করা হয় সেটিই হলো ব্লুটুথ চিপ। এটি ল্যাপটপের মাদার বোর্ডে বিল্ট ইনথাকে। এ আইসি ১০ - ৫০ মিটার পর্যন্ত যোগাযোগ করতে পারে।

চিত্র ২.৩১: ব্লুটুথ আইসি

ওয়েভ ক্যাম: ওয়েভ ক্যাম বা ওয়েভ ক্যামেরা একটি ইনপুট ডিভাইস। এ ডিভাইসটি দিয়ে স্থির চিত্র ও চলমান চিত্র ধারন ভিডিও করা যায়। সাধারণত এধরণের ক্যামেরা

ওয়েভে মিটিং যেমন– জুম মিটিং, গুগল মিট ইত্যাদি, সোস্যাল মিডিয়ায় ভিডিও চ্যাটিং বেশি ব্যবহৃত হয়। এ ক্যামেরাটি ইন্টারনেট চালু অবস্থায় ব্যবহার করা হয় বলে এর নাম ওয়েভ ক্যাম। ল্যাপটপে এ ক্যামেরাটি ডিসপ্লে ইউনিটের সাথে একত্রে থাকে। ফলে আলাদাভাবে ল্যাপটপে ওয়েভ ক্যাম লাগানো প্রয়োজন হয় না। তবে এক্সটারনাল ওয়েভ ক্যামেরাও বাজারে পাওয়া যায়। সেগুলি ল্যাপটপ বা ডেক্সটপ কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়। ওয়েভ ক্যামেরার ক্ষমতা নির্ভর করে এটির লেন্সটি কত পিক্সেলএর তার উপর। পিক্সেল বেশি হলে ভিডিও রেজুলেশন ভালো হয়।

চিত্র ২.৩২: ওয়েভ ক্যাম

তবে একটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন বেশি পিক্সেলের ক্যামেরা ব্যবহার করলে ইন্টারনেটের গতিও বেশি প্রয়োজন হয় তা না হলে ক্যামেরার পারফরমেন্স ভালো হয় না। ওয়েভ ক্যামেরার সাথে কম্পিউটারে ব্যবহৃত মাইক্রোফোন বিল্টইন থাকে। ফলে কথা বলার সময় আলাদা মাইক্রোফোনের প্রয়োজন হয় না। বিল্টইন ওয়েভক্যাম মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ থাকে। তবে এক্সটারনাল ওয়েভক্যাম ইউএসবি পোর্টে সংযোগ দিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

ল্যাপটপের স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট ও স্পেসিফিকেশন

ল্যাপটপের স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট: ল্যাপটপের স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট বলতে বুঝায় ল্যাপটপের খুচড়া যন্ত্রাংশসমূহ বা কম্পোনেন্টসমূহের তালিকা। এ খুচড়া যন্ত্রাংশ যেমন প্রসেসর, হার্ডডিস্ক, র‍্যাম এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকলে ল্যাপটপ ক্রয় করে অথবা সার্ভিসিং এর কাজ করে সুবিধা করা যায়। তাই আমাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। একটি স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেটে যে সকল ফিচার থাকে তা নিম্নে দেয়া হলো।

ক্রম:	যন্ত্রাংশসমূহের নাম	সম্ভাব্য বর্ণনা	মন্তব্য
০১	প্রসেসর	Intel Core i9-11980HK Processor (24M Cache, 3.30 GHz up to 4.90 GHz)	
০২	ডিসপ্লে ইউনিট	15.6″ FHD (1920 x 1080), 300Hz, close to 100%sRGB Display	
০৩	মেমোরি	32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz RAM	
০৪	স্টোরেজ	1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD	
০৫	গ্রাফিক্স	NVIDIA GeForce RTX3070, GDDR6 8GB Graphics	
০৬	অপারেটিং সিস্টেম	Windows 10 Home	

২০২৪

০৭	ব্যাটারি	99.9 Battery (Whr)	
০৮	কী-বোর্ড	Per-Key RGB Backlight Keyboard	
০৯	ওয়েভক্যাম	FHD type (30fps@1080p) WebCam	
১০	ওয়াইফাই	Intel Wi-Fi 6E AX210(2 x 2)	
১১	ব্লুটুথ	Bluetooth 5.2	
১২	ইউএসবি	1x Type-C (USB4 / DP / Thunderbolt 4) 1x Type-C USB3.2 Gen2 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-A USB3.2 Gen2	
১৩	নেটওয়ার্ক	Intel Wi-Fi 6E AX210(2 x 2) Bluetooth 5.2	
১৪	অডিও জ্যাক	1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack	
১৫	এক্সটা র‍্যাম স্লট	N/A	
১৬	এক্সটা M.2 স্লট	N/A	
১৭	এসএসডি টাইপ	NVMe PCIe Gen3x4	
১৮	ডাইমেনশন	358 x 267 x 23.4 mm	
১৯	ওজন	2.38kg	
২০	রং	Grey	
২১	ওয়ারেন্টি	1 Year International Warranty.	

জব ১: ল্যাপটপ ডিসঅ্যাসেম্বল ও অ্যাসেম্বল করা

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- ল্যাপটপ ডিজঅ্যাসেম্বল করা;
- ল্যাপটপ অ্যাসেম্বল করা;
- ট্রাবল স্যুট করা;

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অ্যাপ্রন	নিজের সাইজ অনুযায়ী	০১ টি
০২	মাস্ক	সাধারণ এন ৯৫	০১ টি
০৩	হ্যান্ড ওয়াশ/সাবান	লিকুইড/বার	০১ টি
০৪	রাবারের স্যান্ডেল/জুতা	যে কোন কম্পানির	০১ টি
০৫	হ্যান্ড গ্লোভস	রাবার	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ল্যাপটপ	যে কোন স্পেসিফিকেশনের	০১ টি
০২	স্ক্রু ড্রাইভার সেট	১০ পিস (একসেট)	০১ সেট
০৩	এভিও মিটার	২২০ ভোল্ট	০১ টি
০৪	চিমটা	স্টিলের	০১ টি
০৫	সুপারগ্লু	৫ গ্রাম এর টিউব	০১ টি
০৬	থার্মাল গ্লু	১০ গ্রাম এর টিউব	০১ টি
০৭	ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	হাতে ব্যবহৃত	০১ টি
০৮	আইসোপ্রপিল অ্যালকোহল	১০০ এমএল	০১ বোতল

নির্দেশিকা : ল্যাপটপ ডিসঅ্যাসেম্বল ও অ্যাসেম্বল করার পূর্বে এবং করাকালিন ইউটিউবের বিভিন্ন চ্যানেলে প্রক্রিয়াটি দেখে নিবে। নিম্নে নমুনা হিসেবে কয়েকটি লিঙ্ক দেয়া হল।

https://www.youtube.com/watch?v=WLbf7-y4HNK
https://www.youtube.com/watch?v=Uiabfkgk4Us&t=76
https://www.youtube.com/watch?v=Uypt6sdGwpA

(গ) কাজের ধারা: ডিসঅ্যাসেম্বল ও অ্যাসেম্বল করার জন্য আমরা আমাদের ল্যাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন একটি ল্যাপটপ নিয়ে ডিসঅ্যাসেম্বল ও অ্যাসেম্বল করেছি। তোমরা তোমাদের প্রতিষ্ঠানে যে ল্যাপটপ আছে সেটি নিয়ে ডিসঅ্যাসেম্বল ও অ্যাসেম্বল কর।

ল্যাপটপ

২. তুমি যে ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছ সেটির ব্যাক কভারে দেয়া মডেল নম্বরটি সংরক্ষণ কর। ভবিষ্যতে আজকের অভিজ্ঞতা একই মডেলের ল্যাপটপে কাজ করলে প্রয়োজন হবে।

ল্যাপটপের ব্যাক কভারের মডেল নাম্বার

৩. ল্যাপটপ থেকে ব্যাটারি আলাদা কর। এ ল্যাপটপে ব্যাটারি আলাদা করার জন্য ব্যাটারির দুপাশে দুটি লক থাকে। লক দুটিকে বাম দিকে টান দিয়ে ধরে আনলক করে ব্যাটারিটিকে আস্তে করে সর্তকতার সাথে টান দিয়ে বের করে আন।

ব্যাটারি আনলক করা হচ্ছে

৪. ব্যাটারি আলাদা কর এবং যত্ন করে একপাশে রেখে দাও।

ল্যাপটপ থেকে ব্যাটারি আলাদা করা হয়েছে

৫. এ ল্যাপটপটির র‍্যাম খোলা খুব সহজ। ব্যাক কভারে ছোট আলাদা একটি কভার আছে এবং এ কভারে মাত্র একটা স্ক্রু ও কয়েকটি লক আছে। স্ক্রুটি খুলে কভার আলাদা করে র‍্যাম দেখ।

র‍্যাম খোলার জন্য র‍্যামের কভারের স্ক্রু খোলা

৬. ল্যাপটপ অ্যাসেম্বল অথবা ডিসঅ্যাসেম্বল করার সময় স্ক্রু রাখার জন্য একটা বা দুইটা পাত্র হাতের কাছে রাখ। স্ক্রুগুলো ছোট থাকে বলে এটি হারিয়ে যেতে পারে। আবার স্ক্রুর ভিন্নতাও থাকে। ফলে যে স্ক্রু যেখান থেকে খুলছ সেই স্ক্রু সেখানে লাগাবে। এ জন্য স্ক্রু খোলার আগে মোবাইল দিয়ে একটি ছবি তুলে রাখবে ভুলে গেলে পরবর্তীতে ছবি দেখে স্ক্রুগুলো লাগাবে।

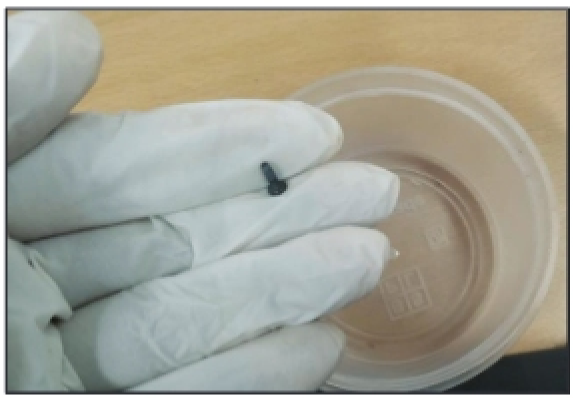

স্ক্রু রাখার পাত্র

৭. র‍্যামের কভারটি খুলে ফেল। র‍্যামের কভার খোলার পর দেখবে র‍্যামের দুই পাশে দুটি ক্লিপ আছে। ছোট একটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে হালকাভাবে বাইরের দিকে একটু চাপ দাও। দেখবে র‍্যামটি একটু উপরের দিকে উঠে আসবে। র‍্যাম খোলার আগে হাতকে এন্টিস্ট্যাটিক বা ডিসচার্জ করে নাও।

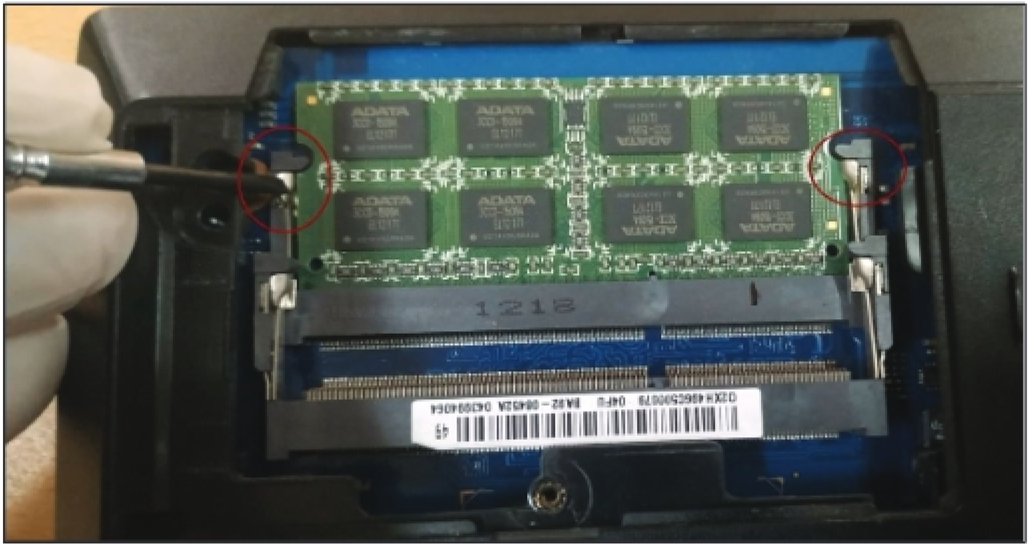

র‍্যামের দুই পাশের ক্লিপ খোলা

৮. র‍্যাম যখন একটু উপরের দিকে আসবে তখন হালকা করে ধরে এগুলোকে নিরাপদে রাখ।

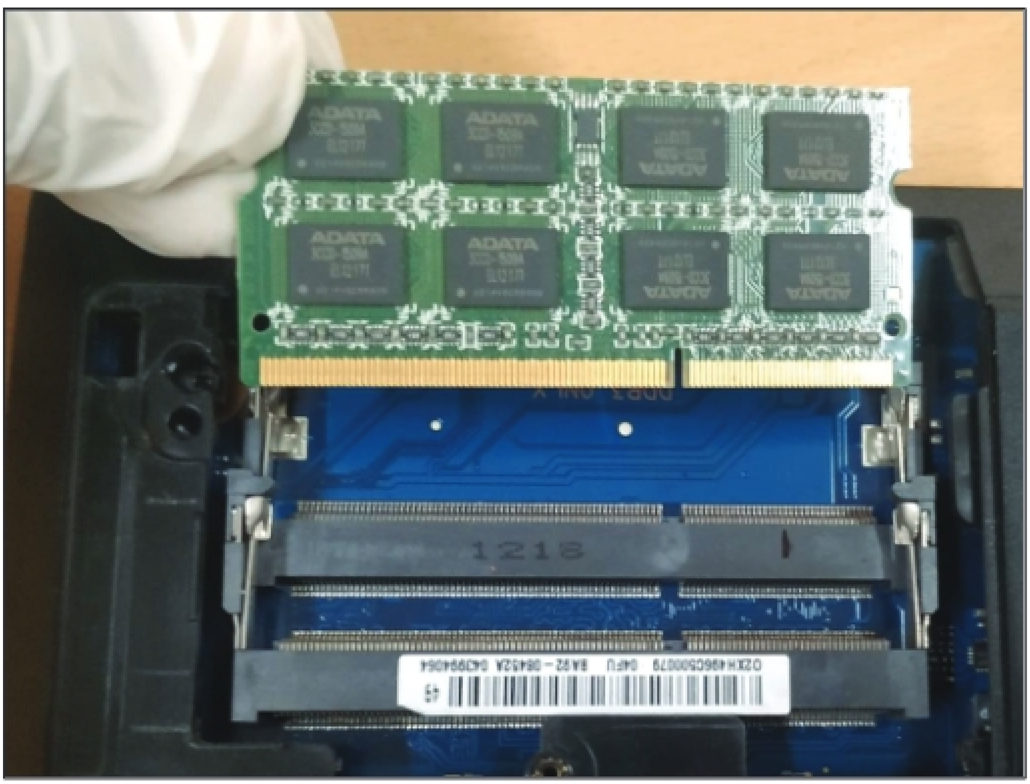

র‍্যাম খুলে আলাদা করে নিরাপদে রাখা হচ্ছে

৯. ব্যাক কভারের স্ক্রুগুলো খুলে স্ক্রুর পাত্রে রাখ।

ব্যাক কভারের স্ক্রু খোলা

১০. কভারের ক্লিপগুলো আলগা করো। এক্ষেত্রে একটি ছোট ফ্লাট স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করে হালকা চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে কভারের উপরের অংশ ও নীচের অংশ আলাদা করো। কাজটি ধর্য্যসহকারে আস্তে আস্তে করো নতুবা ক্লিপ ভেঙ্গে যাবে।

কভারের ক্লিপ আলগা করা

১১. উপরের কভার আলাদা করে নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করো।

উপরের কাভার খোলা

১২. হার্ড ডিস্ক আলাদা করার জন্য হার্ড ডিস্কের স্ক্রু খুলে ফেল।

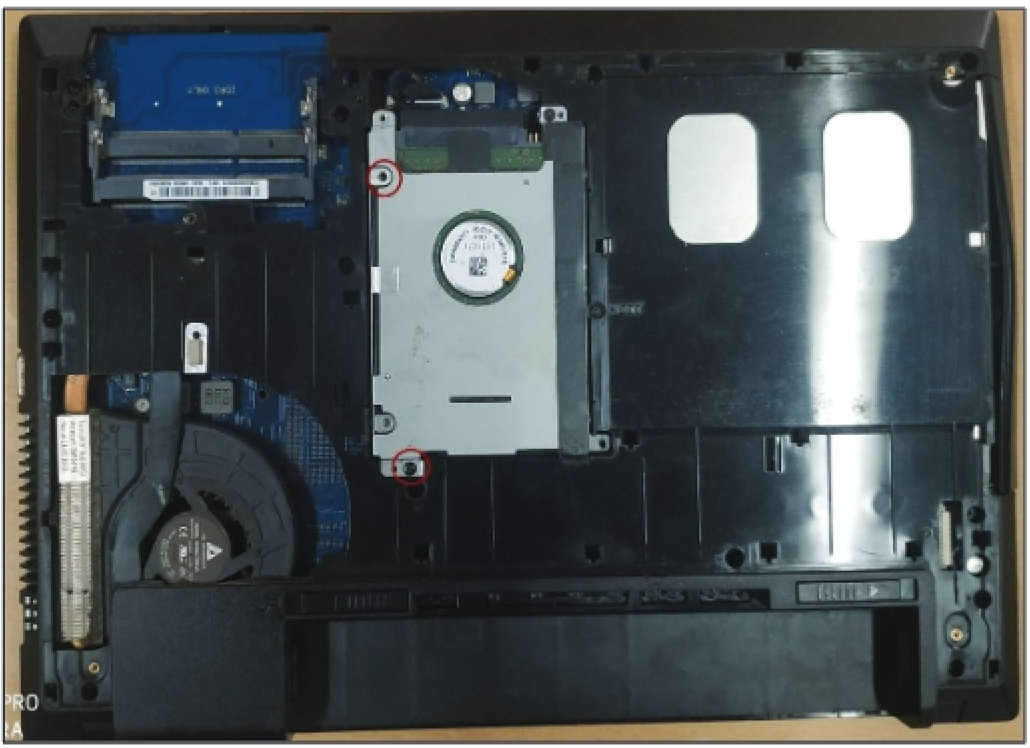

হার্ড ডিস্কের স্ক্রু খোলা

১৩. হার্ড ডিস্ককে আলাদা করার জন্য হালকা করে হার্ড ডিস্ক এর পেছনের দিক উঁচু করে ধরে রাখো। সামনের দিকে দেখবে হার্ড ডিস্কের একটি ক্যাবল মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ আছে। এ সংযোগ ক্যাবলটি সাবধানে খুলে ফেল এবং হার্ড ডিস্ককে নিরাপদে রাখো।

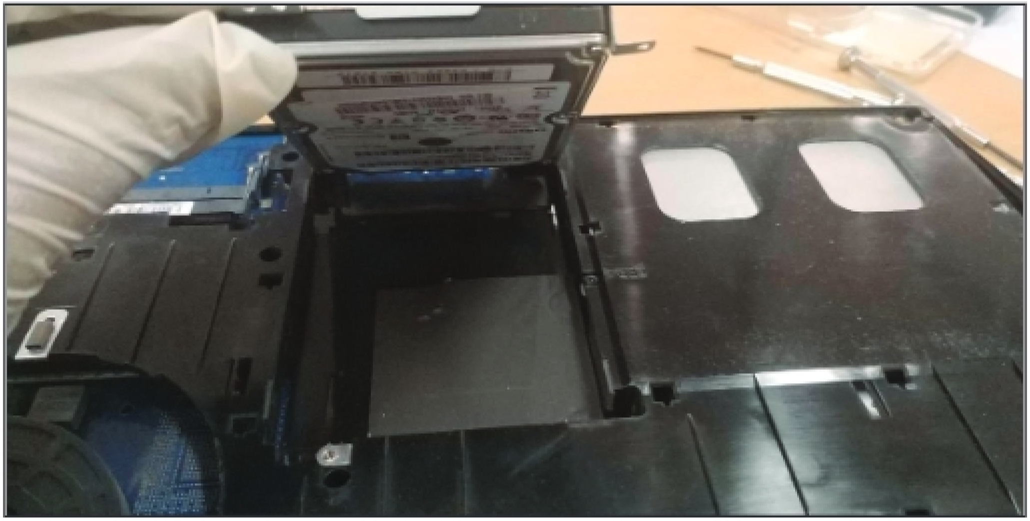

হার্ড ডিস্ক আলাদা করা

১৪. ডিভিডি বের করার জন্য চিত্রের ন্যায় স্ক্রু ডাইভার দিয়ে হালকা ধাক্কা দিয়ে ড্রাইভটি বের করো। তার আগে দেখে নাও কভারের সব স্ক্রু খুলেছ কিনা।

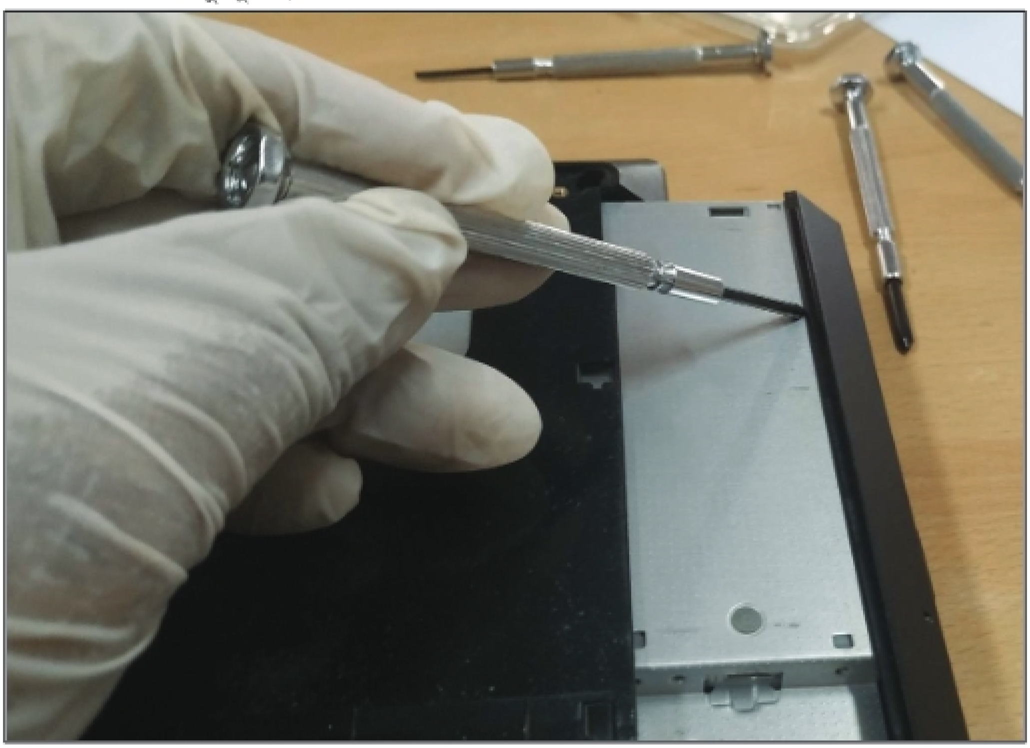

ডিভিডি ড্রাইভ খোলা

১৫. ডিভিডি ড্রাইভটি আলাদা কর এবং নিরাপদে রাখ।

ডিভিডি ড্রাইভ আলাদা করা

১৬. ল্যাপটপের বডির কভারটি আলাদা করো।

ল্যাপটপ বডির কভার আলগা করা

১৭. ল্যাপটপের বডির কভারটি আলাদা করো।

বডির কভারটি আলাদা করা

১৮. বডির কভারটি আলাদা কর এবং কভারটি সংরক্ষণ করো।

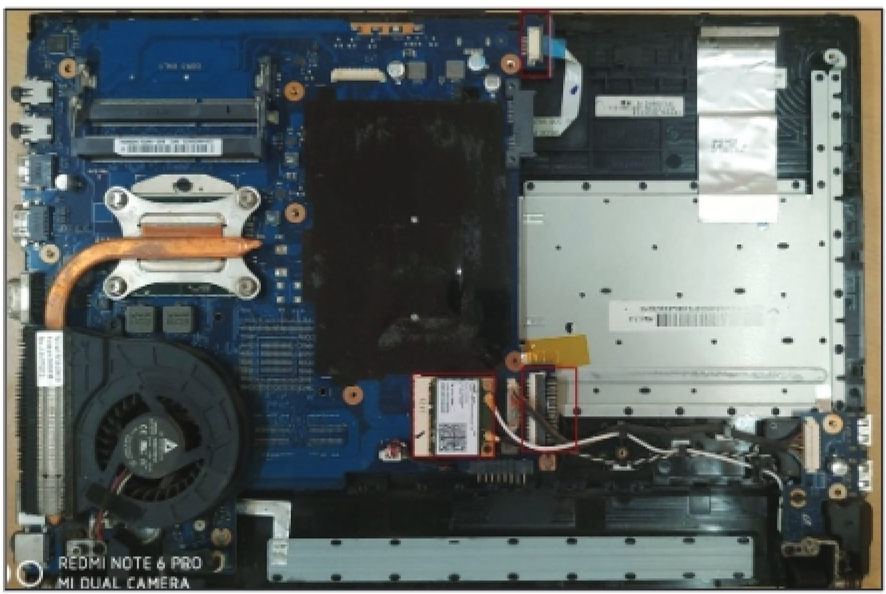

বডির কভারটি আলাদা করা

১৯. মাদার বোর্ড থেকে কুলিং ফ্যানটি আলাদা করো। এজন্য চিত্রে মার্কিং করা দুটি স্ক্রু খুলে ফেল ও কুলিং ফ্যানের পাওয়ার কানেক্টরটিও আলাদা করো। কুলিং ফ্যান আলাদা হয়ে যাবে।

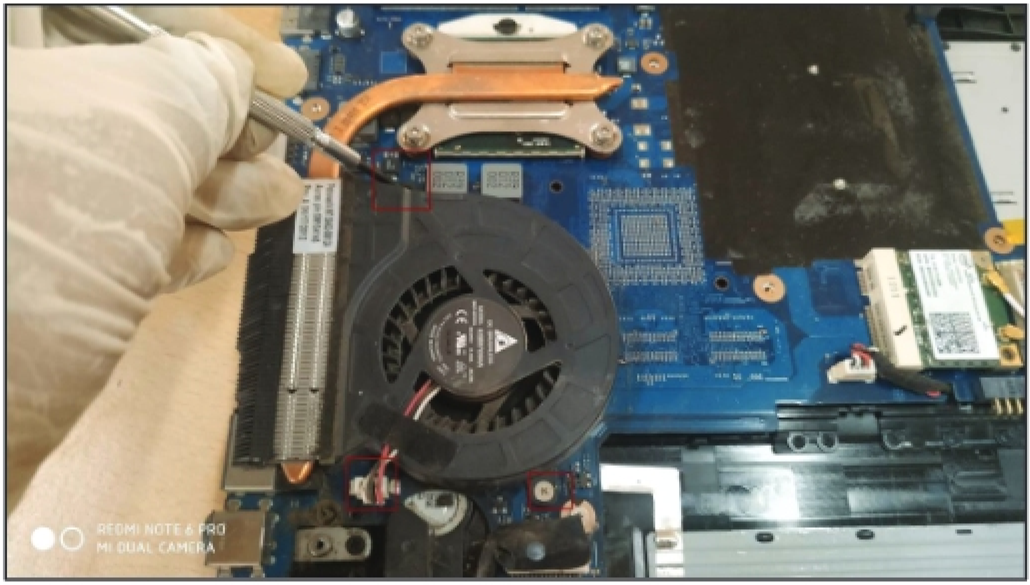

কুলিং ফ্যান আলাদা করা

২০. ওয়াইফাই এন্টিনা ক্যাবল কে বিচ্ছিন্ন করো। এ জন্য একটি ছোট স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে হালকা করে ধরে উপরের দিকে টান দাও। এ্যান্টিনা ক্যাবল বিচ্ছিন্ন হবে।

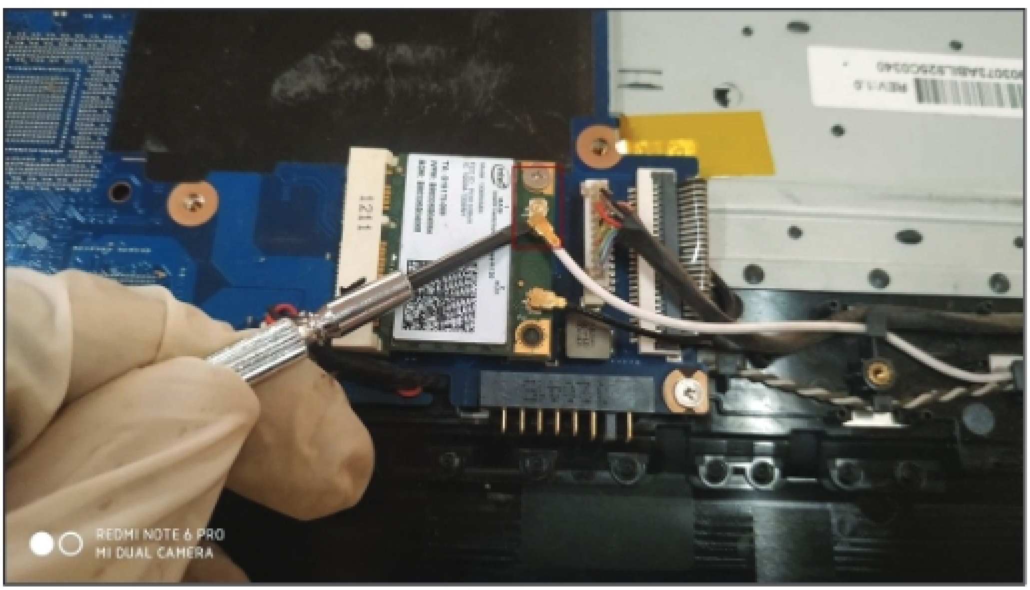

ওয়াইফাই ডিভাইসের এ্যান্টিনা বিচ্ছিন্ন করা

২১. ওয়াইফাই ডিভাইস আলাদা করো। ডিভাইসটি দুটি স্ক্রু দিয়ে মাদার বোর্ডের সাথে আটকানো থাকে। তাই স্ক্রু দুটিকে প্রথমে খুলে ফেল। তারপর আস্তে করে ডিভাইসটি বিচ্ছিন্ন করো ও নিরাপদে রাখো।

ওয়াইফাই ডিভাইসটি আলাদা করা

২২. ফ্রন্ট প্যানেলের ক্যাবলটি বিচ্ছিন্ন করো।

ফ্রন্ট প্যানেলের ক্যাবল আলাদা করা

২৩. ল্যাপটপের ইন্টারনাল স্পিকারটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করো। এ কাজটি করার জন্য ক্যাবলের মাথায় ব্যবহৃত সাদা জ্যাকটি ধরে হালকাভাবে উপরের দিকে টান দিয়ে খুলো। অনেক সময় জ্যাকে ক্লিপ থাকে। ক্লিপ থাকলে সেটি খুলে তারপর সাদা জ্যাকটি উপরের দিকে টান দিয়ে খুলতে হয়।

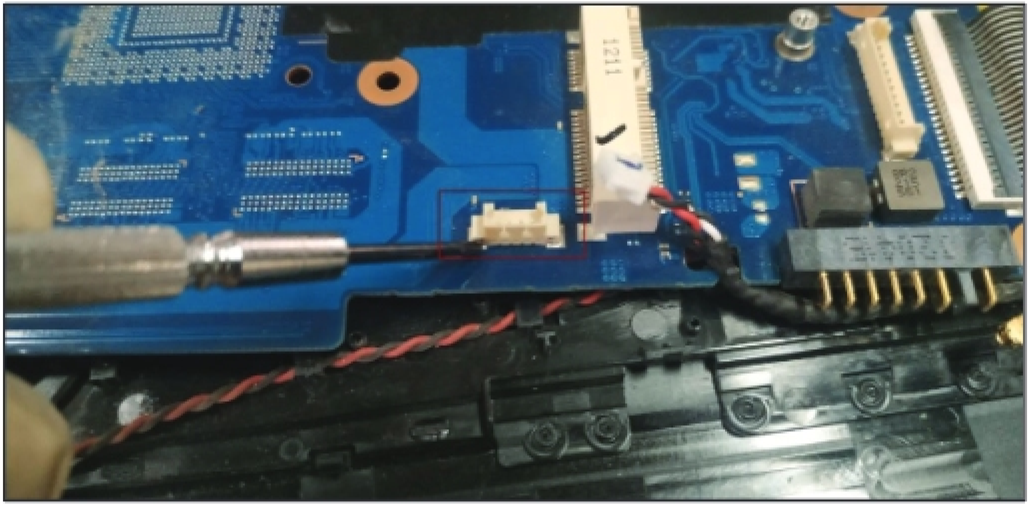

ল্যাপটপের ইন্টারনাল স্পিকারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা

২৪. কীবোর্ডের রিবনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করো। এ কাজটি করার জন্য রিবনের উপরে বাদামী রংয়ের পাতলা প্লাস্টিকের পাতটি একটি ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইবার দিয়ে উপরের দিকে ধাক্কা দাও। এর পর রিবনটি ধরে হালকা করে বিচ্ছিন্ন করো। কাজটি করার সময় খুব সাবধানে কর যাতে রিবন ছিঁড়ে না যায়।

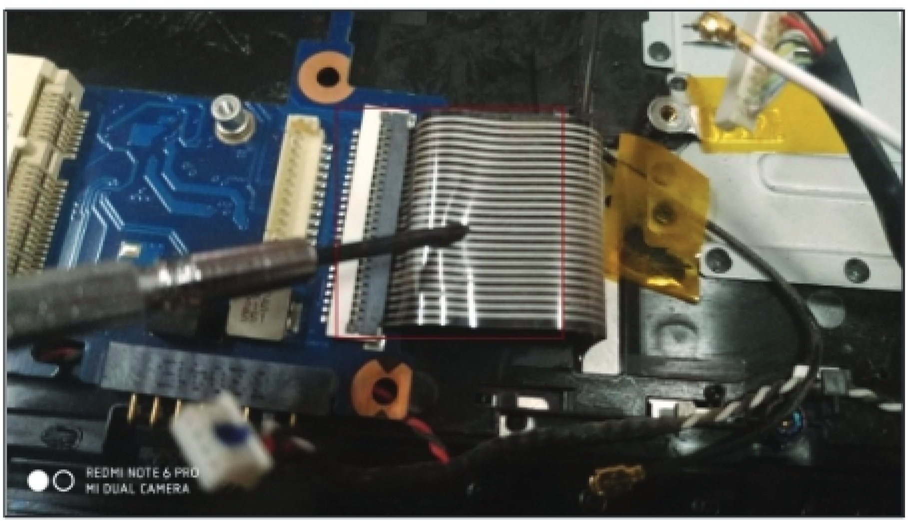

কীবোর্ডের রিবনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা

২০২৪

২৫. টাচপ্যাড রিবনটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করো। এ কাজটি করার জন্য রিবনের উপরে বাদামী রংয়ের পাতলা প্লাস্টিকের পাতটি একটি ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইবার দিয়ে বাইরের দিকে টান দাও। এর পর রিবনটি ধরে হালকা করে বিচ্ছিন্ন করো। কাজটি করার সময় খুব সাবধানে কর যাতে রিবন ছিঁড়ে না যায়।

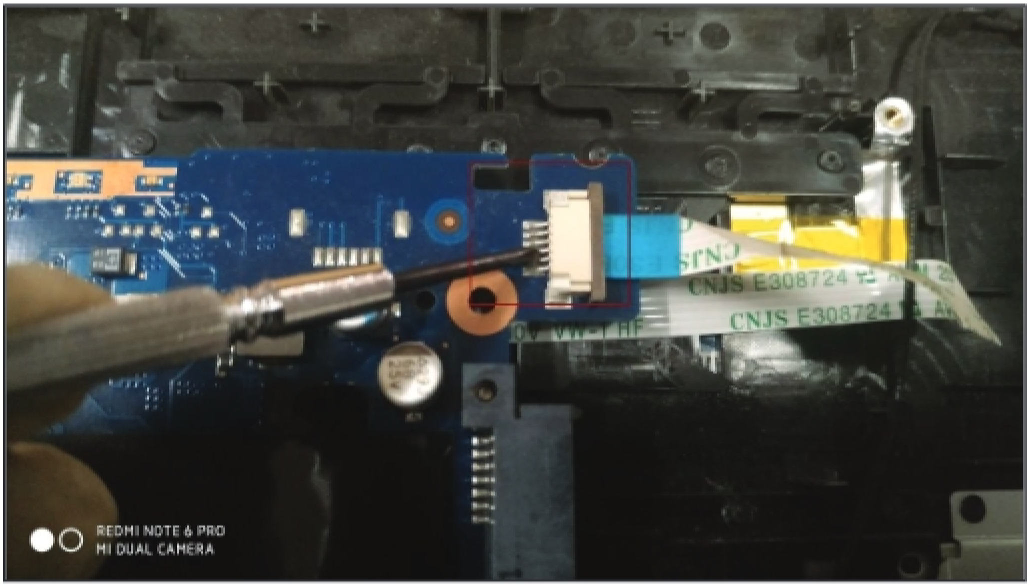

টাচ প্যাডের রিবনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা

২৬. সিএমওএস ব্যাটারি আলাদা কর। এ কাজটি করার জন্য একটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে প্লাস্টিকের লকটি হালকা চাপ দিয়ে খুল এবং ব্যাটারিটি নিরাপদে রাখো। (বি:দ্র: অনেকসময় মাদার বোর্ড পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। আবার আমারা বিশেষ ধরণের লিকুইড দিয়ে মাদার বোর্ডের কন্টাক্ট পয়েন্টগুলো পরিষ্কার করি। একটি বিষয় অবশ্য খেয়াল রাখবে এ ব্যাটারিটির কারণে তোমার ল্যাপটপে ব্যবহৃত বিআইওএস টি চালু থাকার পাশাপাশি অনেকগুলো কম্পোনেন্ট চালু থাকে এ কারণে মাদার বোর্ডে কোন কাজ করলে অবশ্য ব্যাটারিটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কাজ করবে)।

সিএমওএস ব্যাটারি আলাদা করা

২৭. কেসিং থেকে মাদারবোর্ডটি আলাদা করো।

ল্যাপটপের মাদারবোর্ড আলাদা করা

২৮. ল্যাপটপের কেসিংটি আলাদা করো।

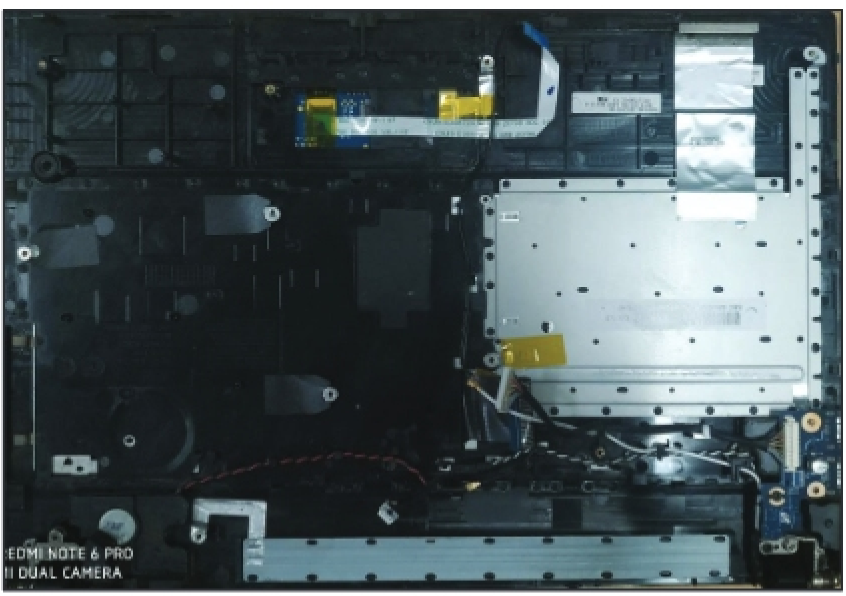

ল্যাপটপের কেসিং আলাদা করা

ল্যাপটপ অ্যাসেম্বল করা

আমরা ইতিপূর্বে একটি ল্যাপটপ ডিজঅ্যাসেম্বল করেছি এবং ল্যাপটপে ব্যবহৃত বিভিন্ন ডিভাইস যেমন– হার্ড ডিস্ক, অপটিক্যাল ড্রাইভ, মাদার বোর্ড ইত্যাদি আলাদা করে রেখেছি। এখন আমাদের কাজ হলো– ডিজঅ্যাসেম্বলকৃত যন্ত্রাংশ/ডিভাইস/কম্পোনেন্টগুলোকে সঠিকভাবে এ্যাসেম্বল করে একটি ল্যাপটপ তৈরি করা। তোমরা একটি বিষয় খেয়াল রাখবে ডিজঅ্যাসেম্বল করার সময় যে ডিভাইস বা কম্পোনেন্টটি সবার শেষে আলাদা করেছি অ্যাসেম্বল করার সময় সেই ডিভাইস বা কম্পোনেন্টটিকে সবার আগে সংযোগ বা লাগাতে হবে। অনেকটা ভিডিও প্লেব্যাক এর মতো। অর্থ্যাৎ প্লেব্যাকের সময় যে সিনটি সবার শেষে হয়েছে সেটি সবার আগে দেখা যাবে। এখানেও কাজটি ঠিক সেভাবে হবে।

১. সিএমওএস ব্যাটারিটি ব্যাটারি কেসিং এ বসাও।

সিএমওএস ব্যাটারি কেসিং এ বসানো

২. কুলিং ফ্যানটি কুলিং ফ্যানের জায়গায় বসাও। দুপাশে দুটি স্ক্রু লাগাও। কুলিং ফ্যানের পাওয়ার জ্যাকটি মাদার বোর্ডের সাথে সংযোগ করো।

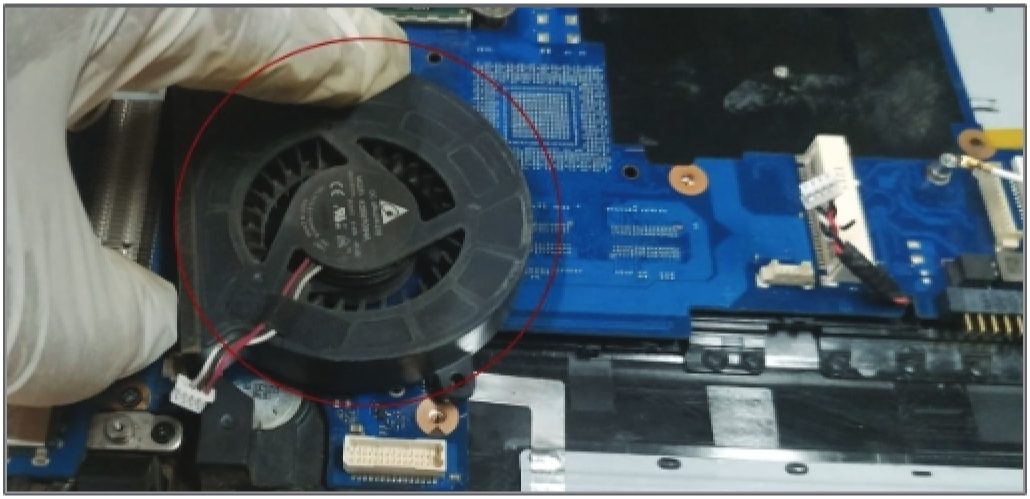

কুলিং ফ্যান বসানো

৩. ডিসপ্লে ইউনিটের পাওয়ার ক্যাবলটি মাদারবোর্ডে সংযোগ করো।

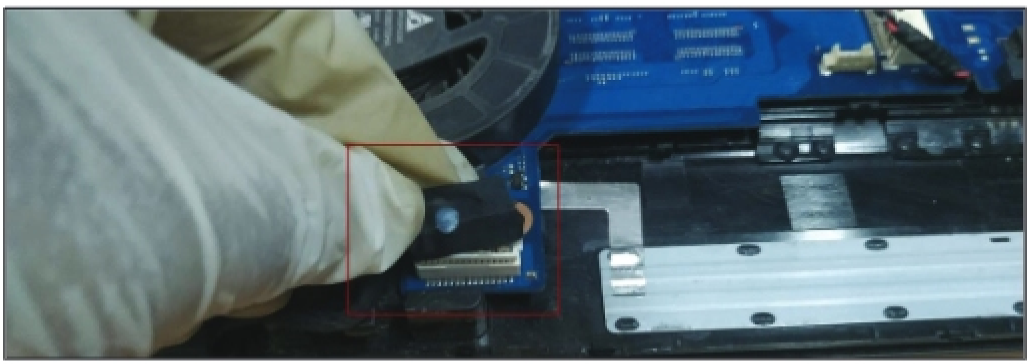

ডিসপ্লে ইউনিটের ক্যাবল সংযোগ

৪. ইন্টারনাল স্পিকারের পাওয়ার পোর্ট টি মাদার বোর্ডে সংযোগ করো।

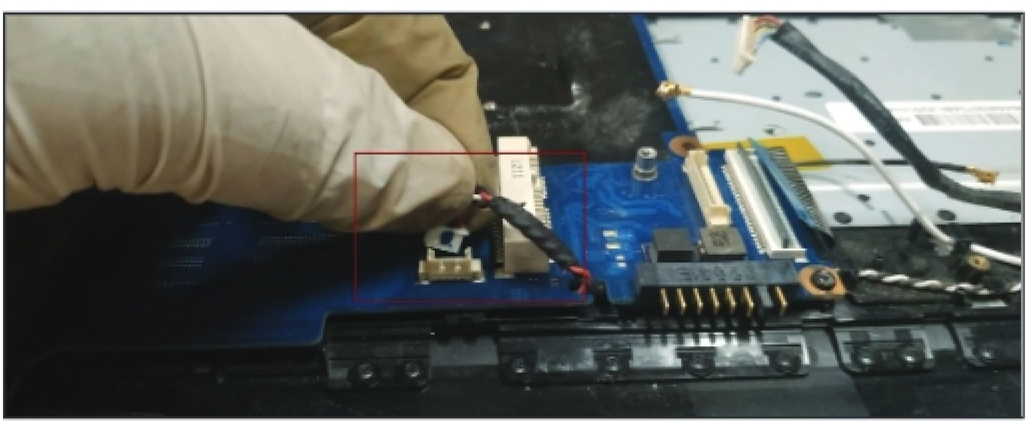

ইন্টারনাল স্পিকারের ক্যাবল সংযোগ

৫. কীবোর্ডের রিবনটি সংযোগ করো।

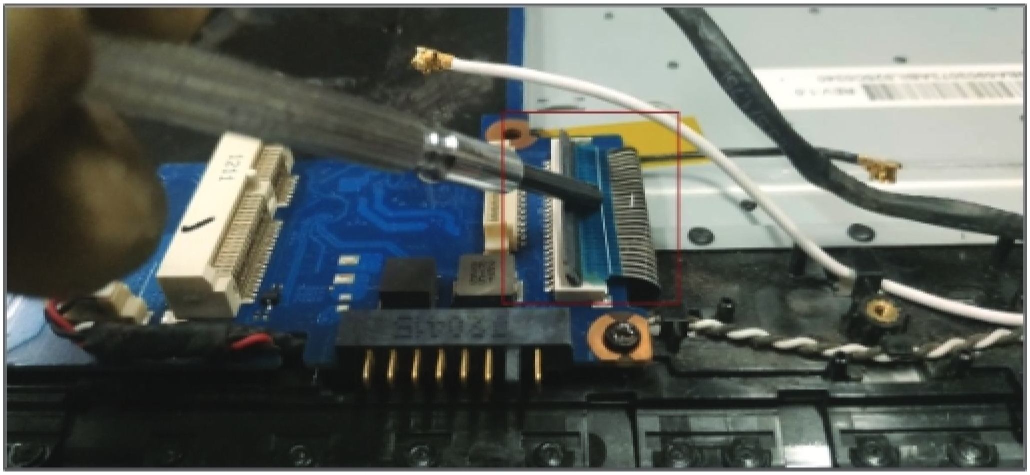

কী-বোর্ডের রিবন সংযোগ

৬. টাচপ্যাডের রিবনটি সংযোগ করো।

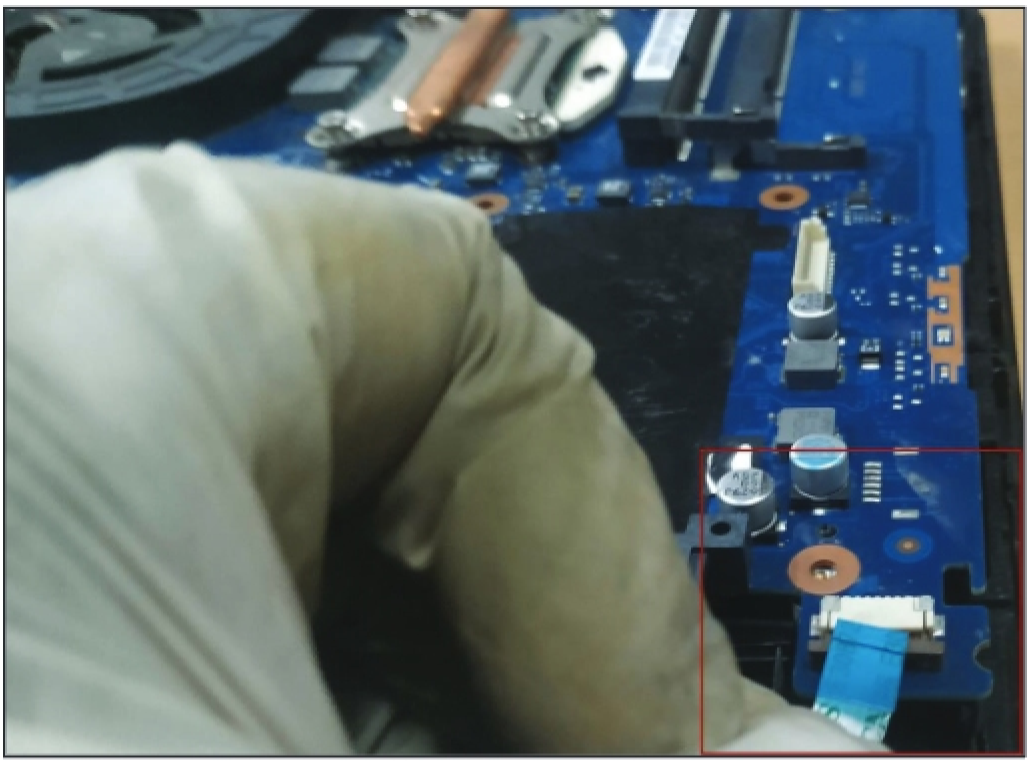

টাচ প্যাডের রিবন সংযোগ

৭. ওয়াইফাই ডিভাইস সঠিক স্লটে বসাও।

৮. ওয়াইফাই এন্টিনার সংযোগ করো।

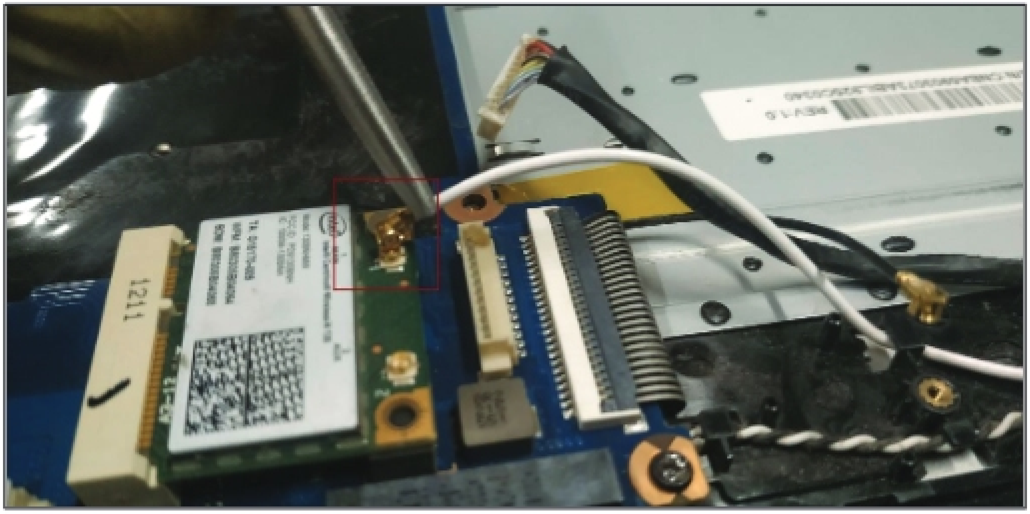

ওয়াইফাই ডিভাইসের এ্যান্টিনাতে সংযোগ

৯. ফ্রন্ট প্যানেলের ক্যাবল সংযোগ করো।

ওয়াইফাই ডিভাইস বসানো

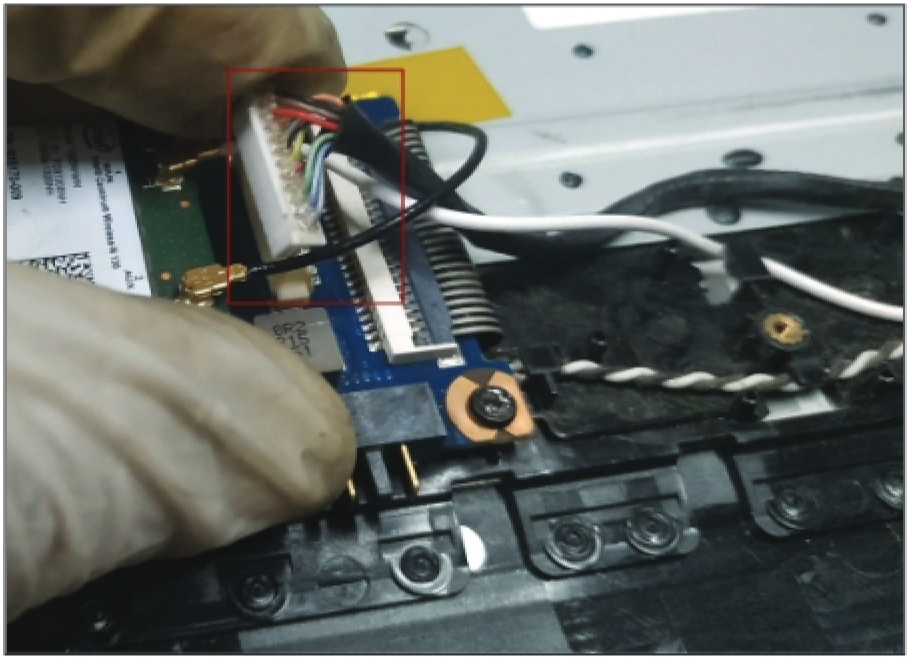

ফ্রন্ট প্যানেলের ক্যাবল সংযোগ

১০. ল্যাপটপের কভার লাগাও।

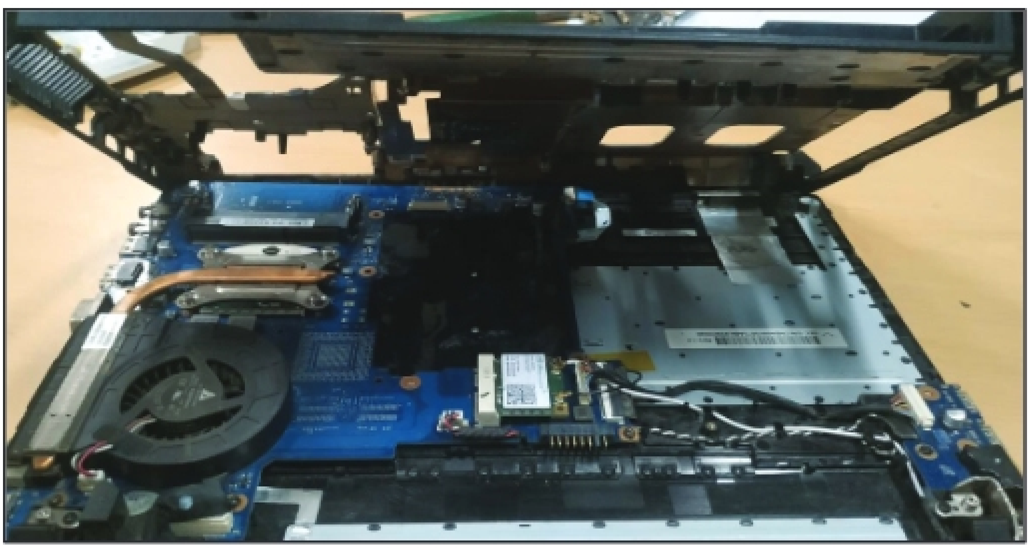

ল্যাপটপের কভার লাগানো

১১. ডিভিডি সংযোগ করো।

ডিভিডি সংযোগ

১২. হার্ড ডিস্ক সংযোগ করো।

হার্ড ডিস্ক সংযোগ

১৩. র‍্যাম সংযোগ করো।

র‍্যাম সংযোগ

১৪. র‍্যামের কভার লাগাও

র‍্যামের কভার লাগানো

১৫. ব্যাক কভার লাগাও

ব্যাক কভার লাগানো

১৬. ব্যাটারি সংযোগ করো।

ব্যাটারি সংযোগ

ট্রাবল স্যুটিং

- অপটিক্যাল ড্রাইভ–ডিস্ক পড়তে পারে না অথবা ড্রাইভ কাজ করছে না।

সমাধানঃ ডিস্কে স্ক্র্যাস/ফাঙ্গাস পড়েছে অথবা ডিস্ক অনেক পুরানো অথবা ড্রাইভ নষ্ট। প্রথমে ডিস্ক পরিবর্তন করে দেখবে যাদি ঠিক মতো কাজ না হয় তা হলে ড্রাইভ পরিবর্তন করবে।

- ডিসপ্লে–ফাটা/ নষ্ট/আবছা

সমাধানঃ আমাদের ল্যাপটপগুলোতে আমরা এলসিডি বা এলইডি স্ক্রিণ ব্যবহার করি। এ স্ক্রিণ ফেটেগেলে/ নষ্ট হলে মেরামত করা যায় না। তাই রিপ্লেস করতে হয়।

- কী-বোর্ড– কোন একটি কী কাজ করছে না অথবা সম্পূর্ণ কীবোর্ড কাজ করছে না।

সমাধানঃ ল্যাপটপের কীবোর্ড পরিবর্তন করবে। এক্সটারনাল কীবোর্ড ব্যবহার করে কাজ করবে।

- কেসিং– ফেটে যাওয়া/ভেঙ্গে যাওয়া/সঠিকভাবে না লাগ।

সমাধানঃ সামান্য ফেটে গেলে বা ভেঙ্গে গেলে যতটুকু পারা যায় সুপার গ্লু দিয়ে জোড়া লাগাবে। সঠিকভাবে কভার না লাগলে পূণরায় খুলে আবার নতুন করে লাগাবে।

- সকেট/পোর্ট–নস্ট/ভেঙ্গে যাওয়া/হারিয়ে যাওয়া

সমাধান: ব্যবহারজনিত কারণে ল্যাপটপের পোর্টগুলো ড্রাই সোল্ডার হয়ে যায়। ফলে ঐ সকল পোর্টগুলো কাজ করে না। এমনটি হলে নতুন করে সোল্ডার কর। পোট ভেঙ্গে গেলে বা হারিয়ে গেলে সমজাতীয় পোর্ট সংগ্রহ করে লাগিয়ে নাও।

- টাচপ্যাড: কাজ করছে না/প্যাডটি নস্ট

সমাধান: টাচপ্যাডের বিকল্প হিসেবে এক্সটারনাল মাউস ব্যবহার কর। পরে টাচপ্যাডটি পরিবর্তন কর।

- ওয়েভক্যাম–কাজ করছে না

সমাধান: অন্য একটি কম্পিউটারে সংযোগ দিয়ে চেক কর। যদি কাজ না করে তবে পরিবর্তন কর।

- হার্ড ড্রাইভ: কাজ করছে না/শব্দ তৈরি করছে।

সমাধান: ডাটা ক্যাবল ও পাওয়ার ক্যাবল টিক মতো লাগানো আছে কি না চেক কর। যদি থাকে তবে অন্য কোন যন্ত্রাংশের সংস্পর্শে আছে কি না চেক কর। যদি সংস্পর্শে না থাকে তবে অপারেটিং সিস্টেম নতুন করে ইনস্টল কর। তাতে কাজ না হলে হার্ড ডিস্ক পরিবর্তন কর।

- পাওয়ার–পাওয়ার অন হয় না/একটু পর পর বন্ধ হয়ে
- ব্যাটারি নষ্ট

সমাধান: নতুন ব্যাটারি লাগাও

- এ্যাডাপ্টার নষ্ট

সমাধান: এ্যাডাপ্টার ঠিক কর/নতুন লাগাও

- এসি লাইন নষ্ট

সমাধান: এসি লাইন ঠিক কর

- এ্যাডাপ্টারের পিন নস্ট

সমাধান: পিন পরিবর্তন কর

- মাদার বোর্ডের পাওয়ার পিন নস্ট

সমাধান: পিন পরিবর্তন কর

- মাদার বোর্ডের পাওয়ার সেকশন নস্ট

সমাধান: ঠিক কর/মাদার বোর্ড পরিবর্তন কর

- অপারেটিং সিস্টেম কাজ করছে না।

সমাধান: অপারেটিং সিস্টেম নতুন করে ইনস্টল কর

- ল্যাপটপ বার বার রিস্টার্ট নেয়/বেশি গরম হয়

সমাধান: অপারেটিং সিস্টেম পূনরায় ইনস্টল কর

- কুলিং ফ্যান নস্ট

সমাধান: কুলিং ফ্যান ঠিক কর/পরিবর্তন কর

অনুশীলনী-৪

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বেজ প্যানেল কী?

২। কপার রেডিয়েটরের কাজ কী?

৩। WiFi এর পূর্ণনাম কী?

৪। আইসোপ্রেপিল অ্যালকোহল কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

৫। থার্মাল গ্লু কেন ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শাভন যোগাযোগ ও উত্তম সম্পর্ক স্থাপন বলতে কি বোঝায়?

২। ল্যাপটপের কীবোর্ড এবং ডেস্কটপ কম্পিউটারের কীবোর্ডের মধ্যে পার্থক্য কী?

৩। সিস্টেম বোর্ডের / মাদার বোর্ডের মূল অংশগুলোর নাম লেখ।

৪। থার্মাল কুলিং কী?

৫। ল্যাপটপের ওয়্যারলেস কার্ডের বর্ণনা করো।

৬। আই ট্রাকিং সেনসর এর বর্ণনা দাও।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। ল্যাপটপের র‍্যাম ও ডেস্কটপের র‍্যামের মধ্যে পার্থক্য কী?

২। ডেস্কটপ কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক ও ল্যাপটপের হার্ড ডিস্কের মধ্যে পার্থক্য কী?

৩। টাচপ্যাড ও মাউসের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪। ডেস্কটপ কম্পিউটার কীবোর্ড ও ল্যাপটপ কীবোর্ডের মধ্যে পার্থক্য কী?

৫। আই ট্রাকিং সফটওয়্যার কী?

৬। ওয়েভক্যাম কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়?

সমাপ্ত

বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

হাইটেক পার্ক আইটি সংক্রান্ত সকল সামগ্রী তৈরি, আমদানি ও রপ্তানি করার সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন। বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্কসহ সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় আরও হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশই হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব পার্কে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের তরুণরা এসব কারখানায় কাজ করার ও শেখার সুযোগ পাবে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা করে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারবে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

আইটি সাপোর্ট এন্ড আইওটি বেসিকস-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য